বড়রা যখন ছোট ছিল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বড়রা যখন ছোট ছিল

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

BARARA JAKHAN CHHOTO CHHILO
A collection of Bengali Story for Juvenile by SUNIL GANGOPADHYAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 100.00

ISBN-81-295-0768-4

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

দাম : ১০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

স্নেহের সুমি, সমু, মাম
এই তিন ভাইবোনকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

তেরোটি উপন্যাস (একত্রে)
ছ'টি উপন্যাস
সাতটি উপন্যাস
ভালোবাসার দিনগুলি
দময়ন্তীর মুখ
প্রতিশোধের একদিক
কল্পনার নায়ক
মালঞ্চমালা
উড়নচণ্ডী
মা বাবা ভাই বোন
মহাপৃথিবী
এলোকেশী আশ্রম
সমুদ্রতীরে
প্রতিদ্বন্দ্বী
তাজমহলে এককাপ চা
রক্তমাংস
দুই নারী

সোনালী দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীর গোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
জঙ্গলগড়ের চাবি
আকাশ দস্যু
শ্রেষ্ঠ গল্প
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সূচি

একেবারে শুরুর কথা ৯
জানালায় এক স্কন্ধকাটা! ১৩
রেললাইনের পাহারাদার ২১
দিদিমার কোলে গাঁদাফুলের মালা ২৯
অবনী স্যারের ইস্কুল ৩৮
ভুতুড়ে ঘোড়ার গাড়ি ও কালো বাক্স ৪৭
তিনটি ছবির রহস্য ৫৬
সোনামুখির হাতি ও রাজকুমার ৬৬
একটা ছাতা আর একটা কলম ৭৪
বিশ্বমামা ও নতুন বাজি ৮১
মায়াদ্বীপ ৮৯
প্রতাপ রায় কেন কেঁদেছিলেন? ৯৩
সেই সাধুটি আসলে কে? ১০১
একটা চিঠি আর সাদা পাখি ১১১
ম্যাশিসিয়ানের পায়রা ১১৬
বটুকদাদার পাখি ১২৪
ভূতটা আসল কে? ১৩০
ডাকাতের দল ও এক জমিদার ১৩৯
হারানো সেই খাম ১৪৪
জোজো-সন্তুর গল্প কাকাবাবুর উত্তর ১৫২
সত্যি ভূত, মিথ্যা ভূত ১৫৯
হারানো চাবি আর মুক্তোর দুল ১৬৭
গঙ্গার ধারে চৌধুরি বাড়ি ১৭৩
এক মূর্খ বিদ্বানের কাহিনী ১৮২
হীরামতি রাক্ষসী ১৯৩
হরিরামপুরের বাঘ ১৯৯
বড়রা যখন ছোট ছিল ২০৪
বিপিনবাবুর চশমা ২১৩
রেশমি ২১৮
মরুভূমির হরিণ ২২৩
সাবধান, সাপ! ২২৬

একেবারে শুরুর কথা

একটা স্কুলের ক্লাসে এক মাস্টারমশাই ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বলতে পারো, আমরা মহাভারতের গল্পটা কার কাছ থেকে পেয়েছি?

সবাই একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

আদ্ধেক ছেলে-মেয়ে মহাভারত পড়েইনি। কয়েকজন মাত্র ঠাম্মা কিংবা দিদার মুখে গল্প শুনেছে, আর অনেকের ঠাম্মা কিংবা দিদাই নেই। কিংবা এ বাড়িতে থাকেন না। আর কেউ কেউ টিভি-তে একটু একটু দেখেছে।

একটি মেয়ে হাত তুলে বলল, আমি জানি স্যার। ঋষি বেদব্যাস মহাভারত লিখেছেন।

স্যার বললেন, বাঃ, ঠিক বলেছ। বেদব্যাসই মহাভারত লিখেছেন। কিন্তু আমি জানতে চেয়েছি, আমরা মহাভারত কার কাছ থেকে পেয়েছি? তখনকার দিনে তো ছাপাখানা ছিল না, ঘরে ঘরে বই পৌঁছে যেত না। হাতের লেখা একখানা দু'খানা বই পড়ে পড়ে কেউ কেউ মুখস্ত করে ফেলত। তারপর তারা ঘুরে ঘুরে নানান জায়গায় গিয়ে সেই গল্প শোনাত অনেককে।

একটা ছেলে বলল, কী বলছেন স্যার? অতবড় গল্পটা একজন লোক মুখস্ত শোনাত? পুরোটা? ভুল ভাল হত না?

স্যার বললেন, মহাভারতকে তো মনে করা হয় পবিত্র বই, তাই ভুল করার উপায় নেই। ভুল করলে পাপ হয়। সেইজন্যই তো এতকাল ধরে মহাভারত টিকে আছে।

পেছনের বেঞ্চ থেকে একজন মন্তব্য করল, আগেকার দিনের লোকেরা একবারে খাঁটি ঘি-দুধ খেত তো, তাই তাদের মেমারি ভালো হত!

স্যার বললেন, তা অনেকটা ঠিক। তা ছাড়াও, যাঁরা ঘুরে ঘুরে এই গল্প শোনাতেন, এটাই ছিল তাঁদের জীবিকা। তাই ভালো করে শিখতেই হত। আমরা মহাভারতের একেবারে গোড়ায় এরকম একজন কথকের নাম পেয়েছি। তাঁর নাম সৌতি।

প্রথম মেয়েটি বলল, তিনি বুঝি বেদব্যাস ঋষির কাছ থেকে গল্পটা শিখে এসেছিলেন?

স্যার বললেন, না, তাও না। বেদব্যাস কী করে লিখলেন, তা জানো তো? তিনি নিজের হাতে লেখেননি। ঋষি বাল্মীকি কিন্তু রামায়ণ নিজের হাতেই লিখেছিলেন। বেদব্যাসের বোধহয় কিছু অসুবিধে ছিল।

পেছনের ছেলেটি বলল, বানান ভুল করতেন বোধহয়।

স্যার হেসে ফেলে বললেন, না, তা নয়। ঋষিরা কোথাও বানান ভুল করলেও সেটাকেই ঠিক বলে ধরে নিতে হয়। তাকে বলে আর্ষ প্রয়োগ। বেদব্যাসের বোধহয় আঙুলে ব্যথাট্যাথা ছিল, আর তিনি চাইছিলেন, ভুলে যাবার আগে পুরোটা একসঙ্গে লিখে ফেলতে। তাই তিনি গণেশকে অনুরোধ করলেন লিখে দিতে। দিনের পর দিন ধরে অতখানি লেখার ইচ্ছে গণেশের মোটেই ছিল না। কিন্তু এরকম অনুরোধ শুনলে না বলাও যায় না। বেদব্যাস অত বড় ঋষি! তাই গণেশ কায়দা করে বললেন, ঠিক আছে লিখতে রাজি আছি। কিন্তু মাঝখানে একটুও থামলে চলবে না, একটানা বলে যেতে হবে।

একটি ছাত্র বলল, ওরে বাবা, এত বড় গল্প একটানা? মাঝখানে যদি জল তেষ্টা পায়? কিংবা ইয়ে পায়?

মাস্টারমশাই বললেন, ঠিকই তো। তেষ্টা পেতে পারে, ইয়ে পেতে পারে, তা ছাড়া খিদেও তো পেতে পারে। দেবতাদের নাকি খিদে-তেষ্টা পায় না, কিন্তু মানুষদের তো পায়।

সেই ছাত্রটিই জিজ্ঞেস করল, দেবতাদের কেন খিদে পায় না?

মাস্টারমশাই কিছু বলার আগেই পৃথা নামের ছাত্রীটি বলল, তুই জানিস না কৌশিক, দেবতারা সবাই অমৃত খেয়েছেন। তাই সারা জীবনের মতন তাঁদের খিদে-তেষ্টা মিটে গেছে।

কৌশিক বলল, সেইজন্যই দেবতাদের ইয়েও পায় না!

মাস্টারমশাই বললেন, তখন বেদব্যাসও এক কায়দা করলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে গণেশ ঠাকুর! আমি একটানাই বলে যাব। কিন্তু আপনাকে সব শ্লোকের ঠিক ঠিক মানে বুঝে লিখতে হবে। গণেশ তাতেই রাজি। বেদব্যাস বলতে বলতে যখন বুঝতেন, এবার খিদে পাচ্ছে, তখনই একখানা দারুণ শক্ত শ্লোক বানাতেন। সেটা এমনই শক্ত, আধুনিক কবিতার চেয়েও শক্ত, মানে বুঝতে ঘাম বেরিয়ে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। গণেশ যতক্ষণ ঘাড় চুলকে মানে বোঝবার চেষ্টা করতেন, ততক্ষণ ব্যাসদেব খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়েও নিতেন। যাই হোক। এক সময় মহাভারত লেখা শেষ হল।

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, কতদিন লাগল? কত মাস, কত বছর?

স্যার বললেন, তা ঠিক জানি না। লেখা শেষ হওয়া মাত্রই তো গণেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বেদব্যাস সব গুছিয়ে টুছিয়ে রাখলেন। তখন তো কাগজ কিংবা কলম কিছুই ছিল না। লেখা হত শুকনো তালপাতার ওপর, বড় বড় পাখির পালক দিয়ে বানানো হত কলম। সে লেখাও বেশিদিন ঠিক থাকে না, অস্পষ্ট হয়ে যায়। তাই বেদব্যাস প্রথমে সবটা শিখিয়ে দিলেন তাঁর ছেলে শুকদেবকে। তারপর আর কয়েকজন শিষ্যকে।

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, ওই সৌতি নামে ভদ্রলোকও বুঝি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন?

স্যার বললেন, না। সৌতি ঠিক সাধারণ ভদ্রলোক ছিলেন না। তিনিও সাধু-সন্ন্যাসীদের মতন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন এক জঙ্গলে এসে হাজির হলেন। তার নাম নৈমিষ্যারণ্য। সেখানে অনেক ঋষি মিলে একটা যজ্ঞ করছিলেন। সারাদিন যজ্ঞটজ্ঞ করার পর ঋষিরা এক জায়গায় শুয়ে বসে আড্ডা মারতেন।

কৌশিক বলল, ঋষিরাও আড্ডা মারে?

অরূপ নামে অন্য একটি ছেলে বলল, এই কৌশিক, থাম না!

স্যার বললেন, না না, ঠিক আছে, মনে কিছু প্রশ্ন এলে বলে ফেলবে। হ্যাঁ, মুনি-ঋষিরাও আড্ডা মারতেন, পরনিন্দা-পরচর্চা করতেন, রাগারাগিও করতেন। সেদিন কিন্তু সৌতিকে দেখে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কারণ, সৌতির কাছ থেকে অনেক অচেনা দেশের গল্প শোনা যাবে। খাতির যত্ন করে সৌতিকে বসিয়ে তাঁকে কিছু খাবার দাবার দেওয়া হল। তারপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন? কোন্ কোন্ দেশ ঘুরলেন?

সৌতি বললেন, আমি মহারাজ জনমেজয়ের রাজসভায় সর্পযজ্ঞ দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে যা একখানা দুর্দান্ত গল্প শুনলাম।

এবার অরূপই জিজ্ঞেস করল, সর্পযজ্ঞ? সে আবার কী?

স্যার বললেন, তোমরা যেমন অবাক হচ্ছে, সেই মুনি-ঋষিরাও সেই একই কথা বলেছিলেন। অনেক রকম যজ্ঞের কথা শোনা যায়, কিন্তু সর্পযজ্ঞের কথা কেউ আগে শোনেননি। ব্যাপারটা হচ্ছে, জনমেজয় ছিলেন পাণ্ডব বংশেরই এক রাজা। তাঁর বাবার নাম ছিল পরীক্ষিৎ। এই পরীক্ষিৎ সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিলেন। বড় হয়ে সেই কথা শোনার পর জনমেজয় এমনই রেগে গেলেন যে, ঠিক করলেন পৃথিবী থেকে সব সাপ শেষ করে ফেলবেন। ঋষিদের ডেকে শুরু হল যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের আগুনে এসে ঝপাঝপ করে পড়তে লাগল হাজার হাজার সাপ!

কৌশিক হাসিমুখে বলল, গুড আইডিয়া। সাপ দেখলেই আমার ঘেন্না হয়। পৃথিবী থেকে সব সাপদের শেষ করে দেওয়াই তো উচিত।

স্যার বললেন, তা ঠিক নয়। পৃথিবীতে সব জন্তু-জানোয়ার, পাখি, পোকা-মাকড়দেরও কিছু কিছু ভূমিকা আছে। তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। একে বলে ইকোলজি ঠিক রাখা। যাই হোক, তারপর শোনো

অরূপ বলল, কই, সব সাপ তো শেষ হয়নি। এখনো কত সাপ... শান্তিনিকেতনেও সাপ দেখেছি।

স্যার বললেন, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তো সব সাপ মরেনি। মাঝপথে যজ্ঞটা

বন্ধ হয়ে যায়।

কেন?

সেটা বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। জনমেজয় তো অনেক কিছুই জানতেন না, তাই সেই সভাতেই ব্যাসদেবের এক শিষ্য মহাভারতের পুরো কাহিনিটা শোনালেন। সৌতি সেটা শিখে নিলেন, তাঁর মুখে আমরা শুনলাম।

পৃথা বলল, সেই শিষ্যের নাম বৈশম্পায়ন।

স্যার অবাক হয়ে বললেন, বাঃ, তুমি তো অনেক কিছু জানো দেখছি।

পৃথা বলল, আমি রাজশেখর বসুর লেখা মহাভারতের সারানুবাদ পড়েছি।

স্যার বললেন, চমৎকার বই। আমি তো ওই বইটা কতবার যে পড়েছি তার ঠিক নেই। তোমরা সবাই পড়তে পারো। আরও বড় হলে পড়বে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পূর্ণ মহাভারত। পৃথা, তোমার নামটাও তো মহাভারত থেকে নেওয়া। কুন্তীর আর এক নাম। তাঁর ছেলে পার্থ, অর্জুনের আর এক নাম।

অরূপ বলল, স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। ওই বৈশাপ্পন না বাসবপুন্নিয়া কী নাম বললেন যেন ব্যাসের শিষ্যর, তার কাছে একবার শুনেই সৌতির মুখস্ত হয়ে গেল? ক্যান ইউ বিলিভ ইট?

স্যার বললেন, বিশ্বাস করা শক্ত। মহাভারতের কাহিনি শুনে সৌতি এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে হয়তো, বৈশম্পায়ন-এর কাছে গিয়ে কয়েকবার আরও শুনে ঝালিয়ে নিয়েছিলেন। তবে, তখন এক ধরনের মানুষের কথা শোনা যেত, যাদের বলা হত শ্রুতিধর। তাঁরা সব কিছুই একবার শুনে মনে রাখতে পারত। তখনকার মানুষরা একটু অন্য রকম ছিল।

কৌশিক বলল, তারপর কী হল?

স্যার বললেন, সবটা তো আর এখন বলা যাবে না, সময় নেই। শুধু শুরুর কথাটা বলা হল। এখন কোনো কুইজে যদি জিজ্ঞেস করে, মহাভারত আমরা কার কাছ থেকে পেয়েছি, তাহলে ব্যাসদেব বললে কিন্তু ভুল হবে। বলতে হবে সৌতির নাম।

কৌশিক বলল, অনেক কুইজ মাস্টারই এই নামটা জানে না।

অরূপ বলল, একবার বাইরে যাব স্যার?

পৃথা বলল, স্যার, তার আগে বৈশম্পায়ন নামটা ঠিক মতন উচ্চারণ করতে বলুন।

অরূপ বলল, ঘুরে আসি। দেখবি, ঠিকঠাক বলব!

জানালায় এক স্কন্ধকাটা!

আমাদের মামাবাড়ির গ্রামে একটা পাখি সারারাত ডাকে। সেটা চোখ গেল পাখি। আরও কয়েকটা পাখি মাঝে-মাঝে ডেকে ওঠে। দিনের বেলা তাদের ডাক শোনা যায় না। শুধু রাত্তির বেলা।

মামাবাড়ির সেই গ্রামের নাম বাতাসপুর। নন্দুমামা বলেন, সে গ্রামের আসল নাম বাতাসাপুর। সেখানে ভালো বাতাসা তৈরি হয়, লোকের মুখে-মুখে নামটা বদলে গেছে। আমার অবশ্য বাতাসপুর নামটাই পছন্দ।

বাতাসপুর গ্রামটা ভারি সুন্দর! কাছাকাছি রেল স্টেশন নেই, সরাসরি কোনো বাসও যায় না। যাওয়া-আসার বেশ অসুবিধে। সেইজন্যই বোধহয় গ্রামটা এখনো সুন্দর আছে।

মুর্শিদাবাদের নবাবগঞ্জ স্টেশনে নেমে আরও খানিকটা যেতে হয় নৌকোয় চেপে। নদীর নাম শিবগঙ্গা। খুব ছোট নদী। গঙ্গার সঙ্গে কোনো মিলই নেই। সেই নৌকো চাপাটাই আমাদের কাছে খুব আনন্দের ব্যাপার, প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে পৌঁছতাম মামাবাড়ির ঘাটে।

এক সময়ে এই গ্রামে মুর্শিদাবাদের নবাবদের কয়েকটা বড়-বড় বাড়ি ছিল। নবাব বংশের লোকেরা এখানকার জঙ্গলে শিকার করতে আসতেন, তাই ওই বাড়ি বানিয়েছিলেন। এখন শিকার-টিকার সব বন্ধ, বাড়িগুলোও ভেঙেচুরে গেছে, তবে জঙ্গলটা এখনো আছে।

মামারবাড়িটাও বেশ বড়, তবে লোকজন প্রায় কেউই থাকে না। একমাত্র নন্দুমামা ছাড়া অন্য সব মামারা থাকেন শহরে। নন্দুমামা একলাই বাড়িটা আগলে রেখেছেন। এই বাড়িতে আমার মায়ের ছোটবেলা কেটেছে। তাই মা মাঝে-মাঝে আমাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন। আমার ছোটবোন মিনিও সঙ্গে থাকে।

এত বড় বাড়ি, কত ঘর খালি পড়ে আছে। আমরা ইচ্ছে করলে যে-কোনো ঘরে থাকতে পারি। আমি দুপুর বেলা সব ঘর ঘুরে-ঘুরে দেখি। সন্ধের পর কেমন যেন গা ছমছম করে।

একদিকের বারান্দা থেকে দেখা যায় নদীটা। অন্যদিকের একটা ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি জঙ্গল। ওই জঙ্গলের ভেতরে কখনও যাইনি। মনে হত, ওর মধ্যে বোধহয় বাঘ-ভাল্লুকরা লুকিয়ে থাকে। মা অবশ্য বলেছিলেন, ওসব আর এখন কিছু নেই। বড় জোর কয়েকটা হরিণ আর খরগোস থাকতে পারে।

নন্দুমামা অবশ্য উলটো কথা বলেন। তিনি বলেন, ওই জঙ্গলে ভূত আছে, তাই তো কেউ ভয়ে আর জঙ্গলের মধ্যে যায় না।

মা ধমক দিয়ে বলেন, নন্দু, তুই ছোট ছেলেমেয়েদের বাজে কথা বলে ভয় দেখাবি না! ভূত আবার কী? ভ্যাট!

নন্দুমামা বললেন, ছোড়দি, তোমার মনে নেই, ওই জঙ্গলের মধ্যে কত বড় একটা কবরখানা আছে? ওরে বাপরে, একবার আমি ভুল করে...

মা বললেন, কবরখানা থাকলেই বা-কী! কবর থেকে কেউ ভূত হয়ে উঠে আসতে পারে না। তোর মতন ভীতুরাই শুধু ওসব বিশ্বাস করে।

নন্দুমামা বললেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, আমি এক্ষুনি প্রমাণ দিচ্ছি। একটুক্ষণ চুপ করে থাকো!

রাত্তিরের খাওয়া হয়ে গেছে, আমরা বসেছি নন্দুমামার ঘরে।

নন্দুমামা উঠে গিয়ে দক্ষিণ দিকের দুটো জানালা খুলে দিলেন।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম এক-দু মিনিট, কিছুই শোনা গেল না। শুধু অনেক দূরে একটা চোখ গেল পাখি ডাকছে।

মা বললেন, কী হল রে?

নন্দুমামা বললেন, আর একটুক্ষণ চুপ করে থাকো! আমি একটু আগেই একবার শুনেছি। আবার শোনা যাবে।

কথা না বলে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। নিস্তব্ধ রাত, এখানে গাড়ি-টাড়ি চলে না, কোনো শব্দই নেই।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, ধ্যাৎ! ইয়ার্কি হচ্ছে আমাদের সঙ্গে, তাই না? চল, শুতে যাই।

মিনি এর মধ্যেই ঘুমে ঢলেছে।

আমি আর মা উঠে পড়ে দরজার কাছে গেছি, অমনি একটা কী যেন ডেকে উঠল খানিকটা দূরে।

নন্দুমামা উত্তেজিত ভাবে বললেন, ওই তো, ওই তো!

মা ভুরু কুঁচকে বললেন, ওই তো মানে কী? ওটা বোধহয় একটা পাখি!

নন্দুমামা বললেন, হ্যাঁ, পাখিই তো! পাখিটা কী বলল তা বুঝলে না?

মা বললেন, পাখি আবার কী বলবে? পাখিরা কত রকম ডাকে, তা কি আমরা বুঝি?

নন্দুমামা বললেন, ওই পাখিটা তিনবার ডাকে। আবার ডাকবে। এবার মন দিয়ে শোনো—

সত্যিই পাখিটা আরও দুবার ডেকে উঠল।

নন্দুমামা বললেন, এবার বুঝলে? পাখিটা বলছে, একটা খতম! একটা খতম!

ওটা একটা খুনির আত্মা। পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায়।

মা এবার রাগ করার বদলে হেসে ফেললেন।

নন্দুমামা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, নালু, তুই বুঝিসনি? পাখিটা বলছে, একটা খতম! একটা খতম!

আমার মনে হল, সত্যিই তো! যেমন চোখ গেল পাখিটা স্পষ্ট বলে চোখ গেল, তেমনি এই পাখিটাও তো ডাকল, একটা খতম! একটা খতম!

আমার শরীরে একটা ভয়ের ঝাঁকুনি লাগল। খুনির আত্মা!

মা হাসতে-হাসতে বললেন, তাই নাকি? পাখিটা ওই কথা বলছে? ওটা তো একটা প্যাঁচার ডাক। খুব বড় সাইজের প্যাঁচাকে আমরা বলি হুতুম প্যাঁচা। ওরা ডাকে ঘুট-ঘুটুম, ঘুট-ঘুটুম! তাই শুনে তোর মনে হল, একটা খতম! পাখি কখনও মানুষের মতো কথা বলে?

নন্দুমামা বললে, হ্যাঁ, বলেই তো! চোখ গেল পাখিটা ঠিক মানুষের মতোই তো চোখের কথা বলে চ্যাঁচায়!

মা বললেন, মোটেই ওরা চোখ গেল বলে না। ওটা আমাদের কল্পনা। পাটনা কিংবা দিল্লিতে ওই পাখিটাকেই বলে পিউ কাঁহা। ওরা তাই শোনে। সাউথ ইন্ডিয়ায় হয়তো আর একটা কোনো নাম আছে। এরপর শুনে দেখবি, মনে হবে, চোখ গেল-র বদলে পিউ কাঁহা বলছে।

মা আমার দিকে ফিরে বললেন, ট্রেনে যাওয়ার সময় মনে হয় না যে ট্রেনের চাকা কথা বলছে? মনে হয় বলছে, গোবিন্দপুর, আর কতদূর? গোবিন্দপুর আর কতদূর? সত্যিই কি তাই বলে, না আমরা কল্পনা করি?

আমি বললাম, একবার আমার মনে হয়েছিল, রেলের চাকা বলছে, আর পারি না, আর পারি না!

মা বললেন, তবে? আমরা যখন যেমন ভাবি, তেমনই মনে হয়। আসলে পাখিও কিছু বলে না, ট্রেনের চাকাও কিছু বলে না!

নন্দুমামা তবু হার না মেনে বললেন, ওই পাখিটা তা হলে দিনের বেলা ডাকে না কেন? শুধু রাত্তিরেই শোনা যায়!

মা বললেন, তুই গ্রামে থাকিস, তাও জানিস না? তার কারণ, প্যাঁচারা দিনের বেলা ডাকে না। দিনের বেলা ওরা চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাই কোনো এক জায়গায় লুকিয়ে চুপটি করে বসে থাকে। অন্ধকার হলে বেরোয়!

নন্দুমামা চুপ করে গেলেন বটে, কিন্তু মায়ের কথা পুরোপুরি মেনে নিলেন বলে মনে হল না!

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে আমি আরও কয়েকবার সেই পাখিটার ডাক শুনলাম। একবার মনে হয়, মায়ের কথাটাই ঠিক, পাখিটা ডাকছে ঘুট-ঘুটুম! আবার মনে হয়,

না তো, পরিষ্কার বলছে, একটা খতম! একটা খতম!

পরদিন সকালে মা বললেন, তুই কাল ঘুমের মধ্যে খুব ছটফট করছিলি কেন রে? ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিলি বুঝি?

আমি বললাম, কই, মনে নেই তো!

মা বললেন, অনেক স্বপ্নই মনে থাকে না। নন্দুটা ফের মাথার মধ্যে আজেবাজে কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই ভয়ের স্বপ্ন দেখতেই পারিস। সবসময় মনে রাখবি, পাখি কখনও ভূত হয় না! আজ তুই আর আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাব!

সকালবেলা লুচি আর আলুর দম আর বেলের পানা খাওয়া হল। এর মধ্যে লুচি আর আলুর দম খুব ভালো, কিন্তু বেলের পানা আমার পছন্দ হয় না। তবু খেতে হল।

মা বললেন, জুতো পরে নে। আমরা বেরুব।

মিনিকে তো রেখে যাওয়া যাবে না, সে আগে থেকেই তৈরি।

নন্দুমামা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ ছোড়দি?

মা বললেন, তোর এখন জানবার দরকার নেই। ফিরে এসে বলব!

নন্দুমামা বলল, রঘুকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

মা বললেন, আর কারুকে সঙ্গে যেতে হবে না। আমি কি রাস্তা হারিয়ে ফেলব নাকি?

মা এই গ্রামে বড় হয়েছেন, সবকিছু চেনেন। অনেক লোক মাকে চিনতে পারে। ডেকে কথা বলে।

আমরা হাঁটতে লাগলাম নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে।

সরু পথ, কিন্তু কাদা-টাদা নেই। মা আমাদের গাছ চেনাতে লাগলেন। কোনটা কদম ফুলের গাছ আর কোনটা কৃষ্ণচূড়া। একটা বড় ঝাঁকড়া বটগাছ।

মা বললেন, এক সময় এখানে অনেক শেয়াল থাকত। এখন আর শেয়াল দেখা যায় না। আর এই গাছের কোটরে থাকত তক্ষক। তক্ষক কাকে বলে জানিস তো? লোকে বলে সাপ। আসলে কিন্তু সাপ নয়। গিরগিটির মতন একটা প্রাণী, অনেকটা বড়। সেটা আবার ডাকত, তক্ষো, তক্ষো করে। খুব ছোটবেলা সেই ডাক শুনে ভয় লাগত। পরে যখন জেনে গেলাম যে, সাপ গল্প নয়, সাপেরা তো ডাকতে পারে না। তখন আর ভয় লাগত না।

এক জায়গায় দুটো বক বসে আছে জলের ধারে।

আর একটা খুব সুন্দর পাখি, তার পালকের অনেক রং, ওপরে ঘুরছে, আর কি রি রি রি করে ডাকছে।

মা বললেন, এই মাছরাঙা। ওপর থেকে দেখে-দেখে হঠাৎ এক সময় ঝুপ করে জলে ডুবে ছোট মাছ ধরে। ওর ডাকটা শুনে তোর কী মনে হল রে নীলু?

আমি বললাম, কি রি রি রি রি...

মা বললেন, কেউ-কেউ বলে, এটা হি হি হি হি। পেত্নিদের হাসির মতন। একবার আমার এক জ্যাঠামশাইকে এক মেঘলা দিনে পেত্নি তাড়া করে ছিল। উনি ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে এসেছিলেন, পেত্নিটা বলল, মাছ দে, মাছ দে, হি হি হি হি।

আমি বললাম, সত্যি পেত্নি তাড়া করেছিল?

মা বললেন, ধ্যাৎ! পেত্নি বলে আবার কিছু আছে নাকি? নিশ্চয়ই মাথার ওপর এই একটা মাছরাঙা পাখি ডেকে উঠেছিল। তাতেই জ্যাঠামশাই মাছের চুবড়ি ফেলে টেনে দৌড়! আগেকার দিনে লোকে বেশি-বেশি ভয় পেত!

মিনি একটু আগে লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গিয়ে দৌড়ে ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল মা, ওটা কী ডাকছে?

মিনি বলল, ওই যে খট খট খট...

সত্যি সেরকম একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু কোথা থেকে ডাকটা আসছে, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ ডাকটা বেশ জোরে।

মা বললেন, তোরা তো গ্রামে থাকিস না। তাই এসব কিছু জানিস না। ওটা তো কোলা ব্যাং। কোলা ব্যাং বেশ বড় সাইজের ব্যাং, ওই ডাকটার জন্য ওদের অনেকে সাহেব ব্যাঙও বলে। সেই যে একটা ছড়া আছে :

খোকা গেল মাছ ধরতে
বড় নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে,
মাছ নিয়ে গেল চিলে

কোলা ব্যাঙের ডাক তো শুনলিই আর ওই দ্যাখ, গাছের ডালে একটা চিল বসে আছে।

হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় আমরা পৌঁছে গেলাম জঙ্গলের ধারে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কী রে! এবার ফিরতে চাস নাকি? জল তেষ্টা পেয়েছে?

মায়ের সঙ্গে বেড়াতে এত ভালো লাগছে যে ফেরার কথা একবারও মনে হয়নি। মিনিও বলল, না, এখন ফিরব না। জল তেষ্টা পায়নি।

মা বললেন, চল, তাহলে আর একটা জিনিস দেখাই!

এবার পাশের একটা রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম।

একটা ভাঙা লোহার গেট, তার দু-পাশে পাঁচিলও ভেঙে পড়েছে।

সেই গেট দিয়ে ঢুকে মা বললেন, এটা কী বল তো? এটা সেই কবরখানা। আগে নবাব বংশের লোকদের এখানে কবর দেওয়া হত। অনেক দিন ব্যবহার হয় না। এখানে সহজে কেউ আসেও না।

চতুর্দিকে ছড়ানো অনেক কবর। মাঝে-মাঝে পাথর পোঁতা। কোনো-কোনো

পাথরে কিন্তু লেখাও ছিল, এখন আর পড়া যায় না, অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মা বললেন, মানুষ মরে গেলে তার দেহটাকে মাটির তলায় কবর দিলে তা আস্তে-আস্তে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। শুধু হাড়গুলো অনেক দিন থাকে। তাই থেকে মানুষের ধারণা, ওই হাড়ের কঙ্কাল বুঝি মাঝে-মাঝে মাটি ঠেলে ওপরে উঠে আসে, ভূত হয়ে ভয় দেখায়। আসলে লোকেরা মিছিমিছি ভয় পায়। সেই ভয় ভাঙাবার জন্যে এখানে রাত্তিরে আসতে হয়। কয়েকদিন এলেই বোঝা যায়, কঙ্কাল-টঙ্কাল কিছু ঘুরে বেড়ায় না, ভয়ও আর থাকে না।

মিনি জিজ্ঞেস করল, মা, তুমি কখনও এখানে রাত্তিরে এসেছ?

মা বললেন, আমার যখন বারো বছর বয়েস, এই নীলুর মতন, তখন একবার মামিদের সঙ্গে বাজি ফেলে রাত্তিরে এসেছিলাম এখানে। মামা আমাকে সেবার একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে। সেই ক্যামেরাটা এনেছিলাম, ভূত দেখলেই ছবি তুলব বলে। প্রায় দু-ঘণ্টা বসেছিলাম। শেষ পর্যন্ত কীসের ছবি তুললাম বল তো? দুটো শেয়ালের। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো ভূতের ছবি তুলতে পারেনি। কেন তুলতে পারেনি? কারণ, ভূত বলে কিছু নেই যে! সবই মনের ভুল।

আমরা এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। অনেক ছোট-ছোট গাছে ফুল ফুটেছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, একটুও ভয় করছে?

মিনি আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম, না!

তারপরেই একটা শব্দ শুনলাম, উঁ উঁ উঁ!

এটা কীসের শব্দ। মনে হয় মানুষেরই গলা।

শব্দটা আসছে একটা ঝোপের আড়াল থেকে। মা জোর পায়ে এগিয়ে গেলেন সেদিকে। আমরাও পেছনে-পেছনে।

একটা লোক সেখানে বসে আছে উবু হয়ে। মাথার চুল সব সাদা। একটা শুধু লুঙ্গি পরা, খালি গা। বুকের সবক'টা হাড় দেখা যায়।

মানুষ, না ভূত? কবরখানা থেকে উঠে এসেছে?

মা আস্তে-আস্তে বললেন, এ তো কাদের মিঞা! এক সময় খেয়া নৌকোর মাঝি ছিল। আহা রে, ওর ছোট ছেলেটা সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার পর ও পাগল হয়ে গেছে। ওর ছেলেকে এখানে কবর দেওয়া হয়েছে, তাই রোজ ও এখানে এসে কাঁদে। কত বছর হয়ে গেল।

মা বললেন, কী গো কাদের মিঞা, আমাকে চিনতে পার?

সে দু-দিকে মাথা নেড়ে-নেড়ে আরও জোরে-জোরে কাঁদতে লাগল।

কাদের মিঞা বোধহয় কথা বলতেই ভুলে গেছে।

মা বললেন, আহা, বোধহয় রোজ খেতেও পায় না, তাই এত রোগা হয়ে গেছে।

কে-ই বা খেতে দেবে। ওর তো আর কেউ নেই শুনেছি।

হাত ব্যাগ খুলে মা একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিতে বৃদ্ধটি কিন্তু সেটা নিয়ে নিল।

ফেরার পথে খানিকদূরে এসে আমি বললাম, মা, একটা সত্যি কথা বলব? ওই কাদের মিঞাকে দেখে প্রথমটা আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, বুকের মধ্যে দুম-দুম শব্দ হচ্ছিল।

মিনি বলল, আমারও।

মা হেসে বললেন, আমি না-থাকলে তোরা কী করতি? ভয়ে দৌড়ে পালাতিস নিশ্চয়ই। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলেই ভয় কেটে যায়।

ফেরার পর নন্দুমামাকে মিনিই গড়গড় করে সব বলে দিল। শেষে সে বলল, কবরখানায় আমরা একখানা ভূতও দেখেছি!

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই ভূত হাত বাড়িয়ে একশো টাকার নোটও নেয়।

নন্দুমামা বললেন, তোদের মা ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে, ছেলেদের চেয়েও ভালো গাছে চড়তে পারত। সাঁতরে নদী পার হত। হাত দিয়ে ব্যাঙ ধরত!

তারপর বললেন, কিন্তু ছোড়দি, তুমিও একদিন ভয় পেয়েছিলে, মনে আছে? সেই যে ছাদে...ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলে...

মা বললেন, হ্যাঁ, একদিন তো পেয়েছিলাম ঠিকই ঝড়ের রাতে। তাতে কী হয়েছে? ভয় পেতে পেতেই ভয় কেটে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কী দেখে ভয় পেয়েছিলে?

মা বললেন, একদিন সন্ধের পর ছাদে উঠেছিলাম। হঠাৎ মনে হল, একটা কাটা মুণ্ডু আমার দিকে হাঁ করে গড়িয়ে আসছে। ভয় তো পাবই। আসলে সেটা একটা মাটির হাঁড়ি, ঝোড়ো হাওয়ায় সেটা গড়িয়ে আসছিল।

নন্দুমামা বললেন, মোটেই সেটা হাঁড়ি নয়। একটা স্কন্ধকাটা। শরীরটা নেই। শুধু মুণ্ডু। আমি পরেও দুবার দেখেছি। তাই আমি এখন আর রাত্তিরে ছাদে যাই না। কিন্তু মাঝে-মাঝেই গড়গড় শব্দ শুনতে পাই।

মা বললেন, আজ আমরা রাত্তিরে সবাই মিলে ছাদে যাব।

নন্দুমামা বললেন, তখন হয়তো স্কন্ধকাটাটা থাকবে না!

এরপর দুদিন কেটে গেল।

নন্দুমামা আমাকে একা পেলেই নানারকম ভয়ের গল্প বলে। আর একটা রাত পাখির কক-কক-কক ডাক শুনিয়ে বলল, ওই আর একটা খুনির আত্মা! ও কী বলছে জানিস। রক্ত চাই, রক্ত চাই!

কিন্তু আমার আর ভয় করে না।

তারপর সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল।

দিব্যি ঘুমিয়ে ছিলাম। মস্ত বড় খাট। আমার পাশে মিনি, তার পাশে মা। শিয়রের কাছে আর পায়ের কাছে চওড়া-চওড়া জানালা।

হঠাৎ মাঝরাতে কেউ বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, একটা খতম! একটা খতম!

প্রথমে মনে হল, স্বপ্ন।

তারপর আবার দুবার শুনলাম ওই ডাক। খুব কাছেই।

ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, পায়ের কাছে একটা মানুষের মুখ। ভয়ংকর ধরনের। জ্বলজ্বল করছে চোখ, তীক্ষ্ণ নাক।

চোখে ভুল দেখছি? ভালো করে চোখ রগড়ে নিলাম। না, এখনও কটমট করে চেয়ে আছে আমার দিকে। দেহ নেই, শুধু মুণ্ডু।

এ তো মাটির হাঁড়ি হতে পারে না। হাঁড়ি জানালার কাছে ঝুলবে কী করে? এই সেই স্কন্ধকাটা। এটা তা হলে সত্যি?

আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় চিৎকার করে উঠলাম, মা!

বুকের মধ্যে যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে।

মা জেগে উঠতেই, কোনোক্রমে বললাম, ওই যে দ্যাখো জানলায়!

মা বললেন, ও এই! এই যাঃ-যাঃ! হুস! ভয় নেই নীলু, ভয় নেই!

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সে রাত্রিতে আমি জানালায় কী দেখেছিলাম? সেই প্রথম আমার হুতুম প্যাঁচা দেখা।

পরেও দেখেছি, হুতুম প্যাঁচার মুখ অবিকল কোনো বুড়ো মানুষের মতন। অন্ধকারে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে!

রেললাইনের পাহারাদার

হঠাৎ মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অরূপ। একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছে।

স্বপ্নটা ছোট। মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার কথা, কোনো কারণে সোমবার বিকেলেই বেরিয়ে গেছে। অরূপ তা জানতেও পারেনি। সে বিকেলবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরছে, শ্রীনিকেতনের মোড়ে দেখতে পেল তার তিন বন্ধু, রবি, অলোক আর সায়ন্তন হৈ হৈ করে যাচ্ছে, তাদের হাতে একটা বড় ভাঁড়, টপাটপ রসগোল্লা তুলে খাচ্ছে।

অরূপ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে? রসগোল্লা কে দিল?

সায়ন্তন বলল, আজ রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, জানিস না? রবি তিনটে লেটার পেয়েছে. ওর ঘাড় ভেঙে রসগোল্লা খাচ্ছি!

অরূপ দারুণ অবাক হয়ে বলল, সে কি? আজই রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে? তোরা আমায় ডাকলি না? আমার রেজাল্ট কী হয়েছে?

তিন বন্ধু থমকে গেল। তাকাল এ ওর মুখের দিকে। তারপর চলে গেল হনহন করে, অরূপকে কিছুই বলল না।

স্বপ্ন এখানেই শেষ।

অরূপ ঝিম মেরে বসে ভাবতে লাগল, এর মানে কী?

ওরা তার এতই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওরা কথা না বলে চলে যাবে? তাকে একটা রসগোল্লাও দিতে এলো না?

রবি তিনটে লেটার পেয়েছে, সে তো এমন কিছু ভালো ছাত্র নয়। যাই হোক, পেয়েছে, খুব আনন্দের কথা। কিন্তু ওরা অরূপের রেজাল্টটা দেখে আসেনি?

এবারে অরূপের সারা শরীর কেঁপে উঠল।

এ স্বপ্নের একটাই মানে হয়। অরূপ ফেল করেছে।

এর আগে, পরীক্ষা শুরু হবারও আগে, অরূপ আর একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। সেটা পরীক্ষার হলের স্বপ্ন। কোশ্চেন পেপার দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু অরূপ খাতায় কিছু লিখতে পারছে না। তার পেনে কালি নেই। আর একটা পেন জোগাড় হল, তবু এগোচ্ছে না লেখা। সব জানা প্রশ্ন, তবু মনে আসছে না উত্তর। লাস্ট বেল পড়ে গেল, তখনও অরূপ একটা উত্তরও শেষ করতে পারেনি।

এ স্বপ্নটা অবশ্য মেলেনি। সব কটা পরীক্ষায় অরূপ সব প্রশ্নেরই উত্তর লিখতে পেরেছে। শুধু ভূগোলে বাদ গেছে পাঁচ নম্বর। সেটা এমন কিছু না।

কিন্তু এবারের স্বপ্নটা অন্য রকম। বন্ধুরা কেন তাকে ত্যাগ করল?

সত্যিই কি অরূপ ফেল করতে পারে? সবাই জানে, সে ভালো ছাত্র। কিন্তু এবারের অঙ্ক পরীক্ষাটা অন্য রকম। কাটা কাটা উত্তর দিতে হবে। একটা ভুল হলেই পর পর অনেকগুলোই ভুল হতে পারে। যদি এবারে সে রকম ভুল হয়ে থাকে? তার মানে কি অঙ্কে ফেল?

অনেক স্বপ্নই সকালবেলা আর মনে থাকে না।

কিন্তু এই স্বপ্নটা অরূপের মনে গেঁথে রইল। যত বেলা বাড়ছে, ততই তার ধারণা হচ্ছে, সত্যিই অঙ্ক পরীক্ষা তার খুব খারাপ হয়েছে। সব উত্তরই ভুল। অঙ্কে ফেল মানে তো একেবারেই ফেল।

এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে, সে আর বাড়ি থেকেই বেরুলো না। খেলতেও গেল না। রবি আর সায়ন্তনরা ডাকতে এলো, তাও গেল না সে। জানালার কাছে বসে রইল চুপ করে। রাস্তা দিয়ে কত মানুষ-জন যাচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ গল্প করছে। কাল বাদে পরশুই এই লোকগুলো এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলবে, এ বাড়ির ছেলেটা ফেল করেছে।

পাশের বাড়ির দীপাও পরীক্ষা দিয়েছে এবার। সে এইমাত্র অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে চলে গেল পাশ দিয়ে।

অন্য দিন হলে অরূপ ওকে ঠিক ডাকত। আজ নিজে সরে গেল জানালা থেকে। দীপা ভালো ছাত্রী। নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট করবে। ফেল করা ছেলে অরূপ ওকে মুখ দেখাবে কী করে?

দীপা ভর্তি হবে উচ্চ মাধ্যমিকে, আর অরূপ পড়ে থাকবে সেই পুরোনো স্কুলে? টিচাররাও ভালো করে কথা বলবেন না তার সঙ্গে। ইংরেজির স্যার কত ভরসা করেছিলেন তার ওপরে।

মা আজ বিকেলে একটা নতুন জামা কিনে এনেছেন। ফেল করার খবর পেয়ে মা কি ওই নতুন জামাটা আর পরতে বলবেন?

বাবা এখানে নেই। অফিসের কাজে গেছেন দিল্লি। বাবা কত আশা করে বসে আছেন। যাবার আগে বাবা বলে গিয়েছেন, খোকা, তোকে কিন্তু দশজনের মধ্যে স্ট্যান্ড করতে হবে।

একা একা অনেকক্ষণ কাঁদলো অরূপ। তারপর অন্ধকার নামলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। মাকে বলল, এক বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে।

একা একা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল রাস্তায় রাস্তায়। এক জায়গায় কিসের একটা ফাংশন হচ্ছে, কেউ গাইছে বেশ ভালো একটা গান, অরূপ সেখানে একটু দাঁড়াল।

তার ভালো লাগল না। আজ তার কিছুই ভালো লাগছে না।

গরম গরম সিঙ্গাড়া ভাজছে একটা দোকানে। অরূপ সিঙ্গাড়া এত ভালোবাসে, কিন্তু এখন ইচ্ছেই করল না। পৃথিবীতে তার ভালো লাগার মতন আজ কিছুই নেই।

এক সময় সে এসে পড়ল রেল লাইনের ধারে।

সেই লাইন ধরেই হাঁটতে লাগল। স্টেশন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। জায়গাটা একেবারে নির্জন। অরূপ মন ঠিক করে ফেলেছে, এই জায়গাটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক। হয়তো কাল সকালের আগে কেউ টেরও পাবে না।

সে প্রথমে বসল। তারপর দু' লাইনের মাঝখানে গিয়ে, একটা লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। সে আর বেঁচে থাকতে চায় না।

একটু পরেই আসবে বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার। এই ট্রেনটা সাধারণত লেট করে না।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অরূপ। দেখতে পাচ্ছে আকাশ। আজ আকাশে মেঘ নেই, জ্বলজ্বল করছে অনেক তারা। মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়? এই সব তারাগুলো পেরিয়ে, আরও দূরে? কিংবা কোথাও যায় না, এখানেই সব শেষ?

একটু পরেই শোনা গেল ট্রেনের শব্দ। আসছে, আসছে, লোহার রথ। বেশি ব্যথা লাগবে না, এক মিনিটেই ওপর দিয়ে চলে যাবে। ফেল করে বেঁচে থাকার চেয়ে, এই মৃত্যু অনেক ভালো।

ট্রেনটা একেবারে কাছে এসে গেছে, শোনা যাচ্ছে ফোঁস ফোঁস শব্দ। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। অরূপ গুণছে, এক—দুই—তিন।

হঠাৎ বিকট শব্দ করে থেমে গেল ট্রেনটা।

কী ব্যাপার, এ ভাবে তো ট্রেন থামে না। অন্ধকারে তাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সার্চলাইটে দেখতে পেলেও থামানো যায় না।

অরূপ মুখ ফিরিয়ে দেখল, একজন বেশ লম্বা, কুচকুচে কালো চেহারার মানুষ, তার হাতে একটা লাঠি, দু' হাত তুলে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, এই রেল, আরও একটু দাঁড়িয়ে থাক!

তারপর সেই লোকটি অরূপের কাছে এসে তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল।

বিকট ভাবে বলল, হতভাগা ছেলে, পরীক্ষায় ফেল করেছিস নিশ্চয়ই? সারা বছর পড়াশুনোর নাম নেই, রেজাল্ট বেরুবার আগে অমনি সুইসাইড করার চেষ্টা! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!

বেড়াল যেমন তার বাচ্চাকে ঘাড় কামড়ে নিয়ে যায়, এই লোকটিও তেমনি এক হাতে অরূপের জামার কলার ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। লোকটি খুবই শক্তিশালী বোঝা যায়! অন্য হাত তুলে সে আবার বলল, এই রেল, এবার যা!

লোকটি গিজগিজ করে বলতে লাগল, মরতে চাস ভালো কথা। আমার

রেললাইন নোংরা করবি কেন? ফেল করেছিস, শাস্তি পেতে হবে। আরও অনেক কষ্ট করে মরতে হবে। তোকে আমি জলে ডুবিয়ে মারব।

খানিকটা দূর গিয়ে সে অরূপকে দু' হাতে তুলে ছুঁড়ে দিলে একটা পুকুরে।

কিন্তু অরূপ জলে ডুবে মরবে কী করে, সে সাঁতার জানে।

অরূপ সাঁতার কেটে পুকুরের অন্য একটা দিকে ওঠবার চেষ্টা করতেই লোকটি সেখানে দৌড়ে এসে হাতের লাঠিটা দিয়ে অরূপকে আবার জলে ফেলে দিল।

অরূপ আবার সাঁতরে গেল অনেকটা দূরে।

আর একটা দিকে উঠতে যেতেই লোকটি সেখানেও এসে লাঠির খোঁচা দিল।

এই রকম চলল কয়েকবার।

আর একবার অরূপ পাড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই লোকটি আর বাধা দিল না।

সে বলল, নাঃ, তুই ভালোই সাঁতার জানিস দেখছি। জলে ডুবে মরবি না। তুই তালগাছে চড়তে পারিস?

অরূপ বলল, না।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, কোনোদিন চড়িসনি?

অরূপ বলল, না। কখনো চেষ্টাও করিনি।

লোকটি খলখল করে হেসে উঠে বলল, বাঃ! তা হলে তো আর একটা ভালো উপায় পাওয়া গেছে।

এবারে লোকটি অরূপকে তুলে নিয়ে সরসর করে একটা তালগাছে উঠে গেল।

একেবারে ওপরের একটা ডালে অরূপকে বসিয়ে দিয়ে সে আবার নেমে গেল তাড়াতাড়ি।

তারপর হাততালি দিতে দিতে বলল, এইবার? এখন কী করবি বল!

তালগাছটা খুব উঁচু। তলার দিকে তাকালেই বুক কাঁপে। এখান থেকে অরূপ নামবে কী করে?

এই লোকটিই বা কে? ভূত কিংবা দৈত্য? যাঃ, ওসব আবার কিছু আছে নাকি? মানুষই নিশ্চয়ই। কিন্তু এ কী রকম মানুষ!

অরূপ বলল, আমি এখান থেকে নামতে পারব না। আমায় একটু সাহায্য করুন, প্লিজ!

লোকটি বলল, কেন সাহায্য করব! তুই তো মরতেই চেয়েছিলি!

অরূপ বলল, কিন্তু এখান থেকে পড়ে গেলে যদি না মরি? হাত-পা ভেঙে চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে থাকব। সে তো আরও খারাপ।

লোকটি বলল, সে আমি কী জানি! কোনটা খারাপ, কোনটা ভালো, তা তুই বুঝবি!

এত লম্বা গাছ বেয়ে নামার সাধ্য অরূপের নেই। নির্ঘাৎ হাত পিছলে যাবে। পড়ে

গিয়ে মাথায় চোট লাগলে অনেকে মরে না। কিন্তু ব্রেন নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ চেনা যায় না, কোনো কিছু মনে রাখা যায় না। তার এক কাকা আছে এই রকম। তাঁকে দেখলেই কষ্ট হয়।

অরূপ ভাবল, তার চেয়ে এই ডালে বসে থাকাই অনেক ভালো। এই লোকটা নিষ্ঠুর। কিন্তু সকাল হলে অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করবে। শুধু দেখতে হবে, ঘুম না এসে যায়।

নাঃ, অরূপ কিছুতেই ঘুমোবে না।

লোকটি যেন ঠিক তার মনের কথাটা বুঝে ফেলেছে।

হাসতে হাসতে বলল, তুই বুঝি ভেবেছিস, গাছের ডালে বসেই সারা রাত কাটিয়ে দিবি? সে গুড়ে বালি! ওই গাছের কোটরে দুটো বিষাক্ত সাপ আছে। বেশি নড়াচড়া করলেই তারা বেরিয়ে আসবে। সাপের কামড়ে মরতে চাস তো তাই মর!

অরূপ আঁতকে উঠে বলল, সাপ?

লোকটি বলল, আমি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না। সত্যি দুটো সাপ আছে!

অরূপ এ পৃথিবীতে সাপকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। সাপ দেখলেই তার গা গুলোয়। শেষ পর্যন্ত সাপের কামড়ে মরতে হবে!

এবারে অরূপ কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিন। আমি তো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি!

লোকটি বলল, আমার ক্ষতির প্রশ্ন হচ্ছে না। তুই রেল লাইন নোংরা করছিলি। মরতে চেয়েছিলি, যে কোনো একটা ভাবে মরলেই তো হল।

অরূপ বলল, আমি ভুল করেছি। বাড়িতে আমার মা-বাবা আছেন। একটা ছোট বোন আছে। তারা খুব কষ্ট পাবে!

লোকটি বলল, ও, যখন রেল লাইনে মাথা দিয়েছিলি, তখন বুঝি মা-বাবার কথা মনে ছিল না?

অরূপ বলল, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি মরে গেলে আমার মা-ও কেঁদে কেঁদে মরে যাবে!

লোকটি বলল, ওসব আমি জানি না। সাপের কামড়ে মরবি, না তালগাছ থেকে পড়ে মরবি, এই দুটোর একটা বেছে নে!

অরূপের মনে হল, সে যেন হিস হিস শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মনের ভুল? নাকি সত্যিই সাপ দুটো বেরিয়ে আসছে?

অরূপ অবশ্য এটা জানে যে সাপকে আঘাত না করলে কিংবা ভয় না দেখালে তারা এমনি এমনি কামড়ায় না। সাপ দুটো যদি বেরিয়ে পড়ে, তাহলে নিশ্বাস বন্ধ করে একেবারে চুপ করে বসে থাকতে হবে। একটুও নড়াচড়া করলে চলবে না।

কিন্তু সেভাবে কি সারা রাত বসে থাকা যায়?

হিস হিস শব্দ হচ্ছে ঠিকই। মনের ভুল নয়।

অরূপ আর দেরি করল না।

খুব সাবধানে, প্রায় শব্দ না করে সে ডালটা ছেড়ে গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরল। নামতে গিয়ে যদি পড়ে যায়, যদি হাত-পা ভাঙে, সেও সাপের বিষের চেয়ে ভালো।

দু' হাতে তালগাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরেছে, পা দুটোও আঁট করে রেখেছে, তারপর অরূপ নীচে নামছে একটু একটু করে।

হাত দুটো জ্বালা করছে, পা দুটোও খুলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তবু অরূপ দাঁতে দাঁত চেপে আছে। তাকে নামতেই হবে। খুব বেশি মনে পড়ছে মায়ের মুখখানা।

প্রায় অর্ধেকটা নেমে এসেছে অরূপ। হঠাৎ বেশ জোরে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে একটা লম্বা সাপ।

আজ জ্যোৎস্না রাত, দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

ব্যস, সেই সাপ দেখেই অরূপের মনের জোর শেষ হয়ে গেল। আলগা হয়ে গেল হাত। পায়েও আর জোর নেই।

সে পড়ে যাচ্ছে। সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেও সে ভাবল, মাথায় যেন চোট না লাগে! হাত-পা সবই কি ভাঙবে?

অরূপের শরীরটা মাটি ছুঁলো না, তার আগেই তাকে লুফে নিয়েছে সেই কালো লোকটি।

অরূপকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বলল, বাঃ, প্রায় তো পেরে গিয়েছিলি। প্রথমবারের পক্ষে ভালোই। সাপ দেখে অত ভয় পেলি কেন? সাপ চিনতে হয়। ওটা ঢ্যামনা সাপ, ওর বিষ নেই, সহজে কামড়ায়ও না।

অরূপ কোনো কথা বলতে পারছে না। সে এখনো যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে সে বেঁচে আছে। তার হাত-পা কিছুই ভাঙেনি!

লোকটি অরূপের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, এটা তো হল! এরপর তোকে আর কোন ভাবে মারব? গায়ে আগুন লাগিয়ে দেব?

অরূপ লোকটির দু' হাত জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন, প্লিজ! আমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি বাড়ি যাব।

সে বলল, বাঃ, তুই তো মরতেই চেয়েছিলি! তোর তো আর বাড়ি ফেরার কথা না! আগে মায়ের কথা মনে পড়েনি?

অরূপ বলল, ওসব আর জিজ্ঞেস করবেন না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

সে বলল, তুই এত ভালো সাঁতার কাটতে পারিস, তালগাছ থেকেও নামতে পারিস, আর পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস না? একবার না পারলে দু' বারেও তো পাশ করা যায়। যেমন কেউ একবারে সাঁতার শেখে না। তালগাছেও একবারেই ওঠা-

নামা শেখা যায় না।

অরূপ বলল, আমি সামনের বছর আবার পরীক্ষা দেব! এখন আমি বাড়ি যাই?

সে বলল, ইস, আর দেরি সইছে না। প্রাণটা চলে গেলে কী হত? একবার গেলে আর কি প্রাণ ফেরত পাওয়া যায়? যাঃ, এবারের মতন ছেড়ে দিলাম। বাড়ি যা।

অরূপ কয়েক পা চলে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি কে? জিজ্ঞেস করতে পারি?

সে বলল, কে আবার? আমি রেললাইনের পাহারাদার। এই পরীক্ষা-টরিক্ষার রেজাল্ট বেরুবার সময় আমাকে বেশি করে পাহারা দিতে হয়। এই সময়েই তো কয়েকটা ন্যাকা ছেলে-মেয়ে ফেল করবার ভয়ে রেললাইন নোংরা করতে আসে। ওদের দেখলেই আমার এত রাগ হয় যে ইচ্ছে করে আমি নিজেই লাঠি মেরে ওদের মাথা গুঁড়ো করে দিই! শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলে সবাই তখন মায়ের কথা বলে। আর ওই মায়ের কথা শুনলেই আমার মনটা দুর্বল হয়ে যায়। যা, দৌড়ো, দৌড়ো, মা অপেক্ষা করছে তোর জন্য!

অরূপ দৌড় শুরু করল।

কখনও সে বাড়ি ফিরতে এত রাত করে না। তার মা আর ছোট বোন চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

জল-কাদা মাখা অরূপের প্যান্ট-শার্ট দেখে মা অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি?

অরূপ আমতা আমতা করে বলল, এক বন্ধুর বাড়িতে। খুব বৃষ্টিতে ভিজতে হল, এক জায়গায় মাঠের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম।

ক'দিন ধরে ঝড়-বৃষ্টির নাম নেই, সবাই গরমে ছটফট করছে। তবু অরূপ বৃষ্টিতে ভিজবে কী করে?

মা আর বেশি কথা বাড়ালেন না।

রেজাল্ট বেরুল ঠিক বুধবারেই।

অরূপ রেজাল্ট দেখতে যায়নি। সে তো জানেই সে ফেল করেছে। সে ঠিক করে ফেলেছে, পরের বছর আবার পরীক্ষা দেবে।

বিকেলের দিকে হৈ হৈ করতে করতে এলো দশ-বারোজন স্কুলের বন্ধু। অরূপের স্বপ্নটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে গেছে।

সে তো পাশ করেছে বটেই, চারটে লেটার মার্ক পেয়েছে। তার মধ্যে একটা অঙ্কে।

সে প্রথম দশজনের মধ্যে আসতে পারেনি বটে, কিন্তু বীরভূম জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে অরূপ ঘোষাল!

একটা বাজে স্বপ্নের জন্য অরূপ যে কী ভুল করতে যাচ্ছিল, তা আর বলল না

কারুকে। মা যখন সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তখন অরূপ মনে মনে ভাবছে, রেললাইনের ধারে আর একদিন যেতে হবে রাত্তির বেলা। দেখতে হবে, সত্যিই সেরকম কোনো পাহারাদার আছে কি না। নাকি সেটাও স্বপ্ন।

আর যদি তার দেখা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে একটা প্রণাম করে আসতে হবে।

দিদিমার কোলে গাঁদাফুলের মালা

সারারাত ধরে শোনা যাচ্ছে হাতির ডাক। এর মধ্যে কি কেউ ঘুমোতে পারে? বাবা-মায়ের সঙ্গে বিল্টুও জেগে আছে।

তাকে অনেকবার ঘুম পাড়াতে পাঠানো হয়েছে। সে তবু উঠে-উঠে চলে আসছে বারান্দায়। চা-বাগানের মধ্যে বিশাল বাংলো। সব আলোগুলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। গেটের কাছেও জ্বলছে দুটো বড়-বড় আলো।

সন্ধে থেকেই খবর পাওয়া গেছে, চা-বাগানের একপাশে ছোট পাহাড়টার নীচে জমায়েত হয়েছে একটা হাতির পাল। দুটো-চারটে নয়, দূর থেকে দেখে আন্দাজ করা হয়েছে, কুড়ি-পঁচিশটা তো হবেই। কেন তারা এসেছে, কী তারা চায়, বোঝা যাচ্ছে না।

সেখান থেকে খানিকটা দূরেই বাগানের শ্রমিকদের বস্তি। হাতিরা যদি একবার সেই বস্তির কাছে চলে আসে, তা হলে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। প্রাণের ভয়ে শ্রমিকরা তির কিংবা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারবে হাতিদের দিকে। কিন্তু ওইভাবে কি কুড়ি-পঁচিশটা হাতিকে তাড়ানো যায়? বরং তারা রেগে গিয়ে আরও তেড়ে আসবে, সব ঘর-বাড়ি ভেঙে দেবে, মানুষও মরবে অনেক।

চা-বাগানের ম্যানেজার চন্দ্রমোহন দত্ত সন্ধেবেলা থেকেই রয়েছেন সেই জায়গাটার কাছাকাছি। তিনি শ্রমিকদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত রাখছেন। আগে থেকে হাতিদের কিছুতেই যেন রাগিয়ে দেওয়া না হয়। ওরা হয়তো নিজে থেকেই চলে যাবে। যদি হাতিরা ভেতরের দিকে চলে আসে, তখন ব্যবস্থা নিতেই হবে। দত্তসাহেবের সঙ্গে রয়েছে দু-জন রাইফেলধারী গার্ড। রাইফেলের গুলি চালিয়ে হাতিদের না মেরেও ভয় দেখানো যায়।

এই বাংলোর গেটেও একজন রাইফেল হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বাবা, হাতিরা ঘর-বাড়ি ভেঙে দেয় কেন? ওদের নিজেদের তো ঘর নেই!

বাবা বললেন, ওরা তো শুধু-শুধু মানুষের ঘর-বাড়ি ভাঙে না। পাশ দিয়ে চলে যায়। তবে ওদের যাওয়া-আসার পথে যদি কেউ নতুন করে ঘর বানায়, তা হলে ওরা ভেঙে দেয়। ওদের রাস্তা বন্ধ হলে ওরা তো বিরক্ত হবেই।

বিল্টু আবার জিজ্ঞেস করল, ওরা সবসময় রাস্তায় থাকে? ওদের ঘর-বাড়ি নেই কেন?

মা বললেন, ওদের ঘর-বাড়ি লাগে না।

বিল্টু বলল, তা হলে ওরা বৃষ্টির সময় কী করে?

মা বললেন, বৃষ্টিতে ভেজে। অনেক সময় গাছতলায় দাঁড়ায়। তাতেও অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজতে হয়।

বিল্টু বলল, বৃষ্টি-ভিজলে ওদের ঠান্ডা লাগে না? সর্দি হয় না?

বাবা হেসে বললেন, হাতির সর্দি হয়, তা তো কখনও শুনিনি! সর্দি হলে যদি হাঁচতে শুরু করে, তা হলে কী বিরাট জোরে শব্দ হবে!

মা বললেন, বাঘ-সিংহ, ভাল্লুক, কুকুরের মতন জন্তু-জানোয়াররাও তো বাড়ি বানাতে জানে না। ওদেরও বৃষ্টি-ভিজলে কোনো ক্ষতি হয় না। ওদের চামড়াও মোটা হয়।

বিল্টু বলল, কিন্তু পাখিরা তো বাসা বানায়।

বাবা বললেন, তাই তো! ঠিক। তার মানে পাখিরা জন্তু-জানোয়ারদের চেয়ে অনেক বেশি সভ্য।

মা বললেন, মোটেই না। জন্তু-জানোয়ারদের বাচ্চা হয়। আর পাখিরা ডিম পাড়ে। থাকেও গাছের ওপরে। ডিমগুলো তো কোথাও রাখতে হবে। নইলে মাটিতে পড়ে ভেঙে যাবে। সেই জন্যই ওরা বাসা বানায়। পাখিদের বাসাতে কিন্তু ছাদ নেই। ওদেরও ভিজতে হয় বৃষ্টিতে।

আবার শোনা গেল হাতির ডাক, এক সঙ্গে অনেকগুলির। এবার মনে হল যেন ওরা কিছুটা কাছে চলে এসেছে।

মা ভয়-ভয় চোখে তাকাতেই বাবা বললেন, কাছে আসেনি। তা হলে বন্দুকের শব্দ শোনা যেত। রাত্তির হয়ে গেলে সব আওয়াজই একটু কাছের মনে হয়।

বিল্টু বলল, বাবা, হাতিরা মানুষদের মারে কেন?

বাবা বললেন, মানুষরাও যে হাতিদের মারে। বিনা কারণে, এমনি-এমনি। আগেকার দিনে মানুষরা গুলি করে কত হাতি মেরেছে। এখন অবশ্য নিষেধ হয়ে গেছে হাতি শিকার।

মা বললেন, আমার দিদিমার কাছে গল্প শুনেছি, সেই সময় তাঁদের বীরভূমের গ্রামের বাড়িতে দুটো পোষা হাতি ছিল। তাদের নাম কার্তিক আর গণেশ। হাতি যখন পোষ মানে, তখন তারা খুব শান্ত আর ভদ্র হয়।

বাবা বললেন, ভদ্র?

মা বললেন, হ্যাঁ, ভদ্রই তো। ছোট ছেলেমেয়েরা সামনে পড়লে থেমে যেত। দিদিমা যখন ছোট ছিলেন, তখন দেখেছেন, ওই কার্তিক আর গণেশ শুঁড় দিয়ে গাছ থেকে ফল পেড়ে নিজেরা না খেয়ে দিদিমাদের দিত। দিদিমা ওই হাতিদুটোর পিঠে চেপে ঘুরেছেন।

বাবা বললেন, হাতি পোষার খরচ কম নাকি? প্রচুর খেতে দিতে হয়। তোমার দিদিমার বাবা জমিদার ছিলেন। তাই পেরেছিলেন। এখন আর কেউ পোষে না।

মা বললেন, হাতিদের কিন্তু দারুণ স্মৃতি শক্তি। সবকিছু মনে রাখতে পারে। একটা ঘটনা শুনবে? দিদিমা'র বাবার মৃত্যুর পর বিক্রি করে দেওয়া হল হাতিদুটো। বাড়ির সবাই তখন কেঁদেছিল। হাতিদেরও চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

বাবা বললেন, আগেকার দিনের এইসব পোষা হাতিদের নিয়ে অনেক গল্পটল্প ছিল। আমরাও স্কুলে এ-রকম 'আদরিণী' নামে একটা গল্প পড়েছি।

বিল্টু জিজ্ঞেস করল, হাতিদুটো কে কিনল?

মা বললেন, একটা সার্কাস কোম্পানি! এমনি লোকেরা তো তখন হাতি পোষে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সার্কাসের দল তো ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। কোথায় তারা চলে গেল কার্তিক আর গণেশকে নিয়ে। সেই সার্কাসের দলটার নামটাও কেউ মনে রাখেনি। তারপর সাত-আট বছর কেটে গেছে। দিদিমা বিয়ে হওয়ার পর চলে এসেছেন কলকাতায়। প্রত্যেক বছর শীতকালে পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাসের দল আসে। দিদিমারা একবার বাড়ি থেকে দল বেঁধে সার্কাস দেখতে গেছেন। সেই সার্কাসে বাঘ-সিংহের খেলাও ছিল। একেবারে শেষে হাতির খেলা। দুটো হাতি বল লোফালুফি করছে।

দিদিমা উত্তেজিতভাবে দাদুকে বললেন, জানো, আমার বাপের বাড়িতে ঠিক এ-রকম দুটো হাতি ছিল।

দাদু হেসে বললে, এই দুটোই নাকি?

তারপরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। হাতিদুটো হঠাৎ খেলা থামিয়ে নেমে আসতে লাগল দর্শকদের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গেই তো চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি, ভয়ে সবাই পালাবার চেষ্টা করল। দিদিমারা বসেছিলেন একেবারে সামনের দিকে। ওরা ভিড় ঠেলে যেতে পারছেন না। হাতিদুটো খুব কাছে এসে শুঁড় তুলে ডেকে উঠল। একজনের শুঁড়ে জড়ানো ছিল একটা গাঁদাফুলের মালা, সেই মালাটা সে আস্তে করে ফেলে দিল দিদিমার গলায়। তার মানে, ওই হাতিদুটো সত্যিই কার্তিক, গণেশ। ওরা দিদিমাকে চিনতে পেরেছে!

বাবা বললেন, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? সাত-আট বছর পরেও মনে রাখবে? তোমার দিদিমারও তো চেহারা তখন বদলে গেছে। এটা তোমার দিদিমা গুল মেরেছেন!

মা রেগে গিয়ে বললেন, কী, আমার দিদিমা গুল মারবেন?

বাবা বললেন, কেন, দিদিমা-ঠাকুমারা গুল মারতে পারেন না? শুধু ছোটরাই গুল মারে?

মা বললেন, তুমি কিছুই জানো না, শোনো না। হাতিরা শুধু চেহারা নয়, গায়ের

গন্ধও মনে রাখে।

বিল্টু খিলখিল করে হাসতে লাগল।

এই সময় বাংলোর হেড-কুক একটা ট্রে-তে করে কয়েকটা কাপ আর একটা ফ্লাস্ক এনে জিজ্ঞেস করল, সাহেবরা তো জেগে বসে আছেন, কফি খাবেন নাকি, বানিয়ে আনলাম।

হেড-কুকের নাম সুলতান, তার অনেক বয়েস, কিন্তু চেহারাটা বেশ শক্তপোক্ত, সে দারুণ রান্না করে। এ-দেশ থেকে আসল সাহেবরা চলে গেছে বহুদিন আগে, তবু কর্তাব্যক্তিদের এরা সাহেবই বলে।

বাবা খুশি হয়ে বললেন, কফি এনেছ, বাঃ! দাও, দাও! অত হাতির ডাক শুনলে কি আর ঘুমোনো যায়?

সুলতান কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে বলল, আপনারা বেড়াতে এসেছেন, আপনাদের অসুবিধে হবে ঠিকই। আমরা প্রায় রাত্তিরেই হাতির ডাক শুনি, চিতা বাঘের ডাক শুনি, তার মধ্যেই আমাদের দিব্যি ঘুম আসে। অবশ্য আজ আমাদের দত্তসাহেব যতক্ষণ না ফেরেন, ততক্ষণ আমাদের জেগে থাকতে হবে। ফিরে এসে উনি হয়তো স্নান করার জন্য গরম জল চাইবেন, কিংবা কফি খাবেন।

মা বললেন, এখানে বাঘও আছে নাকি?

সুলতান বলল, চিতা বাঘ আছে অনেক। হাতিগুলো সাধারণত বাগানে ঢোকে না। কিন্তু চিতাগুলো যখন-তখন চলে আসে। গত সপ্তাহেই তো একটা ধরা পড়েছে পাশের বাগানে।

বাবা বললেন, আসল চিতা নয়, লেপার্ড। বাংলাতে এখানে চিতা বাঘই বলে, তবে এগুলো ছোট-ছোট।

বিল্টু বলল, আমি বাঘ দেখব!

সুলতান বলল, দেখিয়ে আনব কাল। সেটাকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। খোকাসাহেব তুমি একটু দুধ খাবে নাকি?

বিল্টু বলল, না, আমি দুধ খাব না, চকলেট খাব।

মা সঙ্গে-সঙ্গে বকে উঠে বললেন, না, তুমি এখন চকলেট খাবে না। আজ তিনটে খেয়েছ। দুধ খাবে তো খাও, নইলে কিচ্ছু খেতে হবে না।

বাবা সুলতানকে জিজ্ঞেস করলেন, সুলতান, ওই যে হাতিগুলো দূরে ডাকছে, তারা কি হঠাৎ ভেতরে ঢুকে পড়ে এই বাড়ি অ্যাটাক করতে পারে?

সুলতান বললেন, না, না, সাহেব। সে-রকম কখ্খনো হয় না। হাতিরা সহজে তো ভেতরে আসেই না। যদি বা আসে, এ-রকম পাকা বাড়ি তারা কখ্খনো অ্যাটাক করে না। এ-বাড়ি তারা ভাঙতেও পারবে না।

বাবা বললেন, বাড়ির দেওয়াল না হয় শক্ত, কিন্তু দরজা? কাঠের দরজা ওরা

ভাঙতে পারে না? সুলতান হেসে বললেন, সে-রকম কখনও হয় না। আপনারা ভয় পাবেন না। আমি তো পঁয়ত্রিশ বছর এখানে চাকরি করছি। আমার বাবাও এখানেই কাজ করতেন। কোনো দিনও কোনো জন্তু-জানোয়ার বাংলোর মধ্যে ঢোকেনি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আজ সন্ধে থেকে এক জায়গায় অতগুলো হাতি জড়ো হয়ে আছে কেন? তুমি কিছু বলতে পার?

সুলতান বলল, বাগানের ও-পাশে পাহাড় দেখছেন তো? ও-দিকে আরও পরপর পাহাড় আছে। সেই পাহাড়গুলোর ওপরে ভুটান রাজ্য। হাতিগুলো ওইখান থেকে আসে, বছরে একবার-দুবার। এই দিক দিয়ে তারা চলে যায় চাপড়ামারি ফরেস্টে। সেখানে কয়েক মাস থেকে তারা আবার ফিরে যায় ভুটানে। এইরকমই চলেছে শত-শত বছর। এখন হয়েছে কী, ভুটান থেকে কিছু-কিছু মানুষও নেমে আসছে নীচে। তারা রাস্তা বানাবার কাজ নিয়ে গিয়েছিল, এখন আর তাদের চাকরি নেই, এখানে তাদের জায়গা-জমিও নেই। তাই ও-দিকে গভর্নমেন্টের জমিতে তারা ছোট-ছোট ঝুপড়ি বাড়ি বানিয়েছে। এবার হাতিগুলো যাবে কী করে? তারা তো অন্য রাস্তা চেনে না।

বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমিও তো সে কথাই বলেছিলাম।

সুলতান বলল, হাতিরা, দেখুন সাহেব, প্রথমেই সেই বাড়িটাড়ি ভেঙে দেয় না। দু-তিন দিন অপেক্ষা করে। এরমধ্যে লোকগুলো যদি ঝুপড়িগুলো সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়, তা হলে আর হাতিরা কিছু বলে না। মনে হয়, সেইরকমই কিছু হয়েছে। আমাদের এ-বাগান অনেক পুরোনো, কুলি বস্তিও অনেক দিনের, তাই এদিকে হাতিরা আসবে না।

মা বললেন, না এলেই ভালো।

সুলতান বলল, আমার দেখা এই এতদিনের মধ্যে একবারই তিনটে হাতি এই বাংলোর গেট পর্যন্ত চলে এসেছিল। তাও বেশ ক'বছর আগে। হ্যাঁ, পাঁচ-ছ'বছর তো হবেই।

বিল্টু উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, গেট পর্যন্ত এসে পড়েছিল? তারপর কী হল? তারপর কী হল?

সুলতান বলল, সে এক মজার ব্যাপার!

বাবা ভুরু তুলে বললেন, মজার ব্যাপার? গেট পর্যন্ত হাতি...কী ব্যাপার খুলে বলো তো। বসো ওইখানে।

সুলতান দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, তখন এই বাগানের ম্যানেজার ওসমানসাহেব। তিনি খুব সাহসী মানুষ ছিলেন। অবশ্য আমাদের এখনকার দত্তসাহেবেরও খুব সাহস আছে। ওসমানসাহেব রাত্তিরবেলা একা-একা বাগানে টহল দিতেন। একবার তো এক ডাকাত দলের মুখোমুখি পড়ে গুলি চালিয়ে দুটো ডাকাতকে খতম করে

দিয়েছিলেন।

বাবা বললেন, ডাকাতদের পক্ষে চা-বাগানের ঝোপগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনেক সুবিধের।

সুলতান বলল, জী, সাহেব। তাই মাঝে-মাঝে সারা বাগান টহল দিতে হয়। যখন পাতা তোলা বন্ধ থাকে, তখন তো অনেক জায়গাতেই কেউ যায় না। যাই হোক, একদিন ওসমানসাহেব তাঁর জিপের পেছনে চাপিয়ে একটা হাতির বাচ্চাকে নিয়ে এলেন বাংলোয়।

মা বললেন, হাতির বাচ্চা? কতটুকু বাচ্চা?

সুলতান বলল, খুবই ছোট, কয়েক সপ্তাহ মাত্র বয়েস হবে। তার মাথায় খুব চোট লেগেছে, একটা পা ভাঙা, চোখ মেলতেই পারছিল না। ওই ভুটান পাহাড় থেকে কয়েকটা ছোট-ছোট নদী নেমেছে, বর্ষার সময় সেইসব ছোট নদীতেও খুব স্রোত হয়। হাতির বাচ্চাটা কোনোরকমে সেই একটা নদীতে পড়ে গিয়েছিল, গড়াতে-গড়াতে একবারে নীচে চলে আসে। তাতেই খুব চোট লাগে মাথায়। তার বাবা-মাও তাকে খুঁজে পায়নি।

মা বললে, আহা রে!

সুলতান বলল, ওসমানসাহেব জেদ ধরলেন, হাতির বাচ্চাটাকে তিনি সারিয়ে তুলবেন। তখন এখানে থাকতেন ড্যানিয়েল সাহেব, তিনি পশু-চিকিৎসক।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আসল সাহেব?

সুলতান বলল, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। বড় ভালো মানুষ। বাচ্চা হাতিটিকে রাখা হল গোয়াল ঘরে। আমাদের সাহেব আর ড্যানিয়েল সাহেব দু-জনে মিলে দিনরাত সেটার সেবা আর চিকিৎসা করতে লাগলেন। ঠিক তৃতীয় দিনে এসে পড়ল তিন-চারটে হাতি। কী করে তারা গন্ধ শুঁকে-শুঁকে এই পর্যন্ত এসে পড়ল কে জানে। বিশাল চেহারার হাতি, চারটের মধ্যে দুটোই দাঁতাল। আমরা তো সবাই প্রথমটা ভয়ের চোটে বাংলোর মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। হাতিগুলো যখন বাংলোর লোহার গট ধরে ঝাঁকাতে লাগল, তখন আমরা বুঝলাম, এই রে, গেট ভাঙতে আর কতক্ষণ, ওরা তো ভেতরে ঢুকবেই। রাগের চোটে সব তছনছ করবে। ওসমানসাহেব তখন ঘুমোচ্ছিলেন। চ্যাঁচামেচিতে জেগে উঠে বুঝলেন কী ব্যাপার। আগেই বলেছি ওনার দারুণ সাহস। প্রথমে চিৎকার করে আমাদের বললেন, এই তোরা কেউ বেরুবি না। ওদের দিকে কিছু ছুঁড়বি না! তারপর তিনি নিজে একা বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, সঙ্গে বন্দুক নিলেন না?

সুলতান বলল, না সাহেব। ওনার বন্দুক ছিল, একজন গার্ডেরও বন্দুক ছিল। কিন্তু ঠিক সময়েই গার্ড ছিল অনুপস্থিত। ওসমানসাহেব খালি হাতেই বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া, আমার গেট ভাঙবি না! ঠিক যেন মানুষকে

ধমকাচ্ছেন। একেবারে কাছে গিয়ে নিজেই গেটটা খুলে দিলেন। তারপর হাতিদের বললেন, আয়, আমার সঙ্গে। তিনি গটমট করে হেঁটে গেলেন গোয়াল ঘরের দিকে। বিশ্বাস করুন, হাতিরা সাহেবকে একেবারে নাগালের মধ্যে পেয়েও মারার চেষ্টা করল না। অবশ্য গোয়াল ঘরে তখন বাচ্চাই চ্যাঁচাচ্ছে, তাই শুনেই বড়গুলো বুঝে গিয়েছিল, সে কোথায় আছে।

বিল্টু বলল, তারপর, তারপর? ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল?

সুলতান বলল, বাচ্চাটার তো হাঁটারই ক্ষমতা নেই, নিয়ে যাবে কী করে? তারপরেই তো মজার ব্যাপার হল। হাতিগুলো এই বাগানেই রয়ে গেল চারদিন। আমরা কলাগাছ কেটে আর ছোট-ছোট গাছ আর বড়-বড় ঘাস কেটে ওদের খেতে দিতাম। ঠিক যেন পোষা হাতি। আমাদের দিকে একবারও তেড়ে আসেনি। কত কুলি-মজুর ভিড় করে দেখতে এসেছে, কয়েকটা জংলি হাতি কী করে নিজে-নিজেই পোষা হাতি হয়ে গেল! ওরা বাচ্চাটার গা চেটেপুটে কী চিকিৎসা করল কে জানে, আস্তে-আস্তে সে চাঙ্গা হয়ে উঠল। চারদিনের মাথায় সে হেঁটে চলে গেল অন্যদের সঙ্গে, তখনও তার এক পায়ে ব্যান্ডেজ, মাথাতেও স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো! এ-ঘটনা এ-তল্লাটের সবাই জানে!

বাবা বললেন, একমাত্র বাঘ ছাড়া আর অনেক জন্তু-জানোয়ার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, যদি মানুষের কাছে ভালো ব্যবহার পায়। বাঘগুলোই খুব পাজি হয়।

সুলতান আরও কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে চলে গেল ভেতরে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। হাতিদের ডাকও থেমে গেছে। এবার ঘুমোতে গেলেই হয়।

হঠাৎ আবার শোনা গেল একসঙ্গে অনেক হাতির গর্জন, বন্দুকের গুলির শব্দ আর অনেক মানুষের চ্যাঁচামেচি।

বাবা বললেন, এই রে!

মা বললেন, আর বারান্দায় বসা হবে না। শিগগিরই সবাই ঘরের মধ্যে চলো।

বাবা বললেন, আর একটু দেখিই না।

তখন সুলতানও এসে বলল, সাহেব, একটু কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। কেউ হাতিদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তারা এদিকে এসেও পড়তে পারে। এখন দরজা-জানালা বন্ধ করে ভেতরে গিয়ে বসাই ভালো।

সেই সময়ই গেটের কাছ দিয়ে কী যেন একটা প্রাণী ছুটে গেল।

বাবা বললেন, ওটা কী? কুকুর না শেয়াল?

সুলতান বলল, চিতা বাঘও হতে পারে। হাতি তাড়া করলে সবাই ভয় পায়। চলুন, চলুন, ভেতরে চলুন!

ভেতরে গিয়ে সব বন্ধটন্ধ করে বসে পড়লেও কৌতূহল যাবে কোথায়? বিল্টু জানলার খড়খড়ি তুলে দেখবার চেষ্টা করল বাইরেটা।

কিছুই দেখা যায় না। শুধু রাইফেল হাতে নিয়ে গার্ডটি দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতন।

খানিকবাদে বন্দুকের শব্দ থেমে গেলেও হাতিদের গর্জন চললই। ভয়-পাওয়া মানুষের চ্যাঁচামেচিও কমেনি। বোঝাই যাচ্ছে না, ওখানে কী হচ্ছে। ম্যানেজার দত্তই বা কী করছেন? তাঁর জন্যও দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পর আবার শোনা গেল অন্যরকম আওয়াজ। এক-একবার একটা করে বন্দুকের গুলির শব্দ আর হাতির ডাক। সে দু-রকম আওয়াজই যেন এগিয়ে আসছে এদিকে। ক্রমশ বাংলোর খুব কাছে।

গার্ডটি রাইফেল উঁচু করেছে, বাবা জানলা খুলে চেঁচিয়ে বললে গুলি চালিও না। তুমিও ভেতরে চলে এসো! আগে দেখো কী হয়। যদি হাতিরা এই বাগানে ঢুকে পড়ে, তখন গুলি চালাবে।

তবু গার্ডটি একবার ওপরের দিকে তাক করে গুলি চালাল। তাতে কিছুই লাভ হল না, হাতিরা এগিয়ে আসতে লাগল এদিকেই।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল, গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিনটে হাতি। তাদের একজনের শুঁড়ে জড়ানো একটা পুঁটুলির মতন কী যেন।

তাদের পেছনে খানিক দূরে শোনা গেল একবার গুলির শব্দ। হাতিরা তাতেও বিচলিত হল না। দু-বার ডাকল। তারপর একজন সেই পুঁটুলিটা নামিয়ে দিল মাটিতে। তারপর ধীর গতিতে, দুলকি চালে হেঁটে তারা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তার দু-তিন মিনিট পরেই এসে থামল ম্যানেজার দত্তের জিপ গাড়ি। এবার বাবা-মা-বিল্টু সবাই দরজা খুলে চলে এল বাইরে। বাংলোর ঠাকুর-বেয়ারা সবাই।

চন্দ্রমোহন দত্ত জিপ থেকে নেমে উত্তেজিতভাবে বললেন, সবাই ঠিকঠাক আছ তো? কারুর কোনো ক্ষতি হয়নি?

বাবাও উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কী ব্যাপারটা হল বলো তো?

চন্দ্রমোহন বললেন, আর বোলো না। আমাদের বাগানে কিছু হয়নি, আমাদের শ্রমিকরাও কোনো গোলমাল করেনি। যত গণ্ডগোল ওই ভুটিয়াদের নিয়ে। বারবার বুঝিয়ে তাদের বললাম, তোমাদের কিছু ঝুপড়ি অন্তত সরিয়ে নাও, হাতিদের রাস্তা করে দাও, না হলে ওরা ছাড়বে না। কিছুতেই শোনে না আমার কথা। ওদের কয়েকজন মাতাল হয়ে এক সময় মশাল ছুঁড়ে মারল হাতিদের দিকে। তারপর যা হয়, হাতিরা গিয়ে দুরমুশ করে দিল সেইসব ঝুপড়ি। কয়েকজন বোধহয় হাতির পায়ের তলায় পিষেও গেছে। আমি গুলি চালিয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করলাম, তাতে পুরোপুরি কাজ হয়নি। বেশ কিছু হাতি ঝুপড়ি-টুপড়ি ভেঙে দিয়ে অন্যদিকে চলে

গেল বটে, কিছু ফিরল অন্যদিকে। আর গোটা তিনেক হাতি বোধহয় দিশাহারা হয়ে ঢুকে পড়ল এই চা-বাগানে। তারপর দেখি, সর্বনাশ, আমার বাংলোর দিকেই আসছে। তোমরা রয়েছ, ভয় পেয়ে যাবে। যদিও ভেতরে বসে থাকলে কোনো বিপদ হয় না। আমি কয়েকবার ফাঁকা আওয়াজ করে ওদের ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম।

মা বললেন, একটা হাতি কী যেন পুঁটুলি ফেলে গেল মনে হল!

বাবা বললেন, হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। সেটা কী? কোথায় গেল?

সুলতান আর কয়েকজন একটু খোঁজাখুঁজি করতেই গেটের এক পাশে ঝোপের মধ্যে পেয়ে গেল, পুঁটুলি নয়, একটা মানুষের শিশু। এক-দেড় বছর বয়েস, কোনো শব্দ করছে না, বোধহয় ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু বেঁচে আছে, ধুকপুক করছে বুক।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে সুলতান অভিভূতভাবে বলল, প্রতিদান দিয়ে গেল। এই বাংলোতে একবার একটা হাতির বাচ্চাকে বাঁচানো হয়েছিল, ওরা তার বদলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল একটা মানুষের বাচ্চাকে। হয়তো সেই মা-টাই এসেছিল।

চন্দ্রমোহন বললেন, আশ্চর্য! এ-রকম কখনও আগে দেখিওনি, শুনিওনি।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, দেখলে, দেখলে, হাতিরা কতদিন আগেকার কথা মনে রাখতে পারে? এবার বিশ্বাস হল তো! শুধু-শুধু আমার দিদিমার নামে...

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এবার বিশ্বাস হচ্ছে বটে। তবে, সার্কাসের হাতিদুটো তোমার দিদিমাকে চিনতে পেরেছিল, এই পর্যন্ত বোধহয় ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার দিদিমার কোলে গাঁদাফুলের মালা দেওয়াটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ওইটুকু তিনি গুল মেরেছেন কিংবা তুমি বানিয়েছ।

বিল্টু আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

অবনী স্যারের স্কুল

আজকের দিনটা খুব সুন্দর। মেঘলা মেঘলা, কিন্তু বৃষ্টি নামেনি, বাতাসও ঠান্ডা। সাইকেল রিকশায় চেপে বাড়ি ফিরছেন অবনী স্যার। অন্যদিন হেঁটেই আসেন, পনেরো-ষোলো মিনিট লাগে। আজ তাঁর সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র আছে।

বড় পুকুরটার পাশে রাস্তাটা যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে অনেক মানুষের জটলা। কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করছে, মাঝখানে কী যেন আছে।

ভিড় দেখলেই কৌতূহল হয়। অবনী স্যার রিকশাচালককে জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কী হয়েছে রে বলাই?

বলাই বলল, কী জানি! ছেলে-ধরা নাকি

ক'দিন ধরেই সব জায়গায় ছেলেধরাদের কথা শোনা যাচ্ছে। কারা নাকি দল বেঁধে এসে ছোট ছোট ছেলেদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি, না গুজব, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। চেনাশুনো কোনো বাড়ির ছেলে এপর্যন্ত হারিয়ে যায়নি। অথচ প্রায়ই গুজব ছড়ায়।

অবনী স্যার সে সব শুনে ভাবতেন, কারা ছোট ছেলেদের চুরি করে? কী জন্য? কত ছোট ছোট ছেলে তো ভিক্ষে করে, চায়ের দোকানে কাজ করে, রেল স্টেশনে এমনিই শুয়ে থাকে। তারা কি দামী জিনিস যে লোকে চুরি করবে?

তিনি বলাইকে বললেন, একটু থামা তো, দেখি কী ব্যাপার!

অবনী স্যারকে অনেকেই চেনে। তিনি ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গেলে লোকেরা জায়গা করে দিল। বৃত্তের মাঝখানে উঁকি দিয়ে তিনি রীতিমতো অবাক হলেন। একটা তেরো-চোদ্দ বছরের রোগা প্যাংলা ছেলে, হাফ-প্যান্ট পরা, খালি-গা, মাথায় বড় বড় চুল। সেই চুল মুঠো করে চেপে ধরে আছে একজন গুন্ডা চেহারার লোক।

অবনী স্যার ভাবলেন, এইটুকু ছেলে কী করে ছেলেধরা হবে? কোন্ ছেলেকেই বা ও ধরেছে?

লোকজনের কথা শুনে বোঝা গেল, ছেলেধরা নয়, ও একটা সাধারণ চোর। বাজারের কাছে এক বৃদ্ধা মহিলার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল, কিছু লোক তাকে ধরে ফেলেছে তাড়া করে!

গুন্ডা মতন লোকটি এক বিশাল থাপ্পড় কষিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বল, কোথায় ফেলেছিস সোনার হারটা!

অমন মার খেয়েও ছেলেটা কঁকিয়ে উঠল না, কোনো উত্তরও দিল না।

অন্য একজন লোক ওর মুখে একটা ঘুঁষি মেরে বললে, আমার দোকান থেকেও এই নিশ্চয়ই চুরি করেছে। ওদের দল আছে!

ছেলেধরার ব্যাপারটা গুজব হতে পারে, কিন্তু চুরির কথা একেবারে সত্যি। এ পাড়ায় প্রায়ই চুরি হচ্ছে। এমনকি অবনী স্যারের বাড়ি থেকেও একটা রেডিও চুরি গেছে পরশু রাতে।

চোরদের ওপরে সকলেরই রাগ থাকে। এ ছেলেটা ধরা পড়েছে, একে এখন সবাই মিলে মারতে মারতে মেরে ফেলতেও পারে। ছেলেটা যে সোনার হার চুরি করেছে, সেটা ওর হাতে নেই, হয়তো তাড়া খেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মাঝরাস্তায়। কিংবা এ ছেলেটা চোর নাও হতে পারে, অন্য কেউ চুরি করেছে, ওকে লোকে ভুল করে ধরেছে।

মাস্টার মানুষ বলে তাঁর কথা অনেকে শোনে। তিনি হাত তুলে বললেন, শোনো, শোনো, এ ছেলেটা তো একা চুরি করতে পারে না। ওদের নিশ্চয়ই দল আছে। ওকে মেরে ফেললে তো সে দলের কথা জানা যাবে না। বরং ওকে থানায় জমা দাও, পুলিশ যদি দলটাকে ধরতে পারে—।

যারা মারার নেশায় মেতে উঠেছে, তারা থামল না, মারতেই লাগল।

অবনী স্যার এবার গলা চড়িয়ে বললেন, ওকে যদি মেরে ফেলো একেবারে, তাহলে কিন্তু তোমরা খুনী হবে। পুলিশ তোমাদেরও ধরবে। তোমাদেরই কেউ অন্যদের নাম বলে দেবে!

তখন আরও দু'জন লোক হাত তুলে বলল, আর কেউ মারবে না, কেউ মারবে না, ওকে থানায় নিয়ে চলো—!

এবার কিছু লোক হইহই করে ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো থানার দিকে। ছেলেটার ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

অবনী স্যার আবার রিকশায় উঠলেন।

প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বলাই বলল, যাক, ছেলেটা প্রাণে বেঁচে গেল আপনার জন্য। ভদ্দরলোকের মতন চেহারার লোকেরা যখন মারতে শুরু করে, তখন আর জ্ঞান থাকে না।

অবনী স্যার বললেন, ঠিক বলেছিস। চুরি করার চেয়েও খুন করা তো আরও বেশি অপরাধ।

ছেলেটাকে বাঁচাতে পেরেছেন বলে অবনী স্যারের মনটা ভালো হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে এসে নামলেন, কয়েকটা সন্দেশের প্যাকেট আর ফুল ও বই বলাই পৌঁছে দিল ভেতরে। আজ থেকে তিনি রিটায়ার করলেন, তাই ক্লাস টেনের ছেলেরা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। দিয়েছে এইসব উপহার।

বাড়ি মানে ভাড়া বাড়ি। দু'খানা মাত্র ঘর। অবনী স্যারের আগে অবশ্য নিজের

একটা বাড়ি ছিল, ছোট হলেও বেশ সুন্দর, সঙ্গে একটু বাগান। দু'বছর আগে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর সে বাড়িতে মন টেকেনি। একা একা থাকতে ইচ্ছেই করত না। একমাত্র ছেলে থাকে হায়দরাবাদে, সেখানে সে নিজের বাড়ি কিনেছে।

এই বাড়িটায় অনেকগুলো ভাড়াটে। সকলের সঙ্গে অবনী স্যার মেশেন না। বেশি ভাড়াটে থাকলেই দলাদলি হয়, তিনি কোনো দলেই নেই। তিনি রান্নাবান্নার ঝামেলাও রাখেননি। কাছেই অন্নপূর্ণা হোটেল, সেই হোটেলের একটি ছেলে সকালের চা থেকে রাত্তিরের খাবার পর্যন্ত সব পৌঁছে দিয়ে যায়। তাঁকে হোটেলে যেতেও হয় না।

দুটো ঘরই বইতে ঠাসা। আবার নতুন বই উপহার পেয়েছেন। নতুন বইয়ের গায়ে হাত বুলোতেও তাঁর ভালো লাগে। এখন তো তাঁর অফুরন্ত সময়, শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়বেন।

দুটো মিষ্টির প্যাকেট তিনি পাঠিয়ে দিলেন পাশের দুটো ফ্ল্যাটে। একটা রেখে দিলেন হোটেলের ছেলেটার জন্য। ওর নাম হারান। মুখখানি বেশ মিষ্টি, টানা টানা চোখ। ফুলগুলো রাখবেন কোথায়, ফুলদানি তো নেই? এমনিই রাখলেন একটা কাচের গেলাসে।

চোরটার কথা মনে পড়তে লাগল মাঝে মাঝে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, সেই মুখটা তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। থানার পুলিশরাও কি ওকে মারবে?

তার ঘরের রেডিওটা জানলা দিয়ে ওই ছেলেটাই কি চুরি করেছে? কিংবা ওর দলের লোক? একা থাকলে রেডিওটা খুব কাজে লাগে। আর একটা রেডিও কিনতে হবে।

রাত্তিরের খাবার হারান নিয়ে আসে ঠিক ন'টায়। মিষ্টির প্যাকেটটা পেয়ে সে যত খুশি, তত অবাক। এত দামী মিষ্টি সে কখনও খায়নি। বারোটা মিষ্টি!

অবনী স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তুই রাত্তিরে থাকিস কোথায় রে? হোটেলেই শুয়ে থাকিস?

হারান বলল, না মাস্টারমশাই, রাত বারোটা বেজে যায়, তবু আমি বাড়ি চলে যাই। আমার বাড়ি রথতলায়।

"তোর বাড়িতে কে কে থাকে?"

"আমার মা আর তিনটে বোন। তারা ছোট।"

"বাবা নেই?"

"বাবা কোথায় চলে গেছে, জানি না।"

"মিষ্টির প্যাকেটটা তাহলে বাড়িতে নিয়ে যাস।"

অবনী স্যারের মনটা আবার খুশিতে ভরে গেল। বাবা নেই, শুধু হারানের রোজগারেই সংসার চলে। নিশ্চয়ই খুব গরিব, মিষ্টিগুলো ভালো কাজে লেগে গেল।

পরদিন তার ঘুম ভাঙল সাড়ে ছ'টার সময়। আজ তো আর স্কুলে যেতে হবে না, ঠিক করেছিলেন, অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকবেন। কিন্তু এতদিনের অভ্যেস, তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আর বিছানায় থাকতে ইচ্ছে করে না।

এতদিন বাড়িতে খবরের কাগজ রাখতেন না। স্কুলে গিয়ে অফ পিরিয়াডে পড়ে নিতেন। এবার থেকে রাখতে হবে।

বেলা দশটার সময় তাঁর মনটা উশখুশ করতে লাগল। অন্যদিন এতক্ষণে স্কুলে পৌঁছে যান। কিন্তু তাঁর তো সারাজীবনের মতো ছুটি হয়ে গেছে।

স্কুলে প্রায়ই তো ছুটি থাকে। সেইসব ছুটির দিনের সঙ্গে আজকের দিনটার যেন অনেক তফাত। ছুটির দিন কত তাড়াতাড়ি কেটে যায়। কতরকম কাজ থাকে। আজ যেন সময় কাটতেই চাইছে না, কোনো কাজও নেই। বই পড়তেও ইচ্ছে করছে না। বই পড়ার অনেক সময় পড়ে আছে।

সারাদিন কোনোরকমে বাড়িতে কাটিয়ে বিকেলবেলা বেরিয়ে পড়লেন অবনী স্যার। এখন তো তিনি আর স্যার নন, এখন তিনি অবনী হালদার। তবু রাস্তায় দু'চারজন পুরোনো ছাত্র তাঁকে দেখে নমস্কার করে বলল, ভালো আছেন, স্যার?

রাস্তায় বেরিয়েও কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারলেন না। এমনিই ঘুরতে লাগলেন এদিক সেদিক। একসময় হঠাৎ দেখলেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন থানার সামনে। এখানে এলেন কেন? হয়তো কালকের সেই চোরটার খোঁজ নেবার ইচ্ছে ছিল তার মনের ভেতরে।

থানায় সবসময় ভিড় লেগেই থাকে। ভেতরে ঢুকেও তিনি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর একজন পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করল, আপনার কী চাই?

অবনী স্যার বললেন, আমার কিছু চাই না, মানে...

পুলিশটি তাঁকে চেনে না। বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে একজন বলল, স্যার, আপনি এখানে? কিছু হয়েছে?

অবনী স্যার একবার ভাবলেন, তাঁর রেডিও চুরির কথাটা বলবেন। তারপরই মনে হল, পুলিশ কি এমন সামান্য ব্যাপার পাত্তা দেয়? হয়তো বলবে, জানলা বন্ধ রাখেননি কেন, আপনারই দোষ!

তিনি বললেন, কাল একটা বাচ্চা ছেলেকে চোর বলে ধরে এনেছিল, তার কী হল?

পুলিশ বলল, ওঃ, কালকের সেই ছোঁড়াটা? একটা ছিঁচকে চোর। ওদের নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। থানার গারদে অত কমবয়সি ছেলেদের রাখার নিয়ম নেই। পাঠাতে হয় হোমে। এই গ্রাম দেশে হোম কোথায়? নিয়ে যেতে হবে বর্ধমানে। তাই দু'চারটে চড়-চাপড় মেরে ছেড়ে দিয়েছি।

অবনী স্যার মনে মনে শিউড়ে উঠলেন। আরও মারা হয়েছে? ছেলেটার হাত-পা ভাঙেনি তো? তিনি আর কিছু না বলে চলে এলেন।

এরপর কাটল দিন চারেক। আগে ভেবে রেখেছিলেন, রিটায়ার করার পর কত জায়গায় বেড়াবেন। পাহাড় দেখতে যাবেন। এখনো তাঁর শরীর বেশ সুস্থ আছে। কিন্তু একলা একলা কোথাও যাবার উৎসাহ পান না। দূর দেশে গিয়ে একা হোটেলে থাকা, তার চেয়ে নিজের এই ঘরখানাই ভালো।

রাত্তিরে তিনি হারানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই স্কুলে যাসনি কখনও?

হারান বলল, ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আজ্ঞে। কেলাস টু পর্যন্ত পড়েছি। তারপর আর পড়িনি।

"কেন পড়লি না?"

"আমার বাবা বলল, আর পড়তে হবে না। বই কিনে দেবে না। একটা চায়ের দোকানে চাকরিতে ঢুকে গেলাম।"

"এখন তোর পড়তে ইচ্ছে করে না?"

"কী যে বলেন মাস্টারমশাই। এখন কি আমার নিশ্বাস ফেলার সময় আছে? সকাল ছ'টায় আসি, যাই রাত বারোটায়। কাস্টোমারদের খাবার দেওয়া থেকে শুরু করে, টেবিল পরিষ্কার, ঘর পরিষ্কার, বাসন মাজা, মশলা বাটা সব করতে হয় আমাকে। শুধু রান্নাটা এখনো শিখিনি!"

"দুপুরে নিশ্চয়ই কিছুটা সময় পাস। তখন চলে আসবি আমার কাছে। আমি তোকে পড়াব।"

হারান একটুক্ষণ কাচুমাচু মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, "দুপুরে হোটেল থেকে বেরুলে মালিক আমায় রক্ষে রাখবে? তাছাড়া আর লেখাপড়া শিখে আমার কী লাভ হবে? বরং রান্নাটা শিখে নিলে আমার কিছুটা রোজগার বাড়বে।"

অবনী স্যার বললেন, "লেখাপড়া শিখলে কী লাভ হবে জানিস? তুই হোটেলের ম্যানেজার হতে পারবি! শিখে অন্য কোথাও চাকরি পাবি। মানুষের মতন মানুষ হবি। আচ্ছা, তুই কতটা শিখেছিস দেখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন জানিস?"

এঁটো বাসনগুলো তুলে নিয়ে হারান বলল, "আমার দেরি হলে মালিক বকাবকি করবে। আমি যাই স্যার!"

কেটে গেছে আরও এক সপ্তাহ। সেদিন সকাল থেকে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। কিছুতেই মন টিকলো না ঘরে।

এই ক'দিনে তিনি অনেক জায়গায় বেড়াতে যাবার কথা ভেবেছেন। কোনো জায়গাটাই ঠিক পছন্দ হয় না। আজকাল অনেক আগে থেকে ট্রেনের টিকিট কাটতে হয়। তারপর যদি জ্বরটর হয়, তাহলে টাকা নষ্ট হবে। কিংবা একা একা কোথাও বেড়াতে গিয়ে যদি শরীর খারাপ হয়, তখন কে দেখবে!

সকালের চা খেয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। মাথায় ছাতা। একটা টুথ ব্রাশ কিনতে হবে। পাড়ার দোকানটা বন্ধ। তিনি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন রেল স্টেশনের সামনে।

টুথ ব্রাশ কেনার পর কিনলেন এক ঠোঙা চিনেবাদাম। খোসা ভেঙে বাদাম খেতে খেতে বেশ সময় কেটে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল, এক জায়গায় রেলিং-এ হেলান দিয়ে বসে আছে একটা ছেলে। মুখখানা চেনা চেনা মনে হল।

তারপরেই মনে পড়ল, এ তো সেদিনের সেই ছেলেটা, যাকে চোর বলে সবাই মারছিল। মুখে কয়েকটা কাটা-ছেঁড়া দাগ। ও কি সত্যি চোর, না লোকে ভুল করে মেরেছে?

ছেলেটা হাঁটু দুটো ধরে ঝিমোচ্ছে। এই বয়সের একটা ছেলে সকালবেলা এমনি এমনি বসে থাকবে কেন? ওর তো স্কুলে থাকার কথা। এরকম কত ছেলে স্কুলে যায় না। কোনো কোনো দেশে নাকি আইন আছে, সব ছেলেমেয়েকে স্কুলে পড়তেই হবে। যদি কেউ না যায়, তাহলে পুলিশ তাদের বাবা-মাকে শাস্তি দেয়।

তিনি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই, তোর নাম কী রে?

ছেলেটি চোখ মেলে তাকাল। অবনী স্যার এবার বললেন, তুই এখানে চুপচাপ বসে আছিস কেন? তুই পড়াশুনো করবি? আমি তোকে পড়াতে পারি।

ছেলেটি একটা অদ্ভুত কাজ করল। কোনো কথা না বলে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর চোখের নিমেষে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

অবনী স্যার অবাক হয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ছেলেটা অমনভাবে পালাল কেন? তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছে? ও কি ভেবেছে, সেদিন যারা ওকে মারছিল, সেই দলে তিনিও ছিলেন? আবার মারতে এসেছেন?

একটা ক্রিং ক্রিং শব্দ শুনে অবনী স্যার ফিরে তাকালেন। সাইকেল রিকশাচালক বলাই।

সে বলল, মাস্টারমশাই, আজ স্কুলে যাবেন না? অনেক বেলা হয়ে গেছে!

অবনী স্যার হাসলেন। বলাই জানে না, তাঁর পাকাপাকি ছুটি হয়ে গেছে। রিটায়ার করার পর আর কেউ স্কুলে যায় না।

বলাইকে সে কথা বুঝিয়ে দিয়ে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। বাদাম খেতে খেতে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, তিনি এসে পড়েছেন স্কুলের গেটের কাছে। পুরোনো অভ্যেস, তাঁর পা দুটো তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে।

ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল।

অবনী স্যারের মনে পড়ল, সেকেন্ড পিরিয়ডে তিনি ক্লাস নাইনের বি সেকশনে পড়াতেন। এখন তাঁর বদলে নতুন টিচার এসে গেছে। এই টিচারটি আগে তাঁরই ছাত্র ছিল।

অবনী স্যার ভাবলেন, রিটায়ার করার পর কোনো টিচার আর স্কুলে আসে না। কিন্তু একবার হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এলে ক্ষতি কী আছে?

তিনি সেই ঘরে ঢুকতেই হেডমাস্টার চোখ তুলে তাকালেন। বেশ অবাক হয়েছেন বোঝা যায়।

অবনী স্যার হাত তুলে বললেন, ভালো আছেন তো নুরুল সাহেব?

হেডমাস্টার নুরুল আলমও নমস্কার করে বললেন, হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনার শরীর-টরীর ভালো তো?

তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আপনার পেনশনেরর সব কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।

অবনী স্যার বললেন, না, না, আমি সেসব খোঁজ নিতে আসিনি। এমনিই এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম, স্কুলটা একবার দেখে যাই।

নুরুল আলম বললেন, বেশ করেছেন। বসুন, বসুন। ছাব্বিশ বছর কাজ করেছেন এই স্কুলে, আপনার তো টান থাকবেই। আপনি বসুন, আমি আসছি।

হেডমাস্টার মশাই বেরিয়ে যাবার পর অবনী স্যার বসে রইলেন একা। নিতাই নামে বেয়ারাটি একবার উঁকি মারল। সেও খানিকটা অবাক হয়ে, আবার হাসিমুখে বলল, কেমন আছেন স্যার!

অবনী স্যার বললেন, ভালো। এক গেলাস জল দে তো নিতাই।

নিতাই চলে গেল, কিন্তু জল নিয়ে ফিরে এল না।

হেডমাস্টার মশাই একটু পরে ফিরলেন, কিন্তু তিনি ফাইল খুলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর গল্প করার সময় নেই।

আরও দু'একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা হল। সবাই তাঁর স্বাস্থ্যের কথা শুধু জিজ্ঞেস করে। আগেকার মতন কেউ গল্প জমাতে চায় না।

ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি উঠে পড়লেন। তখন নিতাই নিয়ে এল এক গেলাস জল। দেরি হবার জন্য সে কোনো কৈফিয়ত দিল না।

নুরুল আলম ভদ্রতা করে বললেন, যাচ্ছেন? আসবেন মাঝে মাঝে।

দুদিন বাদে অবনী স্যার আবার চলে এলেন ঠিক দশটার মধ্যে। হইহই করে ছেলের দল ক্লাসে ঢুকছে। সে দৃশ্য দেখতে তাঁর খুব ভালো লাগল।

আজও তিনি বসে রইলেন হেডমাস্টারের ঘরে। নুরুল আলম খুবই ব্যস্ত, তাঁর কথা বলার সময় নেই, অন্য টিচাররাও দু'একটা শুকনো কথা বলে চলে গেল। কারুরই গল্প করার মন নেই।

এইরকমভাবে কয়েকদিন এসে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে বসে থাকার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এইভাবে আসা তাঁর ঠিক হচ্ছে না। যিনি রিটায়ার করেন, তিনি একেবারে বাতিল হয়ে যান। কেউ আর তাঁকে পাত্তা দিতে চায় না। এমনকি

বেয়ারারাও তাঁকে অগ্রাহ্য করে।

তিনি ঠিক করলেন, আর আসবেন না। যদিও অন্য কোথাও যাবার বদলে এই স্কুলের পরিবেশে বসে থাকতেই তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। কিন্তু এখানে আর তাঁর স্থান নেই।

সেদিন হেডমাস্টার খুবই ব্যস্ত। অন্য দু'জন শিক্ষকের সঙ্গে জোরে জোরে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছেন। অবনী স্যার মন দিয়ে শুনে বুঝতে পারলেন, ভূগোল টিচার শ্রীধরবাবু আজ আসেননি। তিনি প্রায়ই কামাই করছেন।

অন্য শিক্ষক দু'জন বেরিয়ে যাবার পর নুরুল আলম অবনী স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখছেন কী অবস্থা? আমি সবদিক সামলাই কী করে? শ্রীধরবাবু আসছেন না। এই ক্লাস এইটের ছেলেরাই সবচেয়ে গণ্ডগোল করে। অন্য যে টিচারদের অফ পিরিয়ড আছে, তারা কেউ ওই ক্লাস নিতে রাজি নয়। আজকাল কেউ রুটিনের বাইরে একটু বেশিও কাজ করবে না!

অবনী স্যার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হেডমাস্টার মশাই, আমি তো চুপচাপ বসে আছি। আমি ক্লাসটা নিয়ে আসব?

নুরুল আলম দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আপনি?

অবনী স্যার বললেন, আমি তো ইতিহাস আর ভূগোল, দুটোই পড়িয়েছি। আর ওই ক্লাস এইটের ছেলেদের আমি ভালোভাবে সামলাতে পারি।

হেডমাস্টার বললেন, তা আপনি তো ভালোই পড়াতেন। সেজন্য নয়। আপনি তো রিটায়ার করে গেছেন। সরকারি নিয়মে আর এক্সটেনশন দেওয়া যায় না। সে ক্ষমতাও আমার নেই। আপনাকে ক্লাস করতে দিই কী করে?

অবনী স্যার বললেন, পরীক্ষা এসে গেছে। এখন ক্লাস নষ্ট হলে তো ছেলেরা গোলমাল করবেই।

হেডমাস্টার বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আপনি পড়াবেন... মানে, এজন্য তো আপনাকে আমি টাকা-পয়সা কিছু দিতে পারব না?

অবনী স্যার এবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না, না, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আমি কিছু চাই না। আমি একা মানুষ, বেশ চলে যায়। এমনি এমনি বসে আছি।

ক্লাস এইটের ছেলেরা গোলমাল শুরু করেছে। খানিকটা দোনামোনা করে হেডমাস্টার মশাই বললেন, ঠিক আছে। দেখুন যদি...

দারুণ উৎসাহের সঙ্গে অবনী স্যার গটগট করে হেঁটে সেই ক্লাসে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁকে দেখে ছেলেরা অবাক হয়ে চুপ করে গেল।

দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে এলেন অবনী স্যার। এর আগে আর কোনোদিন যেন তিনি পড়িয়ে এত আনন্দ পাননি।

এরপর অবনী স্যার আবার নিয়মিত আসা শুরু করলেন। হেডমাস্টার মশাইয়ের

ঘরে বসে থাকেন। যে-দিন যে-ক্লাসে অন্য শিক্ষক আসে না, তিনি পড়াতে যান। ইতিহাস, ভূগোল, ইংরাজি, বাংলা সবই তিনি পড়াতে পারেন। শুধু অঙ্কটা বাদ।

দিন পনেরো বাদে অবনী স্যার হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে ঢোকা মাত্র নুরুল আলম উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, অবনীবাবু, আপনাকে আমি দুঃখের সঙ্গে একটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার এইরকমভাবে স্কুলে আসা, ক্লাস নেওয়া অনেক টিচার পছন্দ করছেন না। স্কুল কমিটিতেও আপত্তি উঠেছে। মানে, আপনি যে কোনো ক্লাসে পড়িয়ে দিচ্ছেন বলে অনেক টিচার ইচ্ছে করে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে। খুব মজা পেয়ে গেছে, বুঝছেন না! সুতরাং, মানে, বুঝতেই পারছেন, এভাবে আপনাকে ক্লাস করতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

অবনী স্যারের মুখটা বিমর্ষ হয়ে গেল। খসখসে গলায় তিনি বললেন, তার মানে আমি আর আসব না?

নুরুল আলম বললেন, এরপর আপনাকে আসতে বলা তো আমার ক্ষমতার বাইরে। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবেন না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনী স্যার বললেন, আচ্ছা!

বারবার ক্লাস ঘরগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি বেরিয়ে গেলেন আস্তে আস্তে।

আর তিনি এ স্কুলে আসবেন না। সব সম্পর্ক শেষ!

এর দু'মাস পর একটা ছুটির দিনে নুরুল আলম দুপুরবেলা ট্রেন ধরতে আসেন স্টেশনে। কলকাতায় যাবেন।

স্টেশনের বাইরে একটা যাত্রীশেডের দিকে তাঁর চোখ আটকে গেল। কৌতূহলী হয়ে তিনি সেখানে দাঁড়ালেন। কতগুলো ছেঁড়া চট আর চাটাইয়ের ওপর বসে আছে দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে। ভিখিরি বা বস্তির ছেলেমেয়ে বলেই মনে হয়। নানান বয়েসের। তাদের গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়াচ্ছেন অবনী স্যার।

একবার চোখ তুলে নুরুল আলমকে দেখতে পেয়ে তিনি লাজুক গলায় বললেন, কী করব, এতদিনের পড়ানো অভ্যেস। সময় আর কাটতে চায় না। তাই এদের যতটুকু পারি পড়াবার চেষ্টা করি।

তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে নুরুল আলম বললেন, তিনমাস পরে আমিও রিটায়ার করব। তখন আমারও কাজ থাকবে না। আমি এসে যোগ দেব আপনার সঙ্গে। এই স্কুলটাকেই বড় করে তুলব!

ভুতুড়ে ঘোড়ার গাড়ি ও কালো বাক্স

ছোট্ট টুনটুন কিছুতেই ভূতের ভয় পেতে চায় না। কতই বা তার বয়স, বড়জোর সাড়ে পাঁচ বছর। আমরা ছ'বছর বয়েসের আগে স্কুল কাকে বলে তাই-ই জানতাম না, এখন তিন বছর বয়স থেকেই বাচ্চারা স্কুলে যায়, তাই ওরা খুব চটপটেও হয়।

টুনটুন আমার বন্ধু অরূপ আর অনন্যার ছেলে। ওদের বাড়ি টালিগঞ্জে। মেট্রো স্টেশনের খুব কাছে। পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি, দু' পাশে দুটো বেশ বড় ঝাঁকড়া গাছ। ওই গাছ দুটোর জন্য বাড়িটাকে দিনের বেলা বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু রাত্তিরবেলা বেশি-বেশি অন্ধকার মনে হয়।

ওইটুকু ছেলে টুনটুন, কিন্তু তার অনেক গুণ। সে বেশ তবলা বাজাতে পারে। দুর্দান্ত টেবিল টেনিস খেলে, আর গড়গড়িয়ে কবিতা মুখস্থ বলতে পারে।

একদিন একজন সাহেব এসেছিল ওদের বাড়িতে। তখন অরূপ আর অনন্যা কেউই বাড়ি ছিল না। কাজের লোকটি দরজা খুলে ঘাবড়ে গেল। সে তো ইংরেজি বলতে পারবে না! তখন টুনটুন এসে দিব্যি ইংরেজিতে কথা চালাতে লাগল সেই সাহেবের সঙ্গে।

এই টুনটুনকে আমি একদিন বলেছিলাম, "তোমার নাম তো টিনটিন রাখলে আরও ভালো হত।"

টিনটিনের অনেক বইয়ের গল্প টুনটুন জানে। সব এখনো পড়তে পারে না, কিন্তু তার মায়ের মুখে গল্প শুনেছে। আমার কথা শুনে সে গম্ভীরভাবে বলেছিল, "মোটেই না। আমি কেন টিনটিন হব? আমি টুনটুন। আমার নাম বেশি ভালো। মা-বাবা আমাকে এই নামে ডাকে।"

ওদের বাড়িতে আমি গেলেই টুনটুন আমার কাছে গল্প শুনতে চায়। আমি অবশ্য ওকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনাই। ভূতের গল্প কখনও বলিনি। ভূতের গল্প আমি জানিই না!

ভূতের গল্প শোনান ওর ছোটদাদু!

আমি এই শনিবার গেছি ওদের বাড়িতে। দরজা খোলার পরই টুনটুন আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কাকু বলো তো, ঘোড়া কখনও ভূত হয়?"

পিছন থেকে ওর বাবা বললেন, "অ্যাই টুনটুন, কাকুকে আগে ভিতরে এসে বসতে দে।"

সোফায় বসে, টুনটুনকে কাছে টেনে এনে ওর নরম চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে

জিজ্ঞেস করলাম, "ঘোড়া-ভূতের ব্যাপারটা কী?"

টুনটুন ঠোঁট উলটে বলল, "ঘোড়ারা আবার ভূত হয় নাকি? ছাই!"

অরূপ বলল, "আজকালকার বাচ্চা কী পাকা হয়েছে দ্যাখ। ওর মতন বয়সে জব্বর ভূতের গল্প শুনতে আমাদের ভয়ে গা ছমছম করত। মায়ের কোল ঘেঁষে বসতাম। আর আমার ছেলে ভূতের কথা শুনলেই ঠোঁট উলটে বলে, বাজে গল্প।"

অনন্যা বলল, "আমি সাত-আট বছর বয়সে একটা পাখি-ভূতের গল্প পড়ে খুব ভয় পেয়েছিলাম। কুকুর-ভূতের বিখ্যাত গল্প 'হাউন্ড অফ বাস্কার ভিল্‌স'। তা হলে ঘোড়া-ভূত হবে না কেন? যাদের প্রাণ আছে, তারাই ভূত হতে পারে।"

টুনটুন ফুরফুর করে হেসে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তা হলে, তা হলে, গাড়ির কি প্রাণ আছে? গাড়ি কী করে ভূত হয়!"

এ-প্রশ্ন শুনে অনন্যাও যেন ঘাবড়ে গেল। চুপ করে রইল উত্তর না দিতে পেরে।

আমি ভূতের গল্প লিখতে পারি না। কিন্তু পড়তে কিংবা শুনতে বেশ ভালো লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গাড়ি-ভূত ব্যাপারটা কী?"

অরূপ বলল, "ছোটকাকা ওকে একটা গল্প বলেছে। বেশ জমজমাট ভূতের গল্প। টুনটুন সে গল্প শুনে মোটেই বিশ্বাস করতে চায় না। শুধু হাসে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "গল্পটা কী?"

অরূপ কিছু বলবার আগেই টুনটুন বলল, "আমি বলছি, আমি বলছি!"

অনন্যা বলল, "দাঁড়াও, আগে চা আনি। সুনীলদা, তুমি চায়ের সঙ্গে নিমকি খাবে? ভালো নিমকি আছে।"

টুনটুন মা'কে বকুনি দিয়ে বলল, "দাঁড়াও, আগে খাওয়ার কথা নয়। আগে গল্প।"

আমিও বললাম, "হ্যাঁ, আগে গল্প।"

টুনটুন চোখ পাকিয়ে বলল, "একদিন...ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত... কপ কপ করে ঘোড়া চালিয়ে আসছে একজন সাহেব..."

আমি জিজ্ঞেস কললাম, "শুধু ঘোড়া, না ঘোড়ার গাড়ি?"

টুনটুন বলল, "আরে আগে শোনো না সবটা! ঘোড়া চালিয়ে আসছে সাহেব, খুব টায়ার্ড, কপালের ঘাম মুছছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কোথায়? বিলেতে?"

টুনটুন বলল, "না, কলকাতায়। প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, অনেক...অনেক দিন আগে।"

অরূপ বলল, "তখন কলকাতায় অনেক সাহেব ছিল। সবাই ঘোড়ায় চড়ত।"

টুনটুন বলল, "বাবা, আমি বলব, আমি বলব।... অনেক রাত, সাহেবটা বাড়ি ফিরছে। খুব কাছে এসে গেছে। এমন সময় দ্যাখে কী, তার আগে-আগে যাচ্ছে একটা

কালো রঙের ঘোড়ার গাড়ি। সে গাড়িতে তিন-তিনখানা ঘোড়া।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আগে সে ঘোড়ার গাড়িটা দেখতে পায়নি?"

অরূপ বলল, "হয়তো পাশের কোনো গলি থেকে এসেছে!"

টুনটুন আবার হাত তুলে বলল, "অ্যাই, তোমরা কেউ বলবে না! আমি বলব! আমি বলব। না, ওই সাহেবটা আগে ঘোড়ার গাড়িটা দ্যাখেনি। হঠাৎ চলে এল কোথা থেকে। তারপর ঘোড়ায় চড়া সাহেবটার বাড়ির একেবারে দরজার কাছে সেই গাড়িটা থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে আর-একজন সাহেব লাফিয়ে নেমে পড়ল সেই গাড়ি থেকে। তারপর দৌড়ে ঢুকে গেল ভিতরে। লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সে বাড়িটার দরজা খোলা ছিল অত রাতে?"

টুনটুন বলল, "কী জানি, তা জানি না!"

অরূপ বলল, "অন্য সাহেবকে দেখে আপনি-আপনি দরজা খুলে গিয়েছিল নিশ্চয়ই!"

টুনটুন বলল, "আগের ঘোড়ায়-চড়া সাহেবটাও নেমে পড়ে পিছন-পিছন এসে জিজ্ঞেস করল, 'কে? কে?' অন্য সাহেবটা শুনলই না। কোনো উত্তরই দিল না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, উঠতেই লাগল। অন্য সাহেবটাও তাকে ফলো করছে। হঠাৎ অন্য আগের সাহেবটা একেবারে উপরে উঠে ফিরে দাঁড়াল। অন্য সাহেবটার দিকে থুঃ করে অনেকখানি থুতু দিল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই সাহেবটা ভূত!"

অনন্যা বলল, "অ্যাই টুনটুন, তুই এই জায়গাটা নিজে বানাচ্ছিস! মোটেই থুতু দেয়নি। এমনিই অদৃশ্য হয়ে গেছে।" টুনটুন খিলখিল করে হাসতে-হাসতে বলল, "ততক্ষণে সেই কালো ঘোড়ার গাড়িটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে! সাহেবটাও নেই, ঘোড়ার গাড়িও নেই। সব ফক্কা! সাহেবটাও ভূত, গাড়িটাও ভূত! তিন-তিনটে ঘোড়া!"

টুনটুনের হাসি আর থামেই না!

অরূপ আমাকে জিজ্ঞেস করল, "সুনীল, তুই এই গল্পটা তো আগে শুনেছিস, তাই না?"

আমি বললাম, "এটা তো বিখ্যাত গল্প! ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূত। অনেকেই নাকি দেখেছে! বছরে একবার আসে! এত দিন পরেও কি আসে?"

অরূপ তার ছেলেকে বলল, "ওয়ারেন হেস্টিংস কে ছিল জানিস না তো! আমাদের দেশ তখন পরাধীন। ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন গভর্নর জেনারেল, মানে বড়লাট। তিনি অনেক অন্যায় করেছিলেন। আমাদের মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। দেশে ফিরে যাওয়ার পর, মানে, লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পর এই ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার হয়। তাঁকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়, বুঝলি!"

টুনটুন বলল, "মরে গিয়ে ভূত হল লন্ডনে! তাহলে কলকাতায় ফিরে আসে কেন? ভূত কি এত দূর আসতে পারে?"

অরূপ বলল, "ভূতেরা সব পারে। ওয়ারেন হেস্টিংস ভূত হয়ে কলকাতায় কেন ফিরে আসে জানিস? হেস্টিংসসাহেব যখন কলকাতা ছেড়ে চলে যান, তখন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার সময় একটা ছোট কালো বাক্স নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই বাক্সটায় ছিল অনেক দরকারি কাগজপত্র। সেই কাগজপত্রগুলো দেখাতে পারলে বিচারের সময় অনেক সুবিধে হত। হয়তো, ওঁর দোষ অনেক কমে যেত। কিন্তু তখন আর ফেরার উপায় ছিল না। তাই ভূত হয়ে ফিরে আসে।"

টুনটুন বলল, "ভূত কি প্লেনে চেপে আসে?"

অরূপ বলল, "ধ্যাত, তখন তো প্লেন আবিষ্কারই হয়নি! ভূতরা নিজেরাই আকাশে উড়তে পারে।"

টুনটুন আবার খিলখিল করে হাসতে লাগল।

অরূপ বলল, "দেখেছ, দেখেছ, ছেলেটা এখনো হাসছে!"

টুনটুন বলল, "তিন-তিনটে ঘোড়া-ভূত! আবার গাড়িটাও ভূত!"

ছেলেটার হাসি দেখে আমারও হাসি পেয়ে গেল!

অনন্যা একটু বাদে চা আর নিমকি নিয়ে এল।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে আমি বললাম, "এসব তো দুশো বছরেরও আগের কথা। কোনো মানুষ দুশো বছর বাঁচে না। ভূতের আয়ু কি মানুষের চেয়েও বেশি?"

অরূপ বলল, "সেই বাড়িটা কিন্তু এখনো আছে। হেস্টিংস হাউজ। হেস্টিংসসাহেব চলে যাওয়ার পর সেখানে অন্য সাহেবরা থাকত। তারপর অনেক হাত বদল হয়েছে। এখনো নাকি পনেরোই ফেব্রুয়ারি রাত্তিরে সেখানে ঘোড়ার গাড়িটা দেখা যায়!"

আমি বললাম, "টুনটুন কিন্তু একটা কথা ঠিকই ধরেছে। মানুষ মরলে ভূত হয়, এরকম অনেক শোনা গেছে। কেউ মানে, কেউ মানে না। যাদের প্রাণ আছে, তারাই ভূত হতে পারে, যদি একথা ধরেই নিই, কিন্তু কাঠের তৈরি একটা গাড়ি, সেটা কী করে হঠাৎ দেখা যাবে? কী করেই বা অদৃশ্য হয়ে যাবে? কাঠের গাড়ি তো ভূত হতে পারে না!"

অনন্যা বলল, "একটা কাজ করলে হয় না? পরশুই তো পনেরোই ফেব্রুয়ারি। সেই রাতে আমরা ওই বাড়িতে গিয়ে যদি রাত্তিরে থাকি, তা হলে আমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারি!"

অরূপ বলল, "আমরা ও বাড়িতে থাকব কী করে? আমাদের পারমিশান দেবে কেন?"

আমি বললাম, "সে ব্যবস্থা বোধ হয় করা যাবে!"

টুনটুন বলল, "হ্যাঁ, চলো, চলো, আমরা ভূত দেখব, ভূত দেখব!"

সে ব্যবস্থা করতে তেমন অসুবিধে হল না।

সরকারের একজন বড় অফিসারের সঙ্গে আমার চেনা ছিল, সেই ব্যবস্থা করে দিল।

রাত্তিরবেলা ও বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার থাকে। দিনের বেলা এখানে একটা কিছু ট্রেনিং কলেজের ক্লাস হয়, রাত্তিরে ফাঁকাই পড়ে থাকে।

কেয়ারটেকারের নাম ঘনশ্যাম দাস। খুব গাট্টাগোট্টা চেহারা, মুখে বড় গোঁফ। তার একটা বন্দুকও আছে।

ঘনশ্যামকে দেখেই টুনটুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ঘোড়ার গাড়ির ভূত দেখেছেন? সে গাড়ি এখনও আসে?"

ঘনশ্যাম বলল, "হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি।"

টুনটুন আবার জিজ্ঞেস করল, "ভয় পান না?"

ঘনশ্যাম বলল, "ভয় পেলে কি আর এই চাকরি করতে পারতাম খোকা? আমার আগের অনেক লোক ভয়ে পালিয়েছে। এখনকার যা দিনকাল পড়েছে, বাঘ-সিংহ-ভূত কিছুরই ভয় পেলে আর চাকরি থাকে না!"

অরূপ জিজ্ঞেস করল, "আপনি সত্যিই কি দেখেছেন? ঘোড়ার গাড়িটা আসে?"

সে ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, বছরে একদিন আসে!"

অরূপ আবার জিজ্ঞেস করল, "হেস্টিংসসাহেবকে সে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছেন?"

ঘনশ্যাম বলল, "হ্যাঁ, তাও দেখেছি! এমনকি এক রাতে উপরের একটা বাথরুমে দরজা খুলে দেখি, সেখানে একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। যেমন ছবি আছে, সেইরকম চেহারা।"

টুনটুন বলল, "সেই সাহেব-ভূত আপনাকে দেখে কী বলল?"

ঘনশ্যাম বলল, "সেই সাহেব চোখ পাকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'ড্যাম ফুল, গেট আউট!' আমিও বললাম, 'নো গেট আউট! এটা আমার চাকরি!' ব্যস, অমনি সাহেব অদৃশ্য হয়ে গেল!"

টুনটুন আবার হাসতে-হাসতে বলল, "নো গেট আউট! নো গেট আউট!"

উপরের হলঘরটায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল।

অনন্যা টিফিন কেরিয়ার ভর্তি করে লুচি, আলুর দম, কিমার তরকারি আর দু'-তিন রকম সন্দেশ নিয়ে এসেছে। আর ফ্লাস্কে চা।

আটটা বাজতে না-বাজতে খিদে পেয়ে গেল।

খাওয়া শুরু করার পর অনন্যা বলল, "কেয়ারটেকার ভদ্রলোককেও কিছু খাবার দেওয়া উচিত।"

আমি বললাম, "একটা বাটিতে সবকিছু দাও। আমি ওকে দিয়ে আসছি।"

ঘনশ্যামকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওর হাতে খাবারের বাটিটা দিয়ে আমি বললুম, "শুনুন, আপনি ভূত দেখেছেন কি দেখেননি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না! আমরা এখানে সারারাত থাকব, তারপর যা ঘটবার ঘটবে! কিন্তু আপনি মিথ্যে-মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে আছে, হঠাৎ ভয় দেখালে ওর ক্ষতি হতে পারে!"

ঘনশ্যাম বলল, "ওই বাচ্চা ছেলেটা স্যার, মুখ দেখেই বোঝা যায়, দারুণ চালু! ওকে ভয় দেখানো খুব শক্ত। আসল ভূত এলেও লজ্জা পেয়ে যাবে!"

রাস্তা দিয়ে অনেক গাড়ি চলে। রাত দশটা বাজার পর গাড়ির শব্দ ক্রমশ কমে এল।

আমরা যদিও আলো জ্বেলে রেখেছি, তবু এক-এক সময় গা কেমন ছমছম করে। ভূতে বিশ্বাস না করলেও এরকম হয়!

হেস্টিংস সাহেবের ঘোড়ার গাড়ি আসবার কথা রাত ঠিক বারোটার সময়। সেই পর্যন্ত জেগে থাকতেই হবে। এমন কিছু কষ্টকর নয়।

কিন্তু রাত পৌনে এগারোটার সময়ই আমরা বাড়ির সামনের রাস্তায় কপ কপ আর ঝনঝন করে ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

অমনি সবাই ছুটে গেলাম জানলার ধারে।

সত্যিই একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে, সাদা রঙের, সেটা টানছে দুটো ঘোড়া।

সে গাড়িটা কিন্তু এ বাড়ির সামনে থামল না। সোজা চলে গেল।

অরূপ বলল, "এ পাড়ার বড়লোকদের এখনও দু'-একখানা ঘোড়ার গাড়ি আছে। দু' ঘোড়ার গাড়িকে বলে জুড়িগাড়ি।

অনন্যা বলল, "রাত্তিরবেলা এরকম গাড়ির আওয়াজ শুনলেই অনেকে ভাবতে পারে, ভূতের গাড়ি!"

টুনটুন বলল, "ভূতের গাড়ি সাদা হয় না। কালো! নট গেট আউট! নট গেট আউট!"

আবার আমরা ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। একটা গোল টেবিল ঘিরে কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। এই চেয়ারেই বসে-বসে রাত কাটাতে হবে। সঙ্গে লুডো আর তাসও আছে।

খানিক বাদে হঠাৎ বেশ জোরে একটা শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন মাটিতে কোনো পাথরের জিনিস ঘষছে। শব্দটা শুনে প্রথমটা বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। অনন্যা তো বলেই উঠল, "ওরে বাবা, ওটা কিসের শব্দ!"

শব্দটা আসছে এই বাড়ির ভিতর থেকে।

আমি অরূপকে বললাম, "তুই এখানে থাক, আমি দেখছি!"

অরূপ বলল, "চল, আমিও যাচ্ছি তোর সঙ্গে।"

অনন্যা বলল, "আমি একা থাকতে পারব না!"

টুনটুন অমনি বলে উঠল, "একা মানে? আমি আছি না?"

ঠিকই তো, এরকম সাহসী ছেলে আছে, অনন্যার ভয় কী!

খানিকটা খুঁজতেই দেখা গেল, দোতলাতেই একটা ছোট ঘরে শুয়ে আছে ঘনশ্যাম। শব্দটা আর কিছু না, তার নাসিকা গর্জন! কোনো মানুষের এত জোর নাক-ডাকা আমি আগে শুনিনি।

আমরা দু'জনে মিলে ঘনশ্যামকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিলাম। তাতে তার নাক ডাকা থামল, কিন্তু ঘুম ভাঙল না।

ঘরে ফিরে এসে আমরা তাস খেলা শুরু করলাম তিনজনে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল, টুনটুন তো ঘরে নেই! সে কোথায় গেল!

টুনটুনকে বারবার বলে দেওয়া হয়েছিল, সে এই ঘরেই থাকবে, আর কোথাও যাবে না।

এই ঘরের সঙ্গে আছে একটা বাথরুম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, টুনটুন সেখানেও নেই।

আমরা ডাকতে লাগলাম তার নাম ধরে, "টুনটুন। টুনটুন!"

কোনো সাড়া নেই। ছটফটে ছেলেটা গেল কোথায়?

একতলায় যাওয়ার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিলাম, সেটা ভিতর থেকে বন্ধই আছে। তার মানে ও নীচে যায়নি।

উপরতলার কয়েকটা ঘর তালাবন্ধ। দুটো মাত্র ঘর খোলা, সেখানেও তাকে দেখা গেল না।

ঘনশ্যাম এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কয়েকবার তাকে ডাকাডাকি করেও কোনো লাভ হল না। কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না।

এত যার গভীর ঘুম, তার আবার ভূতের ভয় থাকবে কী করে? তবে তার চাকরি কেয়ারটেকারের, সে এরকম ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই ডিউটি দেয়।

তা হলে কি ছাদে গেছে টুনটুন?

আমরা তিনজনেই উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। উপরের দরজাটার একটা পাল্লা ভাঙা, সুতরাং সেটা বন্ধ করার প্রশ্নই নেই।

মস্ত বড় ছাদ। আকাশে এখন জ্যোৎস্না। সেই ছাদে কোথাও দেখা গেল না টুনটুনকে।

আমাদের সবাইর গলা শুকিয়ে গেল।

কোথায় গেল টুনটুন? সে কী একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল?

ঘরের বাইরে গেলেও সে আমাদের ডাকে সাড়া দেবে না কেন?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অনন্যা।

আমি আর অরূপ দৌড়ে গেলাম পাঁচিলের কাছে। সামনের রাস্তায় এখন গাড়িটাড়িও নেই। সব দিক একেবারে ফাঁকা।

অরূপ বলল, "কী হল বল তো! কোথায় যেতে পারে। তা হলে তো এক্ষুনি থানায় খবর দেওয়া দরকার।"

আমারও একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাবার মতন অবস্থা। একটা ছেলে কী করে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, তা মাথাতেই ঢুকছে না।

এই সময় হঠাৎ কী একটা পাখি সেখানে এসে ডানা ঝাপটাতে লাগল। আমাদের খুব কাছেই।

অনন্যা আরও ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ও মা গো!"

অনন্যা একটা পাখি-ভূতের কথা বলেছিল! গল্পে পড়েছে। এটাকেও নিশ্চয়ই পাখি-ভূত ভেবেছে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি, সেটা একটা বাদুড়।

এখানে এই সময়ে একটা বাদুড়ই বা এল কী করে? অনেক ভূতের গল্পে বাদুড় থাকে।

তারপরই মনে পড়ল, এই আলিপুরের দিকে অনেক বাদুড় আছে, আমি আগে দেখেছি। দিনের বেলা একটু উঁচু গাছে ঝোলে।

বাদুড়টা কয়েক পাক ঘুরেই চলে গেল।

তারপরই একটা শব্দ হল ছাদের এক কোণে।

আগে লক্ষ করিনি, ছাদের ভিতরের দিকে পাঁচিলের এক পাশে দু'খানা ছোট-ছোট ঘর আছে। খুবই ভাঙাচোরা চেহারা। জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক বোঝা যায় না।

এই রকম সময় যে-কোনো শব্দ শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। একটা সামান্য বাদুড়কে দেখলেও অন্যরকম মনে হয়।

আমি আর অরূপ সেই শব্দ-হওয়া দিকটায় খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল টুনটুন। তার হাতে কী যেন রয়েছে।

অরূপ দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কোথায় গিয়েছিলি? কী করছিলি?"

অনন্যা হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, প্রথমে সে টুনটুনকে দেখতেই পায়নি। এবার হাত সরিয়ে সে ছেলেকে দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠল। এ কান্নাটা আনন্দের।

টুনটুন যে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এল, আমি সেটার মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলাম।

অজস্র কাগজপত্র আর ভাঙা জিনিসপত্রের জঞ্জাল সেখানে জড়ো করা রয়েছে।

ফুটো বালিশ থেকে আরম্ভ করে ভাঙা কাপ-ডিশ, সবই রয়েছে সেখানে।

টুনটুনের হাতে ওটা কী?

টুনটুন বলল, "এই দ্যাখো, কী পেয়েছি!"

একটা চ্যাপটা মতন কালো বাক্স, তার উপরে ইংরেজি বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'ওয়ারেন হেস্টিংস'!

অরূপ জোরে বলে উঠল, "এই তো ওয়ারেন হেস্টিংসের সেই ফেলে যাওয়া বাক্স! তুই খুঁজে পেলি?"

বাক্সটার তলা খুলে গেছে। উপরটাও ফাটা-ফাটা, ব্যবহারের অযোগ্য। তাই এতদিন কেউ নেয়নি। ভিতরের কাগজপত্র বেরিয়ে আসছে।

আমি একটা কাগজ নিয়ে দেখতে গেলাম, অমনি সেটা ঝুরঝুর করে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল।

কোনো কাগজই এখন আর পড়ার অবস্থা নেই। এতদিন আগেকার জিনিস, হাত দিলেই গুঁড়িয়ে যায়।

অরূপ বাক্সটা উলটে সব কাগজের গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে দিল বাইরে।

আমি বললাম, "ইস, বেচারি ওয়ারেন হেস্টিংস এই বাক্সটা খুঁজে পেলে, ভূত হয়ে এত দূরে বারবার ছুটে আসতে হত না!"

ঠিক তখনই আমরা রাস্তায় পেলাম একটা ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ।

আমরা ছুটে গেলাম রাস্তার ধারের পাঁচিলের দিকে। সত্যিই একটা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে এ বাড়ির দিকে। চোখের ভুল নয়, সত্যি দেখছি।

আমার বুক ধকধক করছে। এই তবে সেই ভূতের গাড়ি। জীবনে প্রথম এখানে ভূত দেখব?

গাড়িটা কিন্তু এ বাড়িটার গেট পর্যন্ত এল না। একটু আগে থেমে গেল। একটা ঘোড়া ডেকে উঠল চিঁ হিঁ হিঁ করে। তারপর গাড়িটা ঘুরে গেল উলটো দিকে। কপ-কপিয়ে চলে গেল অনেক দূরে।

সেটা ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূতের গাড়ি না সে পাড়ারই কোনো ধনী ব্যক্তির জুড়িগাড়ি, তা আমি জানি না।

তবে একটা কথা ঠিক, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূতের গাড়ি এখানে আর কোনোদিনও আসবে না। কারণ সেই বাক্সটার মধ্যে যে এখন আর কিছুই নেই!

অরূপ তার ছেলেকে বলল, "দেখলি, দেখলি তো? ভূতের গাড়ি!"

টুনটুন ঠোঁট উলটে বলল, "ভূত না ছাই! এ তো সেই সাদা গাড়িটা! দুটো মোটে ঘোড়া!"

তিনটি ছবির রহস্য

মধুপুরে আমার মামাবাড়ির পাশেই ছিল একটা শুকনো নদী। আমি কোনোদিন সে নদীতে এক ফোঁটাও জল দেখিনি। কিন্তু একসময় নাকি সে নদীতে সারা বছরই জল থাকতো, কুলুকুলু করে স্রোতের শব্দও হত।

এখন নদীটা একেবারে মজে গেছে।

শুধু দু'দিকের উঁচু পাড়ের মাঝখানে খাতটা বোঝা যায়।

যখন এ নদী জ্যান্ত ছিল, তখন এর নাম ছিল মধুবংশী। নামটা শুনতে সুন্দর, কিন্তু কেন এরকম নাম তা এখন আর কেউ জানে না।

ছোটবেলায় আমার ওই শুকনো নদীর খাতে নেমে লুকোচুরি খেলতাম। একটু বড় হবার পর আমি ওখানে একটা শিমুল গাছের তলায় বসে ছবি আঁকতাম রোজ।

আর্ট কলেজে ভর্তি হবার পর আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা বলে দিয়েছিলেন, যখনই সময় পাবে একটা বড় খাতায় স্কেচ করবে। চোখের সামনে যা দেখবে, তাই-ই এঁকে ফেলবে। যা চোখের সামনে নেই, এমন কিছুও মন থেকে আঁকতে পারো। ভালো হোক, খারাপ হোক, এঁকে যাবে। ভালো আঁকা শেখার এই একমাত্র উপায়।

অশোকদার সেই কথা শুনে আমার নেশা ধরে গিয়েছিল। বড় খাতাটা নিয়ে ঘুরতাম সব সময়, যেখানে-সেখানে বসে শুরু করতাম আঁকা। হাওড়া স্টেশনে এসে একদিন জানা গেল, ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট, অপেক্ষা করতে হবে। অমনি আমি প্ল্যাটফর্মে বসে পড়ে স্কেচবুকটা খুলে শুরু করে দিয়েছি আঁকতে।

বছরে দু'বার আমরা যেতাম মধুপুর। গরমের ছুটিতে, আর পুজোর সময়।

আমার দাদু খুব শখ করে এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বাড়িটা তেমন বড় নয়, কিন্তু অনেকখানি বাগান। আর একপাশে তো একটা নদী ছিলই।

এখন দুই মামাই থাকেন বিদেশে। একমাত্র বড়মামা যান মধুপুরে। কিন্তু তাঁর শরীর ভালো নয়, তিনি ভাবছেন বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। সেটা শুনলে আমাদের খারাপ লাগে, কিন্তু কী আর করা যাবে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাবার আগে আমার বারবার যেতে ইচ্ছে হয়। কলকাতা থেকে আর কেউ না গেলে আমি একাই চলে যাই।

সে বাড়িটা পাহারা দেয় মঙ্গল সিং, বাগানের একধারে তার কোয়ার্টার। তার বউ,

দুই ছেলে, এক ছেলের বউও থাকে সেখানে। বড়মামা অবশ্য বলে রেখেছেন, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলেও তিনি মঙ্গল সিংকে বাগানের খানিকটা অংশের জমি লিখে দেবেন।

আমি একা মধুপুরে হাজির হলে মঙ্গল সিং-এর বাড়ি থেকেই আমার জন্য খাবার-টাবার আসে। ওরাই আমার দেখাশুনো করে।

শিমুল গাছতলায় ওরা আমার জন্য চেয়ার-টেবিল পেতে দেয়। আমি বসে বসে ছবি আঁকি সারা দিন।

আগে মামাতো ভাই-বোনেরা অনেকে আসতো, সব সময় হাসি, মজা, গল্পে সরগরম থাকতো জায়গাটা। এখন প্রায় নিঝুম। কাছাকাছি আর বাড়ি নেই। অন্য লোকজনও এদিকে বিশেষ আসে না।

আমার খাতাখানা ছবিতে প্রায় ভরে গেছে। অবশ্য আরও একটা খাতাও আছে, সেটা বেশ বড়। দশ দিন থাকবো, দুটো খাতাই ভর্তি করে নিয়ে যেতে পারলে বেশ হয়।

দু'জনের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা আছে। আর্ট কলেজে আমার ঠিক পাশেই বসে অতীশ আর সঙঘমিত্রা। যদিও বসে একেবারে সামনের দিকে, তবু মাঝে মাঝেই আমরা মিলিয়ে দেখি, কে কতটা স্কেচ করেছে। অতীশ সব সময়েই আমার থেকে এগিয়ে থাকে, যে-কোনো জিনিস দেখেই ও স্কেচ করে ফেলতে পারে ঝটাপট। আর সঙঘমিত্রা অত তাড়াতাড়ি আঁকতে পারে না, সে ধরে ধরে আঁকে, সংখ্যায় কম হলেও তার ছবিগুলোই বেশি ভালো হয়।

আমি বেশির ভাগ ছবিই দেখে দেখে আঁকি। অতীশ সবই আঁকে মন থেকে। ও গাছপালার ছবি একেবারে পছন্দ করে না। নানা রকমের মানুষ আর জীবজন্তুর ছবিই বেশি আঁকে।

আমাদের মাস্টারমশাই অশোকদা অবশ্য বলেছেন, কিছু একটা দেখে দেখে আঁকাও দরকার। একটা গাছকেও ঠিক মতন আঁকা মোটেই সহজ নয়।

শিমুল গাছতলায় বসে, চতুর্দিকে যা দেখা যায়, তা প্রায় সবই আমার আঁকা হয়ে গেছে। একই জিনিস বারবারও আঁকা যায়। এখান থেকে দেখা যায় মাঠের শেষ প্রান্তে দুটো ছোট ছোটো পাহাড়ের রেখা। বৃষ্টির সময় কিংবা মেঘলা দিনে সেই পাহাড় অন্যরকম দেখায়। তিন-চারখানা ছবি এঁকেছি সেই পাহাড়ের।

সঙঘমিত্রা পাহাড় আঁকতে ভালোবাসে। আমার কাছে মধুপুরের এই বাড়িটার গল্প শুনে ও আমাকে অনেকবার বলেছে, একবার আমাকে নিয়ে চল না, আমিও তোর পাশে বসে ছবি আঁকবো।

আমি বলেছি, যখন ইচ্ছে যেতে পারিস। অনেক ঘর খালি পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়ারও কোনো অসুবিধে নেই।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর ওর আসা হয় না। একটা না একটা কারণে আটকে যায়। এইবারই তো আমার সঙ্গে আসবে বলে সব ঠিকঠাক, হঠাৎ ওর জামাইবাবুর সঙ্গে চলে গেল দেরাদুন। সেখানে অবশ্য অনেক বড় বড় পাহাড় দেখতে পাবে।

অতীশ কলকাতার বাইরে বিশেষ যেতে পারে না। ও একটা টিউশানি করে।

সেদিন বিকেলে আমি হঠাৎ একটা বাঘ আঁকতে শুরু করলাম। কেন হঠাৎ বাঘ আঁকার কথা মনে এলো, তা জানি না। চিড়িয়াখানার বাইরে আমি কখনো বাঘ দেখিনি। মনে যখন এসেছে, তখন আঁকতে ক্ষতি কী? সত্যিকারের বাঘ কিংবা বাঘের ছবিও না দেখে মন থেকে ঠিকঠাক আঁকা মোটেই সহজ নয়।

আঁকতে আঁকতে সন্ধে হয়ে গেল।

কিন্তু আঁকার নেশা একবার ধরে গেলে আর ছাড়া যায় না। এখানে আলো নেই, তাই বাড়ির মধ্যে ঢুকে ছবিটা শেষ করতে বসলাম। মনে হল, ভালোই হয়েছে, ঠিক বাঘ বাঘ দেখাচ্ছে।

তারপর মনে হল, শুধু স্কেচ করার বদলে এটার গায়ে রং দিলে আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।

হলদে, কালো, আরও সব রঙই আছে। রং দেওয়া যখন শেষ হল, তখন আমি হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধ পেলাম। এটা কিসের গন্ধ? ইঁদুর মরে পচে গেছে নাকি? না তো, এ গন্ধ অন্যরকম। মনে পড়লো, চিড়িয়াখানায় গিয়ে এই গন্ধ পেয়েছি। বাঘের খাঁচার সামনে!

প্রথমে একটু ভয় পেলেও একটু পরে মজাই লাগলো। এখানে তো বাঘ আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি বাঘের ছবি আঁকছি, অমনি বাঘের গন্ধ পেলাম, এ তো সবই মনের ব্যাপার।

আসল মজাটা হল পরদিন সকালে।

ঘুম ভাঙলো মঙ্গল সিং আর তার ছেলেদের চ্যাঁচামেচিতে। তারা উত্তেজিত ভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

বাইরে এসে দেখি, মঙ্গল সিংয়ের দু'হাতে ধরা রয়েছে একটা বেশ বড় সাইজের বেড়াল। সেটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করছে।

মঙ্গল সিং বললো, দেখো খোকাবাবু, একঠো শের আয়া। শের!

মঙ্গল সিং আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। সেই জন্য আমাকে খোকাবাবু বলে।

শের, মানে বাঘ? যাঃ, তা কখনো হয়? মধুপুরে বাঘ আসবে কোথা থেকে? কাছাকাছি জঙ্গল-টঙ্গল কিছু নেই। নিশ্চয়ই একটা বিড়ালকে ধরে মজা করছে আমার সঙ্গে।

কাছে গিয়ে দেখি, বেড়াল তো নয়। গায়ে গোল গোল ছাপ। মুখটাও একটু অন্যরকম। একটা চিতাবাঘের বাচ্চা! এগুলোকে বলে লেপার্ড।

কিন্তু আমি কাল রাত্তিরে একটা বাঘ আঁকলাম, আর অমনি আজ সকালে একটা বাঘ এসে গেল? একেই বলে কাকতালীয়!

মঙ্গল সিং বললো, এই বাচ্চা শেরটা শুকনো নদীর খাতে খেলা করছিল।

কী করে যে বাঘের বাচ্চাটা এলো সেখানে, তার কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি বাঘের ছবি এঁকেছি বলেই একটা জ্যান্ত বাঘ এসেছে, একথা বললে সবাই হাসতো নিশ্চয়ই।

একজন রিকশাওয়ালা বললো, বাচ্চাটাকে আমায় দিয়ে দাও, আমি পুষবো!

হৈ হৈ করে আপত্তি জানালো মঙ্গল সিং-এর দুই ছেলে।

কারুকে দেওয়া হবে না, তারাই বাঘটা পুষবে!

একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হল বাচ্চাটাকে।

কী করে যে রটে গেল খবর, দুপুরের দিকে অনেকেই এসে পড়লো বাঘ দেখতে।

বাঘ অতি হিংস্র প্রাণী, কিন্তু বাচ্চা বয়সে ভারি সুন্দর দেখায়। এর গায়ের চামড়াটা যেন মলমলের মতন। চোখ দুটো দারুণ ধারালো।

পরদিন দুপুরবেলা আমি আবার শিমুল গাছতলায় আঁকতে বসেছি, হঠাৎ একসময় চোখ তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। খুব মন দিয়ে আঁকছিলাম, তাই লোকটির পায়ের আওয়াজ শুনতে পাইনি।

লোকটির যেমন বিচিত্র পোশাক, তেমনই অদ্ভুত চেহারা।

মাথার চুলে সন্ন্যাসীদের মতন জটা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, একটা চশমা পরা, তার একটা ডাঁটি ভাঙা। তার গায়ের লম্বা আলখাল্লাটাও অনেক রঙের। তার মানে নানা রকম টুকরো টুকরো কাপড় সেলাই করা। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে তিন-চারটে থলে, সেগুলোও নানা রঙের। তার মধ্যে একটা থলের মধ্যে জ্যান্ত কিছু আছে, সেটা নড়ছে।

তার ডান হাতে একটা বর্শা।

লোকটিকে দেখে আমার বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। অবশ্য, দুপুরবেলা একজন জলজ্যান্ত মানুষকে দেখে ভয় পাবার কী আছে? তবু, দু'একজন মানুষকে দেখলে এমনিই একটু ভয় ভয় করে।

লোকটি হঠাৎ এলো কোথা থেকে?

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে গম্ভীরভাবে বললো, জয় মহাদেব! মেরা বাচ্চা কিধার হায়?

আমি বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলাম, আপনার ছেলে? এখানে কোনো বাচ্চা ছেলেকে তো কোথাও দেখিনি।

লোকটি হিন্দিতে বললো, বাচ্চা ছেলে নয়। বাঘের বাচ্চা। সেটা আমার। সেটা এখানে এসেছে আমি জানি। আমি গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে এখানে এসেছি।

আমি বললাম, একটা বাঘের বাচ্চা এখানে এসেছে ঠিকই। কিন্তু সেটা আপনার কী করে হল?

লোকটি বললো, আমি বাঘ পুষি। আমার ঝোলায় সব সময় সাপ থাকে, বেজি থাকে, শিয়াল থাকে। আমি এদের নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় ঘুরে বেড়ান?

লোকটি বললো, কখনো স্বর্গে, কখনো নরকে। সে তুমি বুঝবে না। আমার বাচ্চা ফেরত দাও।

মঙ্গল সিংদের বাড়ির সামনে দড়ি দিয়ে বাঁধা লেপার্ডের বাচ্চাটা খুব জোরে জোরে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু করেছে।

সেখানে মঙ্গল সিং-এর এক ছেলেকে দেখে আমি জোরে বললাম, বুধন সিং, বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে এসো তো?

বুধন সিং বাচ্চাটাকে নিয়ে এলো।

সেই লোকটির কাছে আসতেই বাচ্চাটা জোরাজুরি করে এক লাফ দিয়ে বুধন সিং-এর কোল থেকে নেমে সেই লোকটির পায়ে মাথা ঘষতে লাগলো। ঠিক পোষা কুকুরের মতন।

লোকটি বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে বললো, আহা হা, এর গলা কে বেঁধেছে? এর দুখ্ লাগছে। আহা হা! ঠিক হ্যায়, বাচ্চু, তোর আর দুখ্ লাগবে না।

সে বাচ্চাটার গলা থেকে দড়িটা খুলে দিল।

এ বাচ্চাটা যে ওই লোকটিরই পোষা, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং ওকে ফেরত দিতেই হবে।

লোকটি বুধনের দিকে তাকিয়ে বললো, এক গিলাস পানি পিলাওগে?

বুধন দৌড়ে গেল জল আনতে।

আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছি, বাইরের কোনো লোক জল চাইলে, তাকে শুধু জল দিতে নেই। মা-মাসিরা জলের সঙ্গে কিছু না কিছু মিষ্টিও দিতেন। এখানে এখন মিষ্টি কোথায় পাবো?

তাই জিগ্যেস করলাম, আমাদের এই বাগানে ভালো আম হয়েছে, আপনি আম খাবেন?

লোকটি এক হাত নেড়ে বললো, আমি কারুর বাড়িতে জল ছাড়া অন্য কিছু খাই না।

এবারে আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম, তা হলে আপনি খিদের সময় খাবার পান কোথায়?

লোকটি বর্শাটা ওপরের দিকে তুলে বললো, ঐখান থেকে খসে খসে পড়ে!

এমন অদ্ভুত লোকও আমি দেখিনি। এমন অদ্ভুত কথাও আগে শুনিনি। আকাশ থেকে খসে খসে পড়ে খাবার?

লোকটি চলে গেল জল খেয়েই। বাঘের বাচ্চাটা দৌড়োতে লাগলো তার পায়ে পায়ে।

বুধনের বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। সে বাচ্চাটা পুষবে ঠিক করেছিল। তবে সে নিজেই বললো, জানো তো নীলুবাবু এইসব মুসাফিররা খুব রাগী হয়। ওদের কথা না শুনলে এমন অভিশাপ দেয় যে পাথরেও আগুন জ্বলে যায়।

এরপর আমি সেই লোকটির ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। দু'তিন বার চেষ্টাতেও ঠিক হল না। ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে আঁকতে পারলে তবু হয়তো কিছু হত।

আমি ফিরে আসার ঠিক আগের দিন একটা সত্যিকারের আনন্দের ঘটনা ঘটলো। অনেকটা অবিশ্বাস্যও বটে।

সকালবেলা বসে আছি শিমুল গাছের তলায়। এখনো ছবি আঁকতে শুরু করিনি। এখানে বসে চা-জলখাবার খেতেও ভালো লাগে।

একটু পরে শুনতে পেলাম অনেক দূরে একটা হৈ হৈ শব্দ হচ্ছে। একসঙ্গে অনেক লোক চ্যাঁচাচ্ছে, কিন্তু কোনো কথা বোঝা যাচ্ছে না।

এরকম গণ্ডগোল শুনলে প্রথমেই মনে হয়, কোথাও মারামারি শুরু হয়েছে বুঝি!

আমাকে খাবার দিতে এসে মঙ্গল সিং বললো, খোকাবাবু, তুমি কোঠির ভিতরে গিয়ে বসো। দিনকাল ভালো নয়।

আমি বললাম, গণ্ডগোল তো হচ্ছে অনেক দূরে। এখানে ভয় পাবার কী আছে?

মঙ্গল সিং বললো, বুধনকে সাইকেল নিয়ে দেখে আসতে বলছি। কিন্তু তুমি সাবধানে থাকবে।

আমি বসে রইলাম সেখানেই। দূরে হৈচৈ চলতেই থাকলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হল, লোকজনের চিৎকার কিছুটা কাছে চলে আসছে। এখন আর শুধু চিৎকার নয়, তার মধ্যে শাঁখ বাজছে, মেয়েরা উলু দিচ্ছে।

শুকনো নদীটার দু' ধার দিয়ে কিছু লোক ছুটে আসছে এদিকেই।

তারপরই দেখলাম, সেই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য।

শুধু মানুষ নয়, নদীর খাত দিয়ে ধেয়ে আসছে জল। ঘোলা জল, যেন টগবগ করে ফুটছে।

নদীর পাড়ে কিছু কিছু ছোট গাছ গজিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ডুবে যাচ্ছে। ওদিক থেকে কিছু কিছু মাছ ভেসে আসছে, তাও দেখা যাচ্ছে। জল যেন আনন্দে লাফাচ্ছে। আমাদের বাড়ির খুব কাছেই বালি জমে জমে খাতটা একেবারে বুজে গিয়েছিল, সেখানে এসে থমকে গেল জলের স্রোত।

কিছু লোক কোদাল আর শাবল নিয়ে লাফিয়ে পড়লো। সেই বালির বাঁধ ভেঙে দিতে বেশি সময় লাগলো না। আবার জলের তোড় চলে এলো এদিকে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির পাশটায় জেগে উঠলো সেই পুরোনো নদী।

এত জল আসছে কোথা থেকে? এখন তো বর্ষাকালও নয়। বর্ষা আসতে আরও দু'সপ্তাহ দেরি আছে। তা হলে একটা মরা নদী বেঁচে উঠলো কোন মন্ত্রে?

বুধন ফিরে আসার আগেই আমরা উত্তরটা জেনে গেলাম দৌড়ে আসা লোকজনদের কাছ থেকে।

এখান থেকে এগারো মাইল দূরে একটা বড় নদী আছে। অনেক বছর আগে সেই নদীর একদিকে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল বন্যা আটকাবার জন্য। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। প্রত্যেক বছর সেই নদীর উল্টোদিক বন্যায় ডুবে যায়। আর এদিকের নদীগুলো গেল একেবারে শুকিয়ে।

এরকমই চলছিল বছরের পর বছর। এ বছর আর মানুষ বন্যায় ডুবতে রাজি নয়। কাল সারাদিন ধরে কয়েক শো মানুষ সেই বাঁধটা কেটে দিয়েছে। বড় নদীর জল ঢুকে পড়েছে ছোট নদীতে। প্রাণ ফিরে পেয়েছে মধুবংশী নদী।

বাড়ির ঠিক পাশেই একটা জ্যান্ত নদী থাকলে সে বাড়ির চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। এতদিন ওই নদীর খাতে গরু চরতো, এখন আবার নৌকো ভাসছে। ডুব দিচ্ছে মাছরাঙা পাখি। পাড়ে বসে আছে বক। সব দৃশ্যটাই অন্যরকম।

আমার কলেজ খুলে যাবে, তাই আর বেশিদিন থাকা গেল না। এখন ওখানে ছবি আঁকার অনেক নতুন বিষয় এসে গেছে।

ফিরে আসার পর নদীটার কথা শুনে সবচেয়ে বেশি খুশি হলেন বড়মামা। তিনি বললেন, তা হলে ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি না করলেও হয়। শেষ জীবনে ওখানেই গিয়ে থাকবো।

বাঘের বাচ্চার কথাটা অবশ্য বাড়ির কেউই বিশ্বাস করলো না। সকলেরই ধারণা, ওটা আমার বানানো গল্প।

আসল দুটো চমক কিন্তু এর পরেও বাকি ছিল।

আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি নিয়ে একটা প্রদর্শনী হবে, তা আগেই ঠিক ছিল। প্রত্যেকের একটা করে ছবি। বড় বড় শিল্পীরা এসে দেখে বিচার করবেন, কোন ছবিতে কী দোষ আছে বা গুণ আছে।

আমি ঠিক করলাম, আমার ওই বাঘের ছবিটাই দেব। রংটা ঠিক করতে হবে, আর ভালো করে ফ্রেমে বাঁধাতে হবে।

অতীশ কী ছবি দিচ্ছে, জানবার জন্য গেলাম ওর বাড়িতে।

অতীশের নিজস্ব কোনো আঁকার জায়গা নেই, দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকে সাতজন। ছাদে ওঠার সিঁড়িতে ও আঁকার জিনিসপত্র রাখে, ওখানেই বসে কাজ করে।

একবার বৃষ্টিতে ওর অনেক ছবি ভিজে গিয়েছিল।

অতীশ তিন-চারখানা ছবি বেছে রেখেছে। সবই মানুষের ছবি। তার মধ্যে থেকে একটা ছবি তুলে ধরে বললো, ভাবছি, এটাই দেব।

ছবিটা দেখে আমার চোখ দুটো গোল হয়ে গেল।

এ তো সেই মধুপুরের মুসাফির, যে বাঘের বাচ্চা পোষে! অবিকল সেই চেহারা, সেই পোশাক, কাঁধে ঝুলছে কয়েকটা থলে, এমনকি চোখে ডাঁটিভাঙা চশমা।

আমি জিগ্যেস করলাম, এই লোকটির সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

অতীশ একটু অবাক হয়ে বললো, কোথা মানে? কোনো জায়গাতেই দেখা হয়নি। মন থেকে এঁকেছি।

আমি বললাম, একদম মন থেকে? এরকম একটা অদ্ভুত চেহারার লোকের চেহারা তোর মনে এলো কী করে?

অতীশ বললো, আমি ভাবলুম, ঠিক সাধুও নয়, সাধারণ পথিকও নয়, এমন একজনকে আঁকবো, যে শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, এই থলেগুলোর মধ্যেই যার পুরো সংসার।

আমি জিগ্যেস করলাম, অতীশ, তুই চশমা পরা মুসাফিরও দেখিসনি কখনো?

অতীশ হেসে বললো, না, দেখিনি। চশমাটা আগে ছিলও না। আজই সকালে ফাইনাল টাচ দেবার সময় কী খেয়াল হল, চশমাটা বসিয়ে দিলাম।

অতীশ কি মিথ্যে কথা বলছে? একবারও না দেখলে হুবহু একরকম একটা মানুষ আঁকা কী করে সম্ভব?

শুধু শুধু মিথ্যে কথাই বা বলবে কেন? ওর স্বভাব সেরকম নয়। বরং মুখের ওপর অনেক সত্যি কথা বলে দেবার সাহস ওর আছে।

এখন যদি আমি বলি, ওই ছবির মানুষটিকে আমি জলজ্যান্ত দেখেছি, তা কি অতীশ বিশ্বাস করবে?

বলা হল না।

অতীশই বললো, চল, সঙঘমিত্রার বাড়িতে যাই। ও দেরাদুন থেকে আজই ফিরেছে। ওর বাড়িতে গেলে সিঙ্গাড়া-সন্দেশ সাঁটানো যাবে, আর ওর নতুন ছবিও দেখা হবে।

সঙঘমিত্রারা বেশ বড় বাড়িতে থাকে। ওর বাবা ওকে আঁকার জন্য দোতলায় একটা স্টুডিও বানিয়ে দিয়েছেন। সেই ছবির ঘরেই সে রাত্তিরে ঘুমোয়।

সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অতীশ বললো, কী রে সঙঘমিত্রা, বাইরে বসে কী সব ছবি-টবি আঁকলি দেখাবি না? আমরা তাই দেখতে এলাম।

সঙঘমিত্রা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, চায়ের সময় হয়ে গেছে, তাই না? চা খেতে এসেছিল, না ছবি দেখতে?

আমি বললাম, চা তো খাবোই। শুধু চা নয়। আর কী খাওয়াবি?

সঙ্ঘমিত্রা বললো, আগে কিছুই খাওয়াবো না। যদি ছবি দেখতে চাস, আগে দেখতে হবে। খাওয়ার পর ছবি দেখার মুড থাকে না।

অতীশ বললো, তা হলে আজ ভালোই খাওয়া হবে মনে হচ্ছে। দেখি, আগেই ছবি দেখি।

সঙ্ঘমিত্রা পাঁচখানা ছবি দেখালো। সবই ক্যানভাসে তেল রঙে আঁকা। চারখানা ছবিই পাহাড়ের। আর পাঁচ নং ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ধরে বললো, এটাই এবার একজিবিশানে দেব ভাবছি। এটাই আমার বেশি পছন্দ।

সে ছবিটার তলায় নাম লেখা, বার্থ অফ আ রিভার। একটি নদীর জন্ম।

আমি নিঃশব্দে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দূরে অস্পষ্ট পাহাড়ের রেখা, সামনের দিকে একটা ছোট নদী। ক্যানভাসের অর্ধেকটায় সে নদী জলে ভরা, অর্ধেকটা শুকনো। শুকনো দিকটায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাঁজাচ্ছে।

অতীশ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললো, হ্যাঁ, বেশ ভালো হয়েছে। অর্ধেকটা জল বলে মনে হচ্ছে, নদীটা যেন একটু বাদেই ভরে যাবে। বেশ গতি আছে। বাঁশি বাজাচ্ছে, এই ছেলেটা কে রে? কেষ্ট ঠাকুর নাকি?

সঙ্ঘমিত্রা বললো, যাঃ, দেখছিস না, হাফপ্যান্ট পরা। শ্রীকৃষ্ণ কখনো হাফপ্যান্ট পরে নাকি? যাতে ভুল না হয়, তাই হাফপ্যান্ট পরিয়েছি।

অতীশ বললো, ওর মাথায় একটা গামছা বেঁধে দিলে পারিস।

সঙ্ঘমিত্রা আমাকে জিগ্যেস করলো, কী রে, নীলু, তুই কিছু বলছিস না যে!

আমি বললাম, খুবই ভালো হয়েছে। তবে এই নদীটা আমি চিনি। এর নাম মধুবংশী। মধু নামে একজন লোক এই নদীর ধারে বসে একসময় বাঁশি বাজাতো।

সঙ্ঘমিত্রা জিগ্যেস করলো, এই নদীটা তুই চিনিস? কোথায় দেখেছিস?

আমি বললাম, মধুপুরে।

সঙ্ঘমিত্রা একটু অবাক হয়ে বললো, তোর সেই মামার বাড়ির কাছে? সেখানে তো আমার যাওয়াই হল না এ পর্যন্ত। সে নদী তো আমি দেখিনি।

আমি বললাম, না গিয়েও অনেক কিছু দেখা যায়। এই নদীটা তুই কবে এঁকেছিস রে? ঠিক কত তারিখ?

সঙ্ঘমিত্রা হিসেব করে বললো, জুন মাসের দু'তারিখে।

আমার মনে পড়লো, মধুপুরের সেই নদীতে জল আসতে শুরু করে তিন তারিখ সকালে। নদীটা প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠার আগেই সঙ্ঘমিত্রা ওকে এঁকেছে। শিমুল গাছটা পর্যন্ত রয়েছে ঠিক জায়গায়।

সেবারে আমাদের প্রদর্শনীতে পাশাপাশি ছবি ছিল তিনটে। একটা বাঘ, একজন অদ্ভুত মুসাফির আর একটি নদীর পুনর্জীবন। এই তিনটে ছবির পেছনে যে কী রহস্য আছে, তা অন্য কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না।

প্রদর্শনীর অন্য ছবিগুলোর পেছনেও এরকম রহস্য আছে কি না, তা তো আমিও জানি না!

সোনামুখির হাতি ও রাজকুমার

সোনামুখিতে খুব সকাল সকাল বাজার বসে। ভোর হতে না হতে কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়। এ তো আর কলকাতা শহর নয়। এখানে বেশিরভাগ মানুষই ঘুমিয়ে পড়ে রাত্তির আটটা-নটার সময়, আর ঘুম ভাঙে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

তপু রোজ তার বাবার সঙ্গে বাজারে যায়।

বাবা বলেন, আমি আমার বাবার সঙ্গে থেকে থেকে বাজার করা শিখেছি। তুইও সেরকম শিখবি। লেখা-পড়া শেখার মতন বাজার করাও শিখতে হয়। কোন জিনিসটা খারাপ আর কোন জিনিসটা ভালো, তা চেনা মোটেই সহজ নয়। কত লোক বোকার মতন পচা মাছ কিনে নিয়ে যায়।

তপুদের বাড়ি থেকে বাজার বেশ খানিকটা দূর। কিন্তু বাবা সাইকেল রিকশায় যেতে চান না। ভোরবেলা খানিকটা হাঁটা তো ভালোই।

বাবা রোজ ডেকে তোলেন তপুকে। চোখ-মুখ ধুয়ে চটপট তৈরি হয়ে নিতে হয়, দুটো প্লাস্টিকের ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। একটা মাছের জন্য, আর একটা তরকারির।

তপুদের বাড়িতে কাকা-জ্যাঠাদের মিলিয়ে অনেক লোক। বাবা ইচ্ছে করে বাজার করার ভার নিজে নিয়েছেন। তপু তাঁর একমাত্র ছেলে, তপু সবে মাত্র আট বছরে পা দিয়েছে। সে ইংরেজিতে টাইগার আর লায়ন বানান করতে পারে। কিন্তু এলিফ্যান্ট বানান ভুল হয়ে যায়।

বাবার সঙ্গে ভোরবেলা বেরিয়ে পড়তে তপুর বেশ ভালোই লাগে। এই সময়টায় রাস্তায় নানা রকম সুন্দর গন্ধ থাকে, একটু বেলা হলে সে গন্ধ পাওয়া যায় না। ভোরবেলাই তো বেশিরভাগ ফুল ফোটে।

অনেক পাখিও ডাকে এই সময়। সব পাখিই প্রথম সূর্যের আলো দেখে খানিকটা গলা সেধে নেয়। দুপুরের দিকে সেই সব পাখিদের আর দেখতেই পাওয়া যায় না। শুধু কাক আর শালিক ছাড়া।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা তপুকে অনেক গাছ আর পাখি চিনিয়ে দেন। এদিকে অনেক কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে, আর কয়েকটা রাধাচূড়া। কৃষ্ণচূড়ার ফুল লালচে আর রাধাচূড়ার হলুদ। তপু লক্ষ করেছে, গোলাপি, নীল, বেগুনি, সবুজ সব রঙেরই ফুল হয়, কিন্তু কালো রঙের ফুল দেখতে পাওয়া যায় না।

বাবাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, কালো রঙের ফুল হয় না কেন?

বাবা বলেছিলেন, সব ফুলই দেখতে সুন্দর হয়। কালো রঙের ফুল কি ভালো দেখাবে? কালো রঙের ফুল হলে ভ্রমর, প্রজাপতি, পাখিরা সে ফুলের কাছে আসবে না।

পাখিদের মধ্যে কুচকুচে কালো হচ্ছে কাক। তাদের কেউ পছন্দ করে না। অবশ্য কোকিল আর দোয়েল পাখিও কালো, কিন্তু তাদের ডাক এত মিষ্টি যে সবাই পছন্দ করে।

বাজারের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তপু এখন অনেক কিছু শিখে গেছে।

বুড়ো পটল ভালো না, কচি পটল ভালো। যে বেগুন টিপলে মনে হয় শক্ত, তার মধ্যে অনেক বিচি থাকে, সে বেগুন কিনতে নেই। নরম বেগুনই খুব সুস্বাদু। কই মাছ, মাগুর মাছ কক্ষনও মরা কিনতে নেই। ইলিশ মাছের পেটটা চ্যাপ্টা কিনা দেখে নিতে হয়। লম্বা ধরনের ইলিশ ভালো হয় না।

বাজারের অনেক লোক বাবাকে চেনে। এখন তপুকেও চিনে গেছে।

দোকানদাররা বাবাকে পছন্দ করে, কারণ তিনি কক্ষনও কোনো জিনিসের দরদাম করেন না। চেনা দোকানের সামনে গিয়ে বলেন, দাও, ভালো জিনিস তুমি বেছে দাও।

একদিন একজন দোকানদার দশটা আমের মধ্যে দুটো পচা আম গছিয়ে দিচ্ছিল। আমগুলো ঝুড়িতে নেবার পর বাবা হেসে বললেন, শোনো, আমায় হাত দিয়ে দেখতে হয় না, শুধু দেখেই আমি বুঝতে পারি, কোনটা ভালো আর কোনটা পচা। আজ দুটো খারাপ আম দিয়েছ তো! দাও! কাল থেকে তোমার দোকানে আর আসব না।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পেয়ে বলেছিল, আমায় মাপ করবেন বাবু! আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ঝুড়ি থেকে পচা আম দুটো বার করে সে তার বদলে চারটে ভালো আম দিতে চাইল।

বাবা বললেন, না। আমি ভালো জিনিস চেয়েছি। তা বলে বেশি নেব কেন? তুমিও ঠকবে না, আমিও ঠকব না, এইটাই তো ভালো।

লোকটি তখন বলল, এই খোকাকে আমি দুটো আম দিতে চাই, তা আপনি কিছুতেই বারণ করতে পারবেন না।

বাবা বললেন, কেন, ওকেই বা এমনি এমনি দেবে কেন? আমি তো আম কিনেছি।

লোকটি বলল, বাবু, আমরা কি শুধু কেনাবেচা করি? ভালোবেসে কারুকে কিছু দিতে পারি না? এই খোকাটি ভারি সুন্দর।

লোকটি দুটি আম জোর করে তুলে দিল তপুর হাতে।

তপু তাকাল বাবার দিকে।

বাবা বললেন, ঠিক আছে নাও। কেউ ভালোবেসে দিলে না বলতে নেই।

দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কটি ছেলে-মেয়ে?

সে বলল, তিনটি।

পরদিন বাবা আগেই তিনখানা চকোলেট কিনে নিয়ে সেই আমওয়ালাকে বললেন, এগুলো তোমার ছেলেমেয়েদের দিও।

বাজারের মধ্যে কোনো দোকানে একটা কিছু ঘটে গেলেই সবাই তা জেনে যায়।

সেই থেকে কোনো দোকানদার বাবাকে খারাপ জিনিস দেয় না। বেশি দাম নেয় না। অনেকেই কিছু কিছু জিনিস তপুকে ফাউ দেয়। যেমন সবেদা, পেয়ারা, আতা। একদিন একটা মাছওয়ালা একটা ছোট ইলিশ মাছ দিয়ে বলল, এটা খোকাবাবুর জন্য। এর কোনো দাম লাগবে না।

বাবা সেটা কিছুতেই নিতে চাইলেন না। ইলিশ মাছ বেশি দামি। ছোট মাছটারও দাম কম নয়।

মাছওয়ালা বলল, আমার খুব ইচ্ছে করছে খোকা মহারাজকে দিতে। আমার নিজের কোনো ছেলে-মেয়ে নেই স্যার। ওকে দেখলেই আমার ভালো লাগে।

সোনামুখির বাজারে কখনও তেমন ঝগড়া-মারামারি হয় না। বেশ শান্ত জায়গা। হঠাৎ একদিন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল।

তপুকে নিয়ে বাবা ঘুরে ঘুরে বাজার করছেন, কেনাকাটি প্রায় শেষ, এমন সময় বাজারের গেটের কাছে একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল।

এমনি হৈ হৈ নয়, ভয়ের চ্যাঁচামেচি।

তারপর অনেক লোক হুড়মুড় করে ছোটাছুটি করতে লাগল এদিক-সেদিক।

কয়েকজন লোক চিৎকার করে উঠল, হাতি! হাতি! পালাও, পালাও!

বাবা তপুর হাত ধরতে গেলেন, তার আগেই ছুটন্ত লোকের ধাক্কায় ছিটকে গেলেন একদিকে। তপু অন্যদিকে।

এবার দেখা গেল, সত্যিই একটা প্রকাণ্ড হাতি মাথা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত গতিতে। আর শুঁড় দিয়ে দু'দিকের দোকানের জিনিসপত্র ভাঙছে।

এই বাজারে অনেক মাটির জিনিস বিক্রি হয়। মাটির হাঁড়ি, গেলাস, আর নানা রকম পুতুল। বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া যেমন বিখ্যাত, তেমনি সোনামুখির মাটির হাতিও কম বিখ্যাত নয়। লোকেরা মন্দিরে পুজো করতে গিয়ে এই মাটির হাতি সাজিয়ে রাখে।

এই হাতিটা যেন বেছে বেছে হাতিপুতুলই বেশি ভাঙছে পা দিয়ে। অত টুকু টুকু হাতি বানানো হয়েছে বলে কি সে রেগে গেছে?

বিহারের দলমা পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে হাতির পাল নেমে আসে বাঁকুড়া জেলায়। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের ঘর-বাড়ি ভাঙে, খেতের ফসল খেয়ে নেয়, নষ্ট করে।

ক'দিন ধরে এইরকম হাতির পালের কথা শোনা যাচ্ছিল বটে।

কিন্তু একেবারে শহরের মধ্যে কোনো হাতির ঢুকে পড়া, এই প্রথম।

বাজারের মধ্যে কিছু মহিলা এবং শিশুও আছে। সকলের ভয়-পাওয়া চিৎকারে যেন আরও খেপে যাচ্ছে হাতিটা। হঠাৎ হঠাৎ থমকে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

একজন বুড়িকে শুঁড় দিয়ে শূন্যে তুলে একটা আছাড় মারল।

বুড়িটির ভাগ্য ভালো, সে একটা দোকানের ত্রিপলের ওপর গিয়ে পড়ল, তাই হাড়-গোড় ভাঙল না।

হাতিটার মুখের দু'পাশে লম্বা দাঁত। তার সঙ্গে আর কোনো হাতি নেই। একলা-হাতি অতি বিপজ্জনক।

বাজারের মেঝেতে বসা দোকানদাররা সবাই পালাবার চেষ্টা করছে। যে-কটা পাকা দোকানঘর আছে, তার মধ্যে কিছু লোক ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ভেতরে আর জায়গা নেই। কিছু লোক তবু দুমদাম করে ধাক্কা মারছে দরজায়।

দোকানগুলোর বারান্দাতেও প্রচুর লোক। তারাও ঠেলাঠেলি করছে আর চ্যাঁচাচ্ছে। তপু চলে এসেছে একদিকে, বাবা অন্যদিকে।

তপু ডাকল, বাবা—!

বাবা চিৎকার করে বললেন, তপু, তপু, ওদিকেই থাক। রাস্তায় নামিস না!

হাতিটা ইচ্ছে করলে বাঁধাকপি, কুমড়ো, শাকসব্জি খেতে পারে। কিন্তু খাওয়ার দিকে তার মন নেই। সে শুধু ভাঙছে আর সব কিছু নষ্ট করছে।

সব বাজারেই কিছু কুকুর ঘুরে বেড়ায়। সব কটা কুকুর দূরে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করছে, হাতিটা এক এক পা এগোতেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

একটা শুধু গ্যাট্টাগোঁট্টা সাহসী কুকুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে গেল। ওটা চায়ের দোকানদার প্রাণকেষ্টর পোষা কুকুর, ওর নাম ভোলা। ভিড়ের আড়াল থেকে প্রাণকেষ্ট চেঁচিয়ে বলল, ভোলা, ভোলা, যাসনি।

ভোলা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

হাতিটা ঠিক ফুটবল খেলার মতন এক পায়ে একটা শট মারলো ভোলাকে। ভোলা উড়ে গিয়ে মন্দিরের পাশের আমগাছটার ডালের ওপর গিয়ে পড়ল। সেখানেই আটকে গিয়ে আর্ত চিৎকার করতে লাগল প্রাণপণে।

তপু যে দোকানটার বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, সেটা একেবারে মানুষে ভর্তি, একটা মাছি ওড়ারও জায়গা নেই।

হাতিটা একটা সবজির দোকান তছনছ করছে দেখে আরও কিছু লোক দৌড়ে এই বারান্দাটায় ওঠবার চেষ্টা করল। সেই ঠ্যালাঠেলিতে কয়েকজন বারান্দা থেকে পড়ে গেল পথের ওপর। কয়েকজন একেবারে চিৎপটাং। তাদের মধ্যে তপুও!

যেদিকে গোলমাল হচ্ছে, হাতিটা সেদিকেই ফিরছে। এরা ভয়ের চোটে

কান্নাকাটি করতেই হাতিটা এদিকে ঘুরে তাকাল। মাথাটা দু'বার নেড়ে ছুটে এল এদিকে।

তার পায়ের চাপে দু'জন লোকের হাত ভেঙে গেল। তার পর হাতিটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে তপুকেই তুলে নিল শূন্যে।

তারপর আবার অন্যদিকে ফিরল।

এবার সে তপুকে আছাড় মারবে।

তা কিন্তু মারল না তক্ষুনি। যেতে লাগল বাজারের বাইরের দিকে। হয়তো সে তপুকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজছে।

ওই দৃশ্য দেখে বাবা পাগলের মতন কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আমার ছেলে! আমার ছেলে!

তিনি ভিড় ঠেলে হাতিটার দিকে দৌড়ে আসতে চাইলেন। ছেলেকে উদ্ধার করতেই হবে।

কয়েকজন লোক বাবাকে চেপে ধরে বলল, মাস্টারমশাই, করছেন কী! আপনি গেলে, আপনাকেও মারবে! হাতিরা ছোট ছেলেদের মারে না!

বাবা তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

হাতির শুঁড়ে জড়ানো অবস্থায় তপু ভয় পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু মরে যাবার ব্যাপারটা সে ঠিক জানে না। এই অবস্থাতে তার মনে একটা অদ্ভুত চিন্তা এল।

দু'দিন আগে তাদের স্কুলে সে এলিফ্যান্ট বানান ভুল করেছে বলেই কি হাতিটা রেগে গেছে?

সে মনে মনে বলতে লাগল, ই এল ই পি এইচ এ এন টি! ই এল ই পি এইচ এ এন টি! এটা কি ঠিক না ভুল? তারপরই সে মনের চোখে দেখতে পেল, স্কুলের ইংরেজির স্যার গৌতমবাবু ব্ল্যাক বোর্ডে ওই বানানটাই লিখে দিচ্ছেন।

এবার সে হাতিটার চোখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলে উঠল, ই এল ই পি এইচ এ এন টি!

ঠিক তখনই আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

তপুর ইংরেজি বানান শুনে হাতিটা একটুও গ্রাহ্য করল না। তপুকে শুঁড়ে জড়িয়ে রেখে এগোতে লাগল দুলকি চালে।

খুব কাছেই শোনা গেল কপাকপ ঘোড়ার খুরের শব্দ।

বাজারের সামনের রাস্তাটা একটু দূরেই ঘুরে গেছে ডান দিকে। সেই বাঁক থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া, তার পিঠে একজন সওয়ার। ঘোড়াটা খুব জোরেই ছুটে আসছে।

বাজারের লোকেরা আশা করছিল, যদি এর মধ্যে পুলিশ এসে পড়ে। কিন্তু পুলিশ তো আসল ঘটনার সময় দেরি করে প্রত্যেকবার।

এখন কে আসছে? পুলিশ তো ঘোড়ায় চেপে আসে না।

আর একটু কাছে আসতে দেখা গেল, ঘোড়ার পিঠে যে বসে আছে, তার সারা গায়ে জড়ির পোশাক, মাথায় একটা মুকুট, তাতে পালক বসানো। ঠিক যেন রূপকথার এক রাজকুমার!

আজকাল তো এই রকম রাজকুমার আর নেই। এ যেন ঠিক উঠে এসেছে ছবির বই থেকে।

হাতিটার খুব কাছে এসে পড়তেই রাজকুমার ঘোড়াটার রাশ টানলেন। ঘোড়াটা চি হিঁ হিঁ হিঁ করে দু' পা তুলে উঠে দাঁড়াল।

শুঁড় জড়ানো অবস্থাতেই শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে তপু ভাবল, হাতি আর ঘোড়ায় লড়াই হলে কে জিতবে?

অশ্বারোহী রাজকুমার কোমর থেকে টেনে বার করলেন তলোয়ার।

সেই তলোয়ার উঁচিয়ে রাজকুমার গম্ভীরভাবে বললেন, এই গনশা, ছেলেটাকে নামিয়ে দে! নইলে তুই আর জঙ্গলে ফিরতে পারবি না। এখানেই তোর কবর হবে।

এই প্রথম হাতিটা একবার ডেকে উঠল, তার উত্তরে ঘোড়াটাও একবার ডাকল।

তপু মনে মনে বলল, ঘোড়ার ডাককে বলে হ্রেষা, আর হাতির ডাককে বলে বৃংহিত।

এ সবই সে নতুন শিখেছে।

কিন্তু রাজকুমার জানলেন কী করে যে হাতিটার নাম গনশা?

রাজকুমার বললেন, ঠিক দশ গুনবো আমি। তার মধ্যে যদি তুই ছেলেটাকে নামিয়ে না দিস, তাহলে শেষ করে দেব তোকে। এক, দুই, তিন, চার...

সাত গোনার পরই হাতিটা বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। খুব আলতো করে নামিয়ে দিল তপুকে।

বাবা তখনও কেঁদে কেঁদে চিৎকার করছেন, তপু! তপু!

তপু ছুটে গেল সেদিকে।

রাজকুমার তলোয়ার দুলিয়ে বললেন, গনশা, যা! এবার চলে যা!

হাতিটা দৌড়োতে শুরু করল।

ঠিক তখনই রাজকুমার পড়ে গেলেন ঘোড়া থেকে। একেবারে অজ্ঞান।

এবারে হৈ হৈ করে ছুটে এল এনেকে। হাতির ভয় আর নেই, এখন উপকারি বন্ধুকে সেবা করা দরকার।

কেউ বলল, ওরে জল নিয়ে আয় রে!

কেউ বলল, পাখা আন, বাতাস কর!

রাজকুমারের মাথার মুকুটটা খুলে পড়ে গেছে। তার মুখে জলের ছিটে দিতেই গোঁফটাও খসে গেল। মুখে দেখা গেল কালো ছিট ছিট। আগে তাকে মনে হয়েছিল

খুব ফরসা, আসলে অনেক পাউডার মেখেছিল, ওর মুখের রং কালো।

একটু বাদে রাজকুমার চোখ মেলল।

তারপরই ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, হাতিটা? হাতিটা কোথায়? ওরে বাবারে, কত বড় হাতি!

তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ!

একজন লোক বলল, রাজকুমার, আপনার হুকুম শুনে হাতিটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। উঃ, কী যে কাণ্ড হচ্ছিল! ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়ে গিয়েছিল!

লোকটি বলল, রাজকুমার? হুঁঃ! রাজকুমারই বটে!

তপুর হাত ধরে বাবা এখানে এসে বললেন, রাজকুমার, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! আপনি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

সে এবার ঝুঁকে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আমায় চিনতে পারলেন না স্যার! আমি শিবু! আপনার কাছে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছি!

বাবা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, শিবু!

চায়ের দোকানদার প্রাণকৃষ্ণ বলল, শিবু! তাই তো? তুই রাজকুমার হলি কী করে?

শিবু এবার বলল, খানিক দূরে পায়রাডাঙায় সিনেমার শুটিং হচ্ছে, সেখানে আমি পার্ট করছি তো!

প্রাণকৃষ্ণ খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, তুই রাজকুমারের পার্ট করছিস?

শিবু হেসে বলল, না রে! আমায় কে রাজকুমারের পার্ট দেবে! এই চেহারায়! আমার দূতের পার্ট। ঘোড়া ছুটিয়ে এনে একটা চিঠি দেব। ব্যস, ওইটুকুই!

প্রাণকৃষ্ণ বলল, তা হলে যে তুই এদিকে আজ এলি, তোকে ঠিক রাজকুমারের মতনই দেখাচ্ছিল।

শিবু বলল, শোন, তবে বলি। শোনেন দাদা, সবাই শোনেন, মাস্টারমশাই, আপনিও শোনেন। এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। আমি ছোটবেলায় ঘোড়া চালাতে শিখেছিলাম, তাই ওইটুকু পার্ট পেয়েছি। কাল সন্ধ্যাকালেই আমার শুটিং শেষ হয়ে গেল। খুব খাওয়া দাওয়া হল রাত্তিরে। আমি ওখানেই শুয়ে রইলাম সকলের সঙ্গে।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, কেমন খাওয়া-দাওয়া হল রে শিবু?

অন্য একজন ধমক দিয়ে বলল, অ্যাই, চুপ! এখন খাওয়া-দাওয়ার কথা নয়, আসল গল্পটা শুনি।

শিবু বলল, জীবনে তো সিনেমায় পার্ট করা আমার প্রথম। তাই সারা রাত ঘুমই হল না। ভোরবেলা, সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন আমার মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি

চাপল। যে আসল রাজকুমার হবে, সে ঘোড়া চালাতেই জানে না। শুধু ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে কথা বলে। সে এখনো ঘুমোচ্ছে। আমি ভাবলাম, আমি তা হলে একবার রাজকুমার সেজে ঘুরে আসি না কেন? তাই গোঁফ লাগালাম, গালে পাউডার মাখলাম। জড়ির পোশাক আর মুকুট পরে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসলাম।

প্রাণকৃষ্ণ বলল, শিবু, তোকে তো আমি অনেক দিন চিনি। একটু-আধটু ঘোড়া চালাতে দেখেছি বটে, কিন্তু এত জোরে ঘোড়া চালাতে শিখলি কবে?

শিবু বলল, দাদা, সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার। রাজপুত্র সেজে ঘোড়াটার পিঠে ওঠার পর কেমন যেন মনে হল, আমি সত্যিই রাজপুত্র। ঘোড়াটা জোরে ছুটছে, আমার ইচ্ছে হল, আরও জোরে ছুটুক! কোমরে তলোয়ার, আমার মনে হল, সামনে শত্রু এলে তাকে কচুকাটা করব। হাতিটার সামনে যখন এলাম, তখন একটুও ভয় পেলাম না। তখন তো আমি সত্যি রাজপুত্র। মনে হল, এরকম অনেক পাগলা হাতির আমি শুঁড় কেটে দিয়েছি তলোয়ারের কোপে।

শিবু হঠাৎ থেমে গেল।

অনেক লোক একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, তারপর? তারপর?

শিবু বলল, হঠাৎ এক সময় আমার ঘোর কেটে গেল। বুঝতে পারলুম, আসলে তো আমি রাজকুমার নই। তলোয়ার চালাতেও জানি না। তা ছাড়া, এটা টিনের তলোয়ার। সামনে এতবড় হাতি। এবার বুঝি নির্ঘাৎ আমার প্রাণ যাবে! তাই তো পড়ে গেলাম অজ্ঞান হয়ে!

এতক্ষণ যারা হাতির ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল, এবার তারা হেসে উঠল হো-হো করে।

বাবা শিবুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভাগ্যিস, তোমার মধ্যে আসল এক রাজকুমার ভর করেছিল, তাই তো আজ আমার ছেলেটা বেঁচে গেল।

আবার বাজারে শুরু হয়ে গেল কেনাবেচা।

বাবার সঙ্গে তপু ফিরতে লাগল বাড়ির দিকে। একটু বাদে সে জিজ্ঞেস করল, বাবা, হাতির ইংরেজি এলিফ্যান্ট, তাই না? ই এল ই পি এইচ এ এন টি?

বাবা বললেন, অ্যাঁ? এতদিন তোর বানানটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না। আজ ভয় পেয়ে ঠিক হয়ে গেল?

তপু গম্ভীর ভাবে বলল, আমি মোটেই ভয় পাইনি।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুই রাইনোসেরাস বানান জানিস? তপু চুপ করে রইল।

বাবা বললেন, দাঁড়া, এবার তোর সামনে একদিন একটা রাইনোসেরাস ছেড়ে দিতে হবে। তাহলেই তুই বানানটা শিখে যাবি। রাইনোসেরাস মানে গণ্ডার। তপু বলল, বাবা, আমি চকোলেট বানানও জানি না। চকলেট, না চকোলেট?

একটা ছাতা আর একটা কলম

বাবার কাছে দু'জন লোক এসেছিলেন কীসব কাজের কথাটথা বলতে। সকালবেলায় বাবা খুব ব্যস্ত থাকেন, অফিসে যাওয়ার আগেও টেলিফোনে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়। বাবার হেড অফিস সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকেও টেলিফোন আসে।

দশ মিনিট বাদে সেই লোক দুটি চলে গেলেন। তারপরেই এল জরুরি টেলিফোন। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যাওয়ার সময় মা হঠাৎ বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একী, এটা কার ছাতা?'

বাড়িতে আর দুটি মাত্র প্রাণী। সোনালি আর মেঘ, দুই ভাইবোন। সোনালিই বড়, তার বয়স বারো আর মেঘ তার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট।

দু'জন এক টেবিলে বসে পড়াশোনা করে আর ঝগড়া করে মাঝে-মাঝে।

রান্নার মাসি ছুটি নিয়েছেন তিনদিন।

মা দ্বিতীয়বার বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছাতাটা কার?"

বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি তা কী করে জানব?"

তারপরই টেলিফোনের ওপাশের মানুষটিকে বললেন, "ওয়ান মিনিট প্লিজ।"

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে মাকে বললেন, "নিশ্চয়ই ওই ভদ্রলোক দু'জন ফেলে গেছেন। ডাকো, ডাকো, এখনও সিঁড়িতে...পৌঁছে দাও।"

কে পৌঁছে দেবে? লোক দুটি তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন, দৌড়ে গেলে ধরা যায়।

কে যাবে?

সোনালি প্রত্যেক বছর স্কুলের স্পোর্টসের সময় অনেক প্রাইজ পায়। লং জাম্পে প্রথম হয়েছে পর পর তিনবার। সেই তুলনায় মেঘ খেলাধুলোয় অত ভালো নয়। ছবি আঁকার দিকে তার ঝোঁক।

কিন্তু মেয়েদের যখন-তখন বাইরে পাঠানো হয় না। এইসব কাজে ছেলেদেরই যেতে হয়।

মা বললেন, "মেঘ, ছাতাটা দিয়ে আয় না।"

মেঘ অনিচ্ছার ভাব নিয়ে পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠল। দরজার কাছে এসে বলল, "আমার চটি কোথায়?"

চটিজোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশি দেরি হলে লোক দুটিকে আর ধরা যাবে না। মা আবার তাড়া দিতেই তাকে খালি পায়েই যেতে হল।

লোক দুটি সিঁড়িতে নেই, এতক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

ছাতাটা হাতে নিয়ে মেঘ থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় অনেক লোক। বাবার কাছে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের তো মেঘ ভালো করে দেখেইনি। এখন চিনবে কী করে?

ছাতাটা ফেরত নিয়ে গেলে নির্ঘাত বকুনি খেতে হবে বাবার কাছে। আর দিদি হাসবে।

একটু দূরে দু'জন লোক পাশাপাশি যাচ্ছে গল্প করতে করতে। ওরা কি হতে পারে?

মেঘ ছুটে গিয়ে পিছন থেকে বলল, "এই যে, শুনছেন? আপনারা ছাতা ফেলে এসেছেন?"

লোক দুটি ঘুরে দাঁড়াল।

একজন মেঘের হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে দেখল ভালো করে। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

অন্য লোকটি শুধু বলল, "বেশ।"

তারপর দু'জনে চলে গেল রাস্তা পেরিয়ে।

মেঘ তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার একটু খটকা লেগেছে।

ছাতা ফেরত পেয়ে লোক অবাক হয়, খুশি হয়। কিংবা ফেলে আসার জন্য লজ্জা পায়। যে ফেরত দেয়, তাকে কিছু একটা বলে।

ওরা কিছুই বলল না। তবে কি এই ছাতাটা ওদের নয়? জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, ওরাই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না!

এখন আর ছাতাটা ফেরতও আনা যায় না। লোক দুটি অনেক দূরে চলে গেছে।

বৃষ্টির দিনে যারা ছাতা নিয়ে বেরোয়, তারা সবাই কখনো-না-কখনো ছাতা হারায়। ওই লোক দুটোরও হয়তো কখনও ছাতা হারিয়েছে, তাই এটা পেয়ে নিয়ে গেল!

যাই হোক, এখন আর কিছু করবার নেই।

উপরে উঠে এসে মেঘ দরজার বেল বাজাবার আগেই খুলে গেল দরজাটা।

মা ব্যস্তভাবে বললেন, "দিয়েছিস? তোকে আর-একবার যেতে হবে। ওরা একটা কলমও ফেলে গেছে।"

মায়ের হাতে একটা কলম। সাধারণ ডট পেন নয়, ফাউন্টেন পেন।

মেঘ বলল, "ওঁরা তো চলে গেছেন! এখন দেব কী করে?"

মা বললেন, "চলে গেছে? কত দূরে গেছে?"

মেঘকে এবার একটু বানিয়ে বলতেই হল যে, লোক দুটিকে ট্যাক্সিতে উঠে পড়তে দেখেছে সে।

বাবা এতক্ষণে টেলিফোনের কথা শেষ করে বললেন, "দেখি কলমটা।"

সেটা হাতে নিয়ে বললেন, "শস্তার জিনিস নয়, বেশ দামিই মনে হচ্ছে।"

মা বললেন, "লোক দুটো এত ট্যালা কেন? ছাতা ফেলে যায়, কলম ফেলে যায়। ওদের ঠিকানা কিংবা ফোন নাম্বার জানো?"

বাবা বললেন, "সেসব কিছুই জানি না। ওরা তো এসেছিল একটি কম্পিউটার কোম্পানি থেকে। আমার কিছু দরকার নেই, আমি ভালো করে ওদের কথাই শুনিনি।"

মা বললেন, "তা হলে কলমটা কী হবে?"

মেঘ বলল, "আমি নেব।"

বাবা বললেন, "তুই নিবি কী! যদি ওরা ফেরত নিতে আসে? এই কলমটা বসবার ঘরেই থাকুক।"

বসবার ঘরে যেখানে টেলিফোন থাকে, তার পাশে রেখে দেওয়া হল কলমটা। ওটার নাম হয়ে গেল, 'বাইরের লোকের কলম'।

দু'-তিনদিনের মধ্যে কলমটা নিতে কেউ এল না।

মাঝে-মাঝে এমন হয়, বাবাকে কোনো জরুরি ফোন নাম্বার লিখতে হবে, হাতের কাছে কোনো কলম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ওই বাইরের লোকের কলমটা দিয়েই লিখতে হয়।

প্রথমবারেই একটা বিপত্তি হল।

বাবা একটা বিদেশের টেলিফোন নাম্বার টুকে রাখলেন। তারপর অফিস থেকে ফোন করতে গিয়ে শুনলেন, রং নাম্বার!

নিজের হাতে টুকেছেন, তবু ভুল হল কী করে? আসল নাম্বারটা আর কিছুতেই পাওয়া গেল না।

দুপুরবেলা দরজায় বেল বাজল। মা দরজা খুলে দেখলেন, পোস্টম্যান এসেছেন, একটা রেজিস্ট্রি প্যাকেট দিতে। সই করে নিতে হবে।

পোস্টম্যানের কাছেই কলম থাকে, কিন্তু সেটা দিয়ে কিছুতেই লেখা পড়ছে না। তাড়াতাড়িতে মা বাইরের লোকের কলমটা দিয়েই সই করে নিলেন।

প্যাকেটটা শক্তভাবে সেলোটেপ দিয়ে মোড়া। মা একটা ছুরি দিয়ে সেটা খুলে ফেললেন।

ভেতরে একটা কৌটো, তার মধ্যে একটা টাকা। এ আবার কে পাঠাল? কৌটোটা সাধারণ টিনের, তার মধ্যে মাত্র একটা টাকা। এটা পাঠাবার কী মানে হয়?

তাড়াতাড়ি ছেঁড়া প্যাকেটটা তুলে নিয়ে মা দেখতে গেলেন প্রেরকের নাম। এ কে দাশগুপ্ত, দুর্গাপুর। এই নামে দুর্গাপুরের কেউ চেনা নেই। তারপর নিজের নাম দেখতে গিয়ে চমকে উঠলেন।

সুপর্ণা মুখার্জি ঠিকই আছে, কিন্তু ঠিকানাটা অন্য। হিন্দুস্থান রোড নয়, হিন্দুস্থান পার্ক। তার মানে ওই রাস্তায় আর-একজন সুপর্ণা মুখার্জি আছে।

পিওন ভুল করে দিয়েছেন। কাল ফেরত দিলেই হবে।

তারপরেই মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। প্যাকেটটা খুলে ফেলা হয়েছে। এখন যদি পিওন কিংবা ওই সুপর্ণা মুখার্জি বলে, মোটে এক টাকা নয়, ওর মধ্যে অনেক টাকা ছিল।

অন্য লোকরা শুনলেও সেই কথাই ভাববে। এক টাকা কেউ কখনও পাঠায়? তারা মাকে বলবে মিথ্যেবাদী কিংবা চোর!

বিকেলবেলা বাবাকে ভয়ে-ভয়ে ঘটনাটা জানাবার পর বাবাও প্রথমে অবাক হলেন। কৌটোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। সেটার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সেটার কোনো দামই নেই। শুধু এক টাকা!

তারপর বাবা বললেন, "এটা কোনো গোপন সঙ্কেত হতে পারে! চোরাকারবারিরা অনেক সময় এইভাবে খবর পাঠায়। তুমি ভালো করে দেখে নাওনি কেন?"

মা বললেন, "নামটা ঠিকই আছে। লোকে তো সেটাই দেখে। পিওনটা এত তাড়া দিতে লাগল। ওরই তো দোষ।"

বাবা বললেন, "ওর খানিকটা দোষ আছে বটে। কিন্তু দায়িত্বটা তোমার ওপরেই পড়বে।"

মা বললেন, "ওই কলমটাই অপয়া। পিওনের কাছে একটা বাজে কলম ছিল, সেটা দিয়ে লিখতে গিয়েই..."

বাবা বললেন, "কলম কখনও অপয়া হয়? নিজেরা সাবধান হলে..."

সোনালি বলল, "বাবা, কলমটা আমি নিয়ে নিই?"

মেঘ বলল, "আমি আগে চেয়েছি। কেউ তো নিতে আসেনি।"

বাবা সোনালিকেই বেশি ভালোবাসেন। তিনি মেঘকে বললেন, "তুই হারিয়ে ফেলবি। দিদিই এটা ব্যবহার করুক।"

পরদিন স্কুল থেকে ফিরে সোনালি বলল, "এই কলমটা সত্যি অপয়া। এটা আমার চাই না।"

মা বললেন, "কী হল?"

সোনালি বলল, "আজ আমার হিস্ট্রির ক্লাস টেস্ট ছিল। কত পেয়েছি জানো? জিরো। সব সাল-তারিখ ভুল। অথচ সব আমার মুখস্থ। কী করে ভুল হল? মা, তোমার পিওন এসেছিল আজ?"

মা বললেন, "না। উঃ, কী দুশ্চিন্তাই যে হচ্ছে। কী যে জবাব দেব!"

বাবা রাত্তিরবেলা ফিরে সোনালির পরীক্ষার কথা শুনে বললেন, "একবার যখন মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে, কলমটা অপয়া, তখন ওটা দিয়ে আর না লেখাই ভালো। মনই তো আসল।"

পরদিন সকালে শুরু হল ঝড় আর বৃষ্টি।

তারই মধ্যে একজন লোক এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

প্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরা, মাথায় বড় বড় চুল। বাবা প্রথমে লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

লোকটি বিনীতভাবে নমস্কার করে বলল, "স্যার, আমাকে বোধ হয় আপনার মনে নেই। কয়েকদিন আগে আমি একটা কম্পিউটার কোম্পানি থেকে এসেছিলাম।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু সেদিনই তো বলেছি, আমার এখন কিছু দরকার নেই। দু'মাস আগেই নতুন কিনেছি।"

লোকটি বললেন, "তা জানি। আজ আপনাকে আমি বিরক্ত করতে আসিনি। আসলে সেদিন আপনার এখানে আমি কি আমার ছাতাটা ফেলে গেছি? মানে ছাতাটা আমার নিজের নয়, আমার কাকার। হাতলটা আসল রুপোর।"

বাবা বললেন, "ছাতা? ছাতা আপনি ফেরত পাননি?"

লোকটি বলল, "না তো স্যার!"

বাবা বললেন, "সে কী! মেঘ, মেঘ, এদিকে আয় তো।"

পড়ার টেবিল থেকে উঠে এল মেঘ। লোকটির কথা শুনে তার মুখটা শুকিয়ে গেল। ছাতাটা যে নিয়েছে, সে অন্য লোক।

তাকে সত্যি কথাটা বলতেই হল।

বাবা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "ওর কোনো দোষ নেই। যেতে একটু দেরি হয়েছিল, ও তো আপনাকে চেনেও না। অন্য একজন যদি নিজের বলে নিয়ে নেয়, ও কী করবে? ঠিক আছে, আপনার ছাতাটার কত দাম হবে বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

লোকটি জিভ কেটে বলল, "না, না, স্যার। আপনি কেন দাম দেবেন? ছাতাটা ফেলে যাওয়া তো আমারই ভুল। অন্য কোথাও ফেলে যেতে পারতাম।"

বাবা বললেন, "তবু আপনার ক্ষতি তো হয়েছে। রুপো বাঁধানো ছাতা।"

লোকটি বলল, "না, স্যার, দাম আমি নিতে পারব না। আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।"

বাবা বললেন, "এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কী করে? আমার বাড়ি থেকে অন্য একটা ছাতা নিয়ে যান। রুপো বাঁধানো হবে না, তবে বৃষ্টি আটকানো যাবে।"

লোকটি তাও নিতে চায় না।

বাবা জোর করেই নিজের ছাতাটা ওকে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "ও, ভালো কথা, শুধু ছাতা কেন, আপনি তো একটা পেনও ফেলে গিয়েছিলেন। এই নিন।"

লোকটি বলল, "ও কলম তো আমার নয়।"

বাবা বললেন, "আপনার সঙ্গে তো আর-একজন লোক ছিল। নিশ্চয়ই তার। নিয়ে

যান, তাকে দিয়ে দেবেন।"

লোকটি বলল, "কলমটা আমার বন্ধুরও নয়। আমরা যখন এখানে এসেছিলাম, তখনই এই কলমটা সোফার উপর পড়ে থাকতে দেখেছি।"

বাবা বললেন, "তা হলে এটা আবার কার?"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি জোর করছেন তাই নিয়ে যাচ্ছি। কাল ফেরত দিয়ে যাব। আপনার ছাতা নেওয়াটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে।"

বাবা বললেন, "আপনার কলম লাগবে? এটা নিতে পারেন।"

লোকটি বলল, "না স্যার, আমার কলম লাগবে না।"

লোকটি নমস্কার করে চলে গেল।

বাবা বললেন, "ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে। আসল ছাতাটা তো অন্য লোক নিয়ে গেল, কলমটা তো নিল না।"

মা বললেন, "এ কলমটা তুমি বিদায় করো। এমনিতেই আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।"

বাবা বললেন, "কী করে বিদায় করব? একটা দামি কলম তো জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলা যায় না!"

মা বললেন, "কেন যাবে না? দাও, আমি ফেলে দিচ্ছি।"

বাবা বললেন, "যায়, রাস্তার কারও-না কারও গায়ে লাগবে। কোনো গরিব-টরিবের কাজে লাগবে। মেঘ, তুই বরং পাশের বস্তিটার সামনে ফেলে রেখে আয় চুপিচুপি। যে পাবে, সে পাবে, সে ব্যবহার করবে।"

কলমটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল মেঘ। অপয়া কলম! তার মনে হল যেন কলমটার মধ্যে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। কানের কাছে নিয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করল।

কলমটা নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছে করে ফেলে গেছে তাদের বাড়িতে। সবাইকে বিপদে ফেলার জন্য।

বস্তি পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কী? রাস্তায় যে-কোনো জায়গায় ফেলে গেলেই তো হয়। বৃষ্টি থেমে গেছে এর মধ্যে।

দুটি ছেলে হেঁটে যাচ্ছে পাশাপাশি। কলেজের ছেলেদের মতো বয়স। মেঘের একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল।

সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কি কলম হারিয়েছে? আমি একটা কলম পেয়েছি।"

একটি ছেলে বলল, "কই, দেখি, দেখি।"

অন্য ছেলেটি বলল, "আরে এই তো সেই কলমটা। তুমি কোথায় পেলে ভাই?"

মেঘ বলল, "আমাদের বাড়ির দরজার সামনে পড়ে ছিল।"

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, "কাল এখানে দাঁড়িয়ে একটা ঠিকানা লিখছিলাম, তখনই বোধ হয় অন্যমনষ্কভাবে..."

প্রথম ছেলেটি বলল, "বেশ দামি পেন!"

দ্বিতীয় ছেলেটি মেঘের পিঠ চাপড়ে বলল, "তুমি আমার খুব উপকার করলে ভাই। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এটা আমার মা আমাকে দিয়েছেন।"

বোঝাই গেল ওরা মিথ্যে কথা বলছে। কলমটা মেঘেদের বাড়িতে আছে তিন-চারদিন। ওরা বলল, "কাল ফেলে গেছে, তাও দরজার কাছে।"

এই অপয়া কলমে ওদের মিথ্যে কথা বলার দাম দিতে হবে। বুঝবে ঠ্যালা।

উপরে উঠে আসার পর মা বললেন, "আপদ দূর করে দিয়েছিস তো? উফ। আমার ধারণা পিওনটা আর আসবে না।"

সোনালি বলল, "পিওন ভদ্রলোক যে ঠিকানা ভুল করেছেন, তা বোধ হয় নিজেই জানেন না। তুমি আর ও নিয়ে চিন্তা কোরো না মা।"

বেজে উঠল দরজার বেল।

আবার কে এল, পোস্টম্যান নাকি!

মেঘ দরজা খুলে দিতেই দেখল, তার ছোটমামা। খুব ভালো ছাত্র। সবেমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

ঘরে ঢুকেই বললেন, "দিদি, আমাকে চায়ের সঙ্গে ওমলেট খাওয়াও। কেমন আছিস মেঘ? সোনালিটা ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হচ্ছে।"

তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, "তড়িৎদা, আপনার এখানে ক'দিন আগে একটা পেন ফেলে গেছি? ওটা আমার খুব পয়া কলম। ওই কলম দিয়ে লিখে এবারে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। এইখানেই কোথাও আছে। খুঁজে দেখুন তো।"

বিশ্বমামা ও নতুন বাজি

বিশ্বমামা বললেন, তারপর কী হলো জানিস? হেলিকপ্টার থেকে আমি তো লাফ মারলুম সমুদ্রে। পড়তে পড়তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো জয় মা! ঝপাং করে একটা শব্দও হলো। কিন্তু আমি ডুবলুম না!

আমি জিগ্যেস করলুম, সমুদ্র বুঝি সেখানে খুব গভীর নয়? আমাদের চাঁদিপুরের বিচের মতন?

বিশ্বমামা বললেন, না, না, ঐখানটায় সমুদ্র বেশ গভীর।

বিলুদা বললো, তুমি বুঝিরবারের পোশাক পরেছিলে? কিংবা বেলুন বেঁধে নিয়েছিলে?

বিশ্বমামা বললেন, ওসব করবো কেন? আমি তো ডুবতেই চেয়েছিলাম। ডোবাটাই দরকার। সেইজন্যই তো তীর থেকে না নেমে, হেলিকপ্টার থেকে ঝাঁপ দিয়েছি।

বিলুদা বললেন, তা হলে ডুবলে না কেন?

বিশ্বমামা এক গাল হেসে বললেন, সেইটাই তো প্রশ্ন। বল তো, কোন্ সমুদ্রে মানুষ ডোবে না? সাঁতার না জানলেও মানুষ ভেসে থাকে? তোদের পাঁচ মিনিট সময় দিলাম।

পাঁচ মিনিট লাগবে কেন? বিলুদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ও বুঝেছি। ডেড সি! ভুগোলে পড়েছি!

বিশ্বমামা একটু অবাক হয়ে বললেন, আরে! তোদের যতটা মুর্খ ভাবি, তা তো নয়।

আমি বললুম, বিশ্বমামা, এটা আমিও জানতুম। বিলুদা আগেই বলেছিল।

বিশ্বমামা বললেন, গুড! কেন মানুষ ডোবে না, তাও জানিস নিশ্চয়ই?

এবারেও বিলুদা তাড়াতাড়ি বলে দিল, ওই সমুদ্রের জলে নুন খুব বেশি!

এবার আমি বললুম, বিশ্বমামা তুমি কি আমাদের ভুগোলের ক্লাস নিচ্ছো? এখন গরমের ছুটি, এখন আমরা অত পড়াশুনোর কথা শুনতে চাই না। তোমার তো গল্প বলার কথা ছিল!

বিশ্বমামা বললেন, গল্পই তো বলতে যাচ্ছি। তার আগে জায়গাটা কোথায় তা বুঝে নিতে হবে না? এই ডেড সি পৃথিবীর ঠিক কোথায় তাও তোরা জানিস নিশ্চয়ই?

বিলুদা মাথা চুলকোতে লাগলেন। আমারও ঠিক মনে পড়লো না। পৃথিবীতে ছোট-বড় মিলিয়ে কত সমুদ্র। কোন্‌টা কোথায় তা কি মনে রাখা যায়?

উত্তর না দিয়ে বিলুদা ফস করে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এবার কোথায় যেন বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলে?

বিশ্বমামা বললেন, তাই শুনে ডেড সি কোথায় জেনে নিবি ভেবেছিস? যদি বলি, আমি গিয়েছিলাম জেরুজালেম শহরে?

বিলুদা বললো, তার কাছেই তো ডেড সি!

বিশ্বমামা বললেন, তেমন কাছে মোটেই না। ডেড সি আসলে জর্ডনের উপত্যকায়। সি কিংবা সমুদ্র না বলে ওটাকে একটা লেকও বলা যায়।

আমি বললুম, বিশ্বমামা, জেরুজালেমে আম পাওয়া যায়?

বিশ্বমামা বললেন, আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই আম পাওয়া যায়। হঠাৎ এটা জিজ্ঞেস করলি কেন রে?

আমি বললুম, তুমি তো খুব আম ভালোবাসো। এবারের পুরো গ্রীষ্মকালটাই তুমি রইলে বিদেশে। তাই ভাবছিলাম, এ বছর বোধহয় তোমার আম খাওয়াই হলো না।

বিশ্বমামা বললেন, তাও খেয়েছি। একটা-দুটো। জেরুজালেমে আম পাওয়া যায়, আমাদের দেশ থেকেই যায়। কিন্তু কী দাম! নিজেদের দেশের জিনিস অন্য দেশে গিয়ে অত বেশি দাম দিয়ে কিনতে কী ইচ্ছে করে? আমার বন্ধু রবার্ট ফ্রাই জীবনের কখনো আম চোখেই দেখেনি। তার জন্য প্রথমে একটা আম কিনলুম অনেক টাকা দিয়ে। আমাদের হিমসাগর আম খেয়ে সে এমন মুগ্ধ, বললো আহা, এ যে অমৃত! আর একটা খাবো। তাতেই খসে গেল অনেক পয়সা।

বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওই সমুদ্রের জলে ঝাঁপ মেরেছিলে কেন? সাঁতার জানো না বলে? পুরীর সমুদ্রে গিয়ে তুমি তো নামতেই ভয় পেয়েছিলে।

বিশ্বমামা বললেন, আরে না, না, ওসব নয়। রবার্টের সঙ্গে আমার খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপারে বাজি হয়েছিল।

বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, কত টাকার বাজি? তুমিই জিতেছিলে নিশ্চয়ই!

বিশ্বমামা বললেন, আরে আগে শুনবি তো, কী বিষয় নিয়ে বাজি, কোথায় সেটা ধরা হলো—, তারপর তো হার-জিতের কথা!

আমি বললুম, বিশ্বমামা তুমি এবার আমাদের কোন্‌ চাইনিজ হোটেলে খাওয়াচ্ছো?

বিশ্বমামা বললেন, খাওয়াবো। কিন্তু ভালো কোনো নতুন হোটেল হয়েছে।

বিলুদা আমাকে ধমক দিয়ে বললো, তুই চুপ কর তো নীলু। সব সময় শুধু খাই খাই। আগে গল্পটা শুনে নিই! বিশ্বমামা বলো তুমি ওই ভাজা সাহেবের সঙ্গে কী বাজি ধরেছিলে?

বিশ্বমামা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাজা সাহেব?

বিলুদা বললো, ওই যে তুমি বললে তার নাম ফারাই! মা আমাকে সব সময় বাংলা কথা বলতে বলেছে!

বিশ্বমামা বললেন, হুঁঃ! অনেক সাহেবের বেশ মজার পদবী হয়। একজনের নাম ড্রিংক ওয়াটার। আমিও একজনকে চিনি, তার পদবী সক্স, তার মানে মোজা। হ্যাঁ, বাজির কথা। তার আগে কিন্তু জানতে হবে, ডেড সি-কে কেন ডেড সি বলে?

বিলুদা এটাও জানে। সে বলে দিল। ওই সাগরের জলে তো নুন খুব বেশি, তাই কোনো কিছুই বাঁচে না। হাঙর, তিনি তো দূরের কথা মাছ-টাছ কিছু না।

বিশ্বমামা বললেন, অনেকটা ঠিক বলেছিস। সব সমুদ্রের জলই নোনতা। খাওয়া যায় না। সেই জন্যই কবি কোলারিজ সমুদ্রের বর্ণনায় লিখেছিলেন, ওয়াটার, ওয়াটার, এভরি হোয়ার, নট আ ড্রপ টু ড্রিংক! কিন্তু অন্য সমুদ্রের জলের চেয়েও ডেড সি'র জলে নুন অন্তত দু'গুণ বেশি। এমন কি বড় বড় নুনের চাঁই সে জলে ভাসতে দেখা যায়। অন্য সব সমুদ্রের তুলনায় ডেড সি-তেই নুন কেন এত বেশি তা বোঝাতে গেলে জ্ঞানের কথা এসে যাবে।

আমি বললুম, ক্রাশের কথা এখন থাক। আগে গল্পটা শুনে নিই। পরে এক সময় ক্রাশের কথাটা জেনে নেবো।

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক আছে। ওই জলে একেবারে কিছুই বাঁচে না, তা ঠিক নয়। খু-উ-উব ছোট্ট এক ধরনের জীবাণু থাকে ওই জলে মিশে। বিজ্ঞানীরা নানা রকম পরীক্ষা করে এখনো খুঁজে চলেছেন। ব্লাক সি-তে আর কোনো প্রাণের চিহ্ন আছে কি না। কেউ কিছু পায়নি এখনও পর্যন্ত। আমি একদিন কথায় কথায় ওই ভাজা সাহেবকে বললুম, মনে হচ্ছে, খুব শিগগিরই ওই ডেড সি-তে আরও বড় কোনো প্রাণের চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারবো। তা শুনে অবিশ্বাসের সুরে সে বললো, অসম্ভব! এতদিন ধরে এত বড় বড় সায়েন্টিস্ট চেষ্টা করে যা পারেনি, তুমি তা পেয়ে যাবে? তোমার তো আস্পর্ধা কম নয়। ব্যাস আমাদের মধ্যে তর্ক লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, ঠিক আছে, আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে যদি আমি আমার আবিষ্কার প্রমাণ করে দিতে না পারি তা হলে আমি তোমার সামনে কানমলা খাবো। ফ্রাই বললো, কানমলা খেতে হবে না। বাজি ফেলো! আমি বললুম ঠিক আছে, বাজি!

বিলুদা জিজ্ঞেস করলো, কত বাজি ফেললে?

বিশ্বমামা বললো, এক টাকা।

আমরা দু'জনেই বলে ফেললুম, মোটে এক টাকা?

বিশ্বমামা বললেন, বিজ্ঞানীদের মধ্যে বাজিতে জিততে পারাটাই বড় কথা। টাকার অঙ্ক যাই-ই হোক। বেশি টাকার বাজি ফেলে তো জুয়াড়িরা। এত বাজি জিতলে

সব কাগজে তা ছাপা হয়, অনেক সম্মান বেড়ে যায়। পরে কিছু কিছু প্রাইজও পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কী করে ওই বাজিটা ফেললে? কী করে প্রমাণ করবে? জলে ডুব দিয়েও তো দেখতে পাবে না!

বিশ্বমামা বললেন, শোন! জলের তলায় কোথায় কি জন্তু-জানোয়ার কিংবা মাছের ঝাঁক আছে, তা এখন আর জলে নেমে জানতে হয় না। ছোনার নাম যন্ত্র আছে, তাতেই জানা যায়। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা জাহাজগুলোও ওই ছোনার তরঙ্গ দিয়ে জেনে যায়, কোথায় আছে হাঙর কিংবা তিমি। আমি এবং ছোনার তরঙ্গের যন্ত্র আরও উন্নত করে তোলার গবেষণা করেছি। সেই যন্ত্রে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, ডেড সি'র বিশেষ একটা জায়গায় কিছু প্রাণের চিহ্ন রয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলুম না। সেই প্রাণীগুলো নড়ে চড়ে না। একই জায়গায় থাকে দিনের পর দিন। এটা কী ভাবে হয়?

আমি বললুম, যে-কোনো প্রাণী হলেই তার কখনো না কখনো তো খিদে পাবেই। খাবারের জিনিসের খোঁজে এদিক ওদিক যেতেই হবে।

বিলুদা বললো, হ্যাঁ, জলের তলাতেও খুঁজবে কোথাও চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে কিনা! দূর বোকা! অনেক প্রাণীর শুধু জল খেয়েই পেট ভরে যায়। এদিক ওদিক যেতে হয় না।

বিশ্বমামা তাঁর লম্বা নাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তা হতেও পারে। কিন্তু মুস্কিল হলো যে প্রমাণ দিতে হলে তো অন্তত ছবি তুলে দেখাতে হবে! তারও তো উপায় নেই।

আমি বললুম, কেন? ডিসকভারি চ্যানেলে যে সমুদ্রের তলার কত ছবি দেখা যায়?

বিশ্বমামা বললো, ডিসকভারি চ্যানেলে কি কখনো ডেড সি-র ছবি দেখিয়েছে? ওখানে মানুষ ডোবে না, ক্যামেরাও ডোবে না। সেইজন্যই তো আমি ঠিক করেছিলুম, হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নেমে ওই সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবো। আমার কোমরে ক্যামেরা বাঁধা ছিল। কিন্তু সেটা তো পারা গেল না।

বিলুদা বললো, তখন হাই সাহেব কী বললো?

বিশ্বমামা বললো, সে খুব হাসতে লাগলো। সব কাগজে টাগজে আমাদের বাজির কথা ছাপা হয়ে গেছে। অনেকগুলো টেলিভিশান ক্যামেরাও ছিল সেই হেলিকপ্টারে। আমার অবস্থা ভিজে বেড়ালের মতন।

বিলুদা বললো, ইস বিশ্বমামা, তুমি বাজিতে হেরে গেলে? তুমি তো কখনো কোনো কিছুতেই হার মানো না।

বিশ্বমামা বললেন, এখানে হার মানতেই হতো। কিন্তু ফ্রাই যেই ঠাট্টা করে

বললো, ওহে বাঙালির বাচ্চা, তুমি দেশে ফিরে গিয়ে কবিতা লেখো গিয়ে। এসব বিজ্ঞানের আবিষ্কার তোমাদের কম্মো নয়, অমনি আমার জেদ চেপে গেল। আমি বললুম, আমি তো সাতদিনের কথা বলেছি। এখনো তিন দিন সময় আছে। তোমার সঙ্গে আমার বাজি এখনো রইলো,

বিলুদা বললো, বাঙালিকে গালাগালি দিল বলেই তুমি আরও রেগে গেলে?

বিশ্বমামা বললেন, ঠিক গালাগালি দেয়নি। ওটা ওদের ইয়ার্কি। নিজেদের মধ্যে এরকম ইয়ার্কি হয়, এমন কি হাত তুলে কথাও হয়। আমিও রবার্ট ফ্রাইকে অনেকবার বলেছি, তোমরা ব্রিটিশরা আগে ছিলে সিংহ, এখন হয়ে গেছো শিয়াল।

আমি বললাম, বিশ্বমামা ছাই সাহেব ব্রিটিশ? আগে যে একদিন বলেছিলে, সুইডেনের লোক?

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁ, দুটোই ঠিক। বাবা ব্রিটিশ কিন্তু মা সুইডেনের। ছোটবেলা থেকেই আছে সুইডেনে। ওর এক মামা নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। যাই হোক, আমরা বাজি ফেলেছি বটে, আমাদের কিন্তু ঝগড়া হয়নি। সেইদিনই রাত্তিরে আমি ওকে চিংড়ি মাছের কালিয়া রান্না করে খাইয়েছি।

বিলুদা বললো ডেড সি-তে কোনো মাছই পাওয়া যায় না। তুমি চিংড়ি মাছ পেলে কোথায়?

বিশ্বমামা বললেন, বাঃ, ওদেশে বুঝি নদী নেই। বিখ্যাত জর্ডন নদীই তো রয়েছে। জর্ডন নদী কেন বিখ্যাত জানিস তো? ওই নদীর জল মাথায় ছিটিয়ে সারা পৃথিবীর ক্রিশ্চিয়ানদের দিক্ষা দেওয়া হয়। আবার ওই নদীর চিংড়ি মাছের স্বাদও দারুণ।

আমি বললুম, বিশ্বমামা তুমি চিংড়ি মাছের মালাইকারি রান্না করতে পারো, আমাদের একদিন রান্না করে খাওয়াবে না?

বিশ্বমামা বললেন, আগে তোদের খাওয়াইনি? ঠিক আছে, এবার খাওয়াবো। তোরা টাটকা চিংড়ি কিনে আনিস।

বিলুদা বললো, এই নীলু, চুপ, চুপ। তারপর বিশ্বমামা, তুমি তোমার কথা প্রমাণ করার জন্য কী করলে? নাকি, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলে?

বিশ্বমামা বললেন, কী যে করবো তা ভাবতে ভাবতেই আরও একটা দিন কেটে গেল। আমার যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখলুম, সেটা ঠিকই আছে। ডেড সি'র একটা বিশেষ জায়গায় জীবিত প্রাণীর চিহ্নও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রমাণ করি কী করে। ওখানে যে নামাই যাচ্ছে না। ছবিও তোলা যাচ্ছে না। তোরা নিশ্চয়ই মাসাদা নামের কোনো শহরের নাম শুনিসনি!

আমরা দু'জনেই মাথা নাড়লুম। না, শুনিনি!

বিশ্বমামা বললেন, পৃথিবীতে এরকম আশ্চর্য সুন্দর কত ছোট ছোট শহর যে আছে। অনেকেই তা জানে না। মাসাদা শুধু সুন্দর নয়, অনেক পুরনো আর ইতিহাসে

তার স্থান আছে। বাইবেলে আছে, জুডিয়ার রাজা হেচ্‌ড দা গ্রেট এখানে একটা প্রাসাদে থাকতেন। আর কিছু দূরের একটা পাহাড়েই এক সময় লুকিয়ে ছিলেন ডেভিড। আরে ডেভিড রে, সেই ডেভিড, যে গোলথয়া নামে একটা দৈত্যকে গুলতি ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিল।

আমি মিনমিন করে বললুম, বিশ্বমামা আবার ক্লাসের কথা হয়ে যাচ্ছে। গল্পটার কী হলো?

বিশ্বমামা বললেন, হ্যাঁ, ওই শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পরদিন দেখি যে একটা পার্কের ধারে একজন লোক বাঁদর নাচের খেলা দেখাচ্ছে!

বিলুদা বললো, ওই সব দেশে এখনো বাঁদর নাচ দেখানো হয়? আমাদের দেশে তো জীব-জন্তুর খেলা বন্ধ হয়ে গেছে।

বিশ্বমামা বললেন, দু' একটা আরব দেশে এখনো দেখানো হয়!

এবার আমি বিলুদাকে বললুম, এই, তুমি এখন বাধা দিচ্ছো কেন? বিশ্বমামাকে গল্পটা বলতে দাও।

বিশ্বমামা বললেন, একটা পার্কের পাশে বসে একজন খুব রোগা, সিড়িঙ্গে ধরনের লোক বাঁদর নাচ দেখাচ্ছে। একটা মাত্র বাঁদর লোকটা বাঁদরটাকে একটা কিছু অদ্ভুত ভাষায় যা হুকুম করছে, বাঁদরটা তাই করে দেখাচ্ছে। তার মধ্যে একটা কী খেলা জানিস? অদ্ভুত না অদ্ভূত! সেই পার্কে একটা ফোয়ারা ছিল, তলা থেকে ফোয়ারার জল উঠে যাচ্ছে প্রায় দোতলা সমান উঁচুতে। রোগা লোকটা কী যেন একটা বললো চেঁচিয়ে, আর বাঁদরটা ওই ফোয়ারা বেয়ে বেয়ে উঠে গেল উঁচুতে।

বিলুদা বললো, তার মানে?

বিশ্বমামা বললেন, বিশ্বাস করছিস না তো? আমরাও প্রথমে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারিনি। শুধু জল বেয়ে উঠে গেল বাঁদরটা। একেবারে ওপরে যেখানে ফোয়ারার জল টগবগ করছে, সেখানে সে একটুখানি বসেই রইলো।

আমার সঙ্গে ছিল রবার্ট ফ্রাই। সে বললো, মাই গড! এ যে বিজ্ঞানের কোনো নিয়মের মধ্যেই পড়ে না! আমি বললুম, সেই যে শেক্‌সপিয়ার লিখেছেন না, কী লিখেছেন ঠিক মনে নেই, মোট কথা, পৃথিবীতে এরকম কিছু ঘটে।

রবার্ট হ্যামলেটের সেই লাইনগুলো মুখস্ত বলে দিল।

আমি তখন বাঁদর নাচওয়ালার কাছে গিয়ে বললুম, তোমার বাঁদরটা এই কাজ কী করে করলো বলবে।

সে বললো, স্যার আমার বাঁদর আরও অনেক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করতে পারে। লাফ দিয়ে আকাশে উড়তে পারে কিছুক্ষণ, পাতালে ডুব দিতে পারে কিছুক্ষণ, কিন্তু সে-সব দেখার লোক নেই এখন। অন্তত একশো টাকা না পেলে কী করে দেখাই বলুন!

আমি তাকে বললুম, ওই বাঁদর কি ডেড সি-তে ডুব দিয়ে তলায় পৌঁছোতে পারে? তা হলে আমি ওকে এক হাজার টাকা দিতে পারি।

লোকটি বললো, সে খেলাও তো ও দু'বার দেখিয়েছে। এমন কিছু শক্ত নয়।

আমি বললুম, কালই চলো। তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাবো। ও যদি ডুব দিয়ে আবার উঠে আসতে পারে তা হলে আমি দু' হাজার টাকা দেব তোমাদের দুজনকে। তুমি বাঁদরটাকে বুঝিয়ে দেবে। ওর কোমরে একটা ক্যামেরা বাঁধা থাকবে। তাতে আপনি আপনি ছবি উঠবে। ওকে কিছু করতে হবে না।

সেই রকমই ব্যবস্থা হলো। সেই হেলিকপ্টারে রোগা লোকটা আর বাঁদরটাকে নিয়ে যাওয়া হলো ডেড সি'-র সেই একই জায়গায়। কাছেই ভেসে আছে একটা নুনের পাহাড়।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বমামা বললেন, তখন ঠিক দুপুর। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে সূর্য। আমি খালি ভাবছিলুম ওই সমুদ্রে মানুষই কিছু করতে পারে না, একটা বাঁদর কি পারবে? বেচারা যদি মারা যায়? মহাকাশ অভিযানে প্রথম লাইকা নামে একটা কুকুরকে পাঠানো হয়েছিল মনে আছে?

বিলুদা বললো, সে বেচারা আর ফেরেনি!

বিশ্বমামা বললেন, হেলিকপ্টারটাকে অনেকটা নিচে নামিয়ে বাঁদরটাকে নামিয়ে দেওয়া হলো জলে। সে দিব্যি ডুবে গেল জলে। আমরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলুম। বাঁদরটার সঙ্গে একটা সরু তার বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। যাতে সে টান মারলেই তাকে ওপরে টেনে তোলা যায়। পাঁচ মিনিট পরে সে কোনো সাড়া শব্দ করছে না দেখে আমরা তারটা ধরে টানলুম। তারটাই আলগা ভাবে উঠে এলো। যাঃ! আমরা ধরে নিলুম, বাঁদরটা মারা গেছে। আমার তো চোখে জল এসে গেল। ও মা, একটু পরেই বাঁদরটা ভুস করে উঠে এলো উপরে। সে দিব্যি বেঁচে আছে, শুধু তাই নয় তার হাতে একটা স্থল পদ্মের সাইজের কালো রঙের ফুল।

আমি হেলিকপ্টারের চালককে বাঁদরটাকে উদ্ধার করার নির্দেশ দিয়ে আনন্দে লাফাতে লাগলুম। রবার্ট ফ্রাইকে জড়িয়ে ধরে বললুম, আমি বাজি জিতেছি! বাজি জিতেছি!

বিলুদা বললো, ঠিক বুঝতে পারলুম না। বাঁদরটা কি ছবি তুলে এনে দিল? তা দেখবার আগেই তুমি জিতলে কী করে?

বিশ্বমামা বললেন, বোকারাম! ওই যে ফুলটা! গাছেই তো ফুল হয়। গাছের প্রাণ নেই? তার মানেই তো, প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে গেল। ডেড সি-র তলায় যে কোথাও কোথাও গাছ আছে সেটা আমিই আবিষ্কার করেছি। রবার্ট ফ্রাই তা জেনে নিয়ে বাজিতে হেরেছে। তোরা ভাবছিস সে জন্য আমি শুধু এক টাকা পেয়েছি? না, ও বলেছে ওই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ও আমার নোবেল প্রাইজের জন্য

চেষ্টা করবে।

আমি বললুম, নোবেল প্রাইজ! সে তো অনেক টাকা শুনেছি। তা হলে আমরা রোজ চাইনিজ, জাপানিজ, মোগলাই, চিংড়ি, ইলিশ খাবো, রোজ খাবো!

বিশ্বমামা বললেন, খাবি, নিশ্চয়ই খাবি। আগে প্রাইজটা পাই। তবে, খুব সম্ভবত আমি টাকা পাবো অর্দ্ধেকটা। কেন বলতো? বাকি অর্দ্ধেক টাকা পাবে ওই বাঁদরটা।

মায়াদ্বীপ

ছেলেবেলায় আমরা মামাবাড়ি যেতাম নৌকোয় চেপে। কী যে ভালো লাগত! গাড়ি কিংবা ট্রেন কিংবা এরোপ্লেনের চেয়েও নৌকোয় যাওয়া অনেক আরামের। জলের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম ঘুম ভাব আসে, তাতে অনেক স্বপ্ন দেখা যায়।

আমাদের মামাবাড়িতে অবশ্য নৌকোয় ছাড়া অন্য কিছুতে যাওয়ার উপায়ও ছিল না। রাস্তা-টাস্তা জলেই ডুবে থাকত প্রায় সারা বছর। তাই প্রত্যেক বাড়িতে থাকত নিজস্ব নৌকো।

আমাদের বাড়ি থেকে নদীর ঘাট পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। সে নদীটা ছোট, কিন্তু ঘাটের পাশে বাজার বলে সেখানে সব সময় অনেক নৌকোর ভিড়।

আমাদের নিজেদের নৌকোটা ছোট, সেই নৌকোয় চেপে আমরা স্কুলে যেতাম। সে নৌকোয় বড় নদীতে যাওয়া যায় না। তাই আমাদের জন্য মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড় নৌকো, তাতে হলুদ রঙের পাল। সে নৌকোর তিনজন মাঝির মধ্যে হেড-মাঝির নাম নাদের আলি, সে কত রকমের গল্প শোনাত আমাদের।

ছোট নৌকোটা খানিক দূর গিয়ে একটা বড় নদীতে মিশেছে। সে নদীটার নামও খুব মিষ্টি, বাতাসি। খুব একটা বড় নয়, দু'দিকের পাড় দেখা যায়। কত রকমের মানুষ, কত পুরোনো গাছ, আর মন্দির, মসজিদ, জমিদারদের বাড়ি। এক জায়গায় শ্মশান, সেখানেও ঘাট বাঁধানো।

এই বাতাসি নদী আবার খানিকটা পরে আরও বড় একটা নদীতে এসে পড়ত। সে নদীর নাম পিংলা। কতক্ষণে পিংলা নদী আসবে তার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম।

এই পিংলা নদীতে দেখা যেত শুশুক। ইংরেজিতে যাদের বলে ডলফিন। হঠাৎ হঠাৎ হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে যায় জলে। অনেকটা যেন মানুষের মতন। খুব ছেলেবেলায় আমার মনে হত জলের নীচে নিশ্চয়ই অনেক মানুষ থাকে। একটু বড় হয়ে শুশুক চিনতে শিখেছি।

আমরা চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকি নদীর দিকে, কখন শুশুক দেখা যাবে। দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি। যে-কটা দেখলাম, তাই গুনি। এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হত, প্রত্যেকবারই জিতে যেত আমার ছোটকাকা। আমি পাঁচটা শুশুক দেখলে ছোটকাকা দেখত এগারোটা। কিন্তু ছোটকাকার কথায় আমাদের সব সময় সন্দেহ থেকে যত। আমি ডানদিকে তাকিয়ে আছি, ছোটকাকা বাঁদিকে আঙুল তুলে বলে, "ওই যে, ওই

যে একটা।" আমি সেদিকে ফিরে আর দেখতে পাই না।

সবচেয়ে কম দেখতে পান মা। আমরা চেঁচিয়ে উঠলেই মা বলেন, "কই রে, কই রে? যাঃ, চশমাটা কোথায় গেল?" মা চশমা পরা পর্যন্ত কি শুশুকরা জলের উপর মাথা তুলে বসে থাকবে?

সেবারে মা কোনোক্রমে দেখতে পেলেন একটা মাত্র!

পিংলা নদী দিয়ে একঘণ্টা নৌকো বেয়ে যাওয়ার পর দেখা যেত একটা দ্বীপ। নদীর মধ্যেও যে দ্বীপ থাকে, তা অনেকেই জানে না। এখানে নদী দু'ভাগ হয়ে গেছে, দ্বীপের দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে।

সে দ্বীপে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, তবে অনেক গাছ আছে। খুব বড় গাছ নয়, ঝোপের মতো, একটা শুধু বড় শিমুল গাছ অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আমি নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "নাদের দাদা, ওই দ্বীপটার নাম কী?"

নাদের আলির মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গালে কাঁচা পাকা দাড়ি। সব সময় তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে।

সে বলল, "এমনিতে তো কিছু নাম নাই, তবে আমরা বলি মায়াদ্বীপ।"

ছোটকাকা বলল, "ভালো নাম দিয়েছ। মায়াদ্বীপই বটে। মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়।"

সে কথা শুনে আমার প্রথম মনে হল, দ্বীপটা কি আকাশে উড়ে যায় নাকি?

তা অবশ্য নয়। যে বছর খুব বৃষ্টি কিংবা বন্যা হয়, সে বছর দ্বীপটা চলে যায় জলের তলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জলে ডুবে যায়? এত যে গাছ রয়েছে, সেগুলোর কী হয়?"

নাদের আলি বলল, "এইসব গাছ পানির মধ্যেও অনেকদিন বেঁচে থাকে। দ্বীপটা যখন আবার জেগে ওঠে, তখন দেখা যায় অনেক গাছই ঠিকঠাক আছে।"

ছোটকাকা বলল, "শুধু মাথা উঁচু করে থাকে শিমুল গাছটা। তখন তো দু'দিকের নদী এক হয়ে যায়, শুধু যেন মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে থাকে একটা লম্বা গাছ।"

আমার খুব ইচ্ছে করত, একবার সেই দ্বীপটায় নামতে। পুরো দ্বীপটাই যেন একটা বাগান।

ছোটকাকা বলল, "না, না, ওখানে নামা যাবে না। প্রচুর সাপ, একেবারে কিলবিল করছে।"

কথাটা আমার বিশ্বাস হল না।

নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, "সত্যিই ওখানে সাপ আছে?"

নাদের আলি বলল, "সে দুটো-একটা থাকতে পারে। কিন্তু ও দ্বীপে পা দিতে

নাই। মায়াদ্বীপে ওনারা থাকেন!"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ওনারা মানে কারা?"

সে কথার উত্তর না দিয়ে নাদের আলি দু'দিকে মাথা দোলাল। তারপর হঠাৎ দাঁড় বাইবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেবারে বর্ষাকালে পিংলা নদীতে আমরা দেখেছিলাম মোট সাতটা শুশুক, আর একটা কুমির!

এই নদীতে আগে কখনও কুমির দেখা যায়নি। পদ্মা নদী থেকে হঠাৎ একটা চলে এসেছে। দু'খানা নৌকোয় চেপে শিকারিরা মারার চেষ্টা করছে কুমিরটাকে। পদ্মা নদীর কুমির সাংঘাতিক হিংস্র, গোরু-ছাগল জলে টেনে নিয়ে যায়, মানুষকেও ধরে। পরপর দু'বার বন্দুকের গুলির শব্দ শোনা গেল।

আরও খানিক পরে এল মায়াদ্বীপ। এই দ্বীপের কাছে এলেই বোঝা যায়, আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব মামাবাড়ি।

সেবারে অনেক ফুল ফুটেছে, এমনকি শিমুল গাছটাও ফুলে ভর্তি। ছোটকাকা আরও শুশুক খুঁজছে, আমি তাকিয়ে আছি দ্বীপটার দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, "ওই তো মায়াদ্বীপে মানুষ নেমেছে!"

ছোটকাকা বলল, "কোথায় রে?"

আমি আঙুল তুলে দেখালাম। কয়েকটা ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বড় জোর তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। ফরসা রং, কোঁকড়া চুল, সে ফুলগাছে হাত বুলোচ্ছে, কিন্তু ফুল ছিঁড়ছে না।

ছোটকাকা বলল, "তাই তো, একা একটা মেয়ে ওখানে গেল কী করে? সঙ্গে কেউ নেই?"

নাদের আলি কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, "ওদিকে তাকিয়ো না, তাকিয়ো না, চক্ষু বুজে ফ্যালো!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, ওদিকে দেখব না কেন?"

নাদের আলি নিজে চোখ বুজিয়ে বলল, "ওনাদের দেখতে নাই।"

অন্য দু'জন মাঝিও চোখ বুজে ফেলেছে।

ছোটকাকা বলল, "বুঝেছি, মারমেড! জলকন্যা! দেখছিস না, ও মেয়েটার কোমরের দিকটা দেখা যাচ্ছে না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মারমেডদের দেখলে কী হয়?"

ছোটকাকা বলল, "আমাদের কিছু হবে না। ওদের কষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্টি ওরা সহ্য করতে পারে না।"

মা বললেন, "তোরা কী দেখেছিস? কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যাঃ, চশমাটা কোথায় গেল!"

মা সবসময় চশমা পরে থাকেন না। আর দরকারের সময় চশমা খুঁজে পান না।

চোখ বোজা অবস্থাতেই মাঝিরা জোরে জোরে চালিয়ে দ্বীপটা পার হয়ে গেল।

নাদের আলি আবার চোখ খোলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নাদেরদা, ও মেয়েটি কি সত্যিই জলকন্যা? তুমি আগেও দেখেছ?"

নাদের আলি বলল, "আমি তো কখনও দেখি নাই।"

আমি বললাম, "এই যে একটু আগে দেখলে?"

নাদের আলি দু'দিকে মাথা দুলিয়ে বলল, "না তো, আমি কিছু দেখি নাই!"

মামাবাড়িতে পৌঁছেই আমি রাঙামাসিকে বললাম, "জানো, আজ কী হয়েছে? আমরা মারমেড দেখেছি। জলকন্যা!"

রাঙামাসি বললেন, "আবার গুল ঝাড়তে শুরু করেছিস? এই নীলুটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।"

আমার তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ার মতন অবস্থা। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "না, গুল নয়। সত্যি সত্যি মায়াদ্বীপে দেখেছি। ঠিক মানুষের মতো!"

রাঙামাসি বললেন, "মায়াদ্বীপ আবার কী? ওই নদীর মধ্যে বানভাসি দ্বীপটা? ওখানে কোনো মানুষ যায় না, কখন ডুবে যাবে তার ঠিক নেই!"

আমি বললাম, "মানুষ নয়, জলকন্যা। আদ্ধেকটা মানুষের মতন। তুমি ছোটকাকাকে জিজ্ঞেস করো।"

ছোটকাকা যে এমন বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানতাম না।

ছোটকাকা অম্লান বদনে বলল, "দূর, মারমেড বলে কিছু আছে নাকি? আমি কিছুই দেখিনি। নীলু বোধহয় একটা কলাগাছ দেখে ভেবেছে—"

আমি প্রবল প্রতিবাদ করে বলতে গেলাম যে সে দ্বীপে মোটেও কোনো কলাগাছ ছিল না। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখেছি। কিন্তু অন্য সবাই হাসতে হাসতে আমায় আর কিছু বলতেই দিল না।

আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটি জলকন্যাকেই দেখেছি। সে একবার আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। হিরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে তার চোখ। ওরকম চোখ মানুষের হয় না!

শুনেছি, এখন দ্বীপটি একেবারেই জলের তলায় চলে গেছে। এমনকি শিমুল গাছটাও আর নেই।

প্রতাপ রায় কেন কেঁদেছিলেন?

গ্রামে একটি চোর ধরা পড়েছে।

আজকাল বিদেশি কোনো লোককে গ্রামে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সন্দেহ হয়। অনেক গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে গেছে। রাজা প্রতাপাদিত্য আদেশ দিয়েছেন যে কোনো গুপ্তচর দেখলেই তাকে ধরে রাজদরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

এই লোকটি গুপ্তচর না শুধুই চোর, তা বোঝা যাচ্ছে না।

একটা মস্ত বড় বটগাছের তলায় চণ্ডীমণ্ডপ। বিকেলবেলা অন্য সব কাজ সেরে গ্রামের বয়স্ক লোকেরা এখানে এসে নানারকম গল্প করে, গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সকালের দিকে সাধারণত কেউ আসে না।

আজ ভোরবেলা বিন্তি ঠাকুমা চণ্ডীমণ্ডপের পাশের শিউলি গাছ থেকে ফুল তুলতে এসেছিলেন। শরৎকাল এসে গেছে। এই সময় খুব শিউলি ফোটে। গাছ থেকে ঝরে ঝরে মাটি একেবারে সাদা হয়ে থাকে। আকাশেও এখন মেঘের রঙ সাদা হয়ে এসেছে। মাঠে-ঘাটে ফুটেছে প্রচুর কাশফুল। এই শুভ্রতার মধ্যেই বেজে ওঠে দুর্গাপুজোর বাজনা।

বিন্তি ঠাকুমা খুব ভোরে ওঠেন। ঠাকুর পুজোর জন্য তিনি শিউলি ফুলের মালা গাঁথেন, কী চমৎকার মালা, তাতে সুতো লাগে না। একে বলে বিনি সুতোর মালা।

ফুল তুলতে তুলতে বিন্তি ঠাকুমা হঠাৎ কোনো মানুষের জোরে জোরে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলেন। কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই, তবে কে নিশ্বাস ফেলছে?

ভালো করে শুনে তাঁর মনে হল, শব্দটা আসছে চণ্ডীমণ্ডপের ভেতর থেকে।

একবার তিনি ভাবলেন, সাপ নাকি?

ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ আর সাপের ফোঁস ফোঁস অনেকটা একরকম। বিন্তি ঠাকুমা সাপের ভয় পান না, কত সাপ তিনি দেখেছেন! একবার তিনি একটা সাপের ফনা চেপে ধরেছিলেন। সেটা আর কামড়াতেই পারেনি।

বিন্তি ঠাকুমা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে উঁকি দিলেন।

চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে গত বছরের দুর্গা প্রতিমার কাঠামো রাখা থাকে। ওখানেই নতুন প্রতিমা গড়া হয়। এখন সবে কাঠামোর গায়ে মাটি লেগেছে, রং হয়নি।

বিন্তি ঠাকুমা দেখলেন, প্রতিমার কাঠামোর পেছন দিক থেকে এক জোড়া মানুষের পা বেরিয়ে আছে।

তিনি প্রথমে মনে করলেন, প্রতিমা যে বানায়, সেই জলধর নাকি? হয়তো রাত

জেগে কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। পুজোর আর তো বেশি দেরি নেই।

তারপর দেখলেন সেই পায়ে নাগরা জুতো পরা।

জলধর আবার কবে এরকম বাহারি জুতো পরে ; সে তো খালি পায়েই থাকে।

বিন্তি ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কে রে? কে শুয়ে আছে?

অমনি একটা লোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তার মুখে মস্ত পাকানো গোঁফ আর মাথায় বাবরি চুল। সে হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে এসে, বিন্তি ঠাকুমাকে ঠেলে সরিয়ে এক দৌড় লাগাল।

লোকটা পালিয়ে যেতেই পারতো। বিন্তি ঠাকুমার তো তাকে আটকাবার সাধ্য নেই। তিনি খোলা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন বটে, চোর! চোর! ধর ব্যাটাকে, চোর পালাচ্ছে! কিন্তু এখন তাঁর চিৎকার আর কে শুনবে?

লোকটার দুর্ভাগ্য, এই ভোরেই সুবল আর যুগল দুই ভাই মিলে মাছ ধরতে বেরিয়েছে, হাতে তাদের জাল। দুই ভাইয়েরই বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা।

লোকটাকে পালাতে দেখে তারা ওমনি ধাওয়া করল পিছু পিছু। লোকটা পালাতে পারল না। রাস্তা ছেড়ে পাশের পাট খেতে নেমে পড়লেও যুগল তার দিকে মাছ ধরা জাল ছুঁড়ে দিল। সেই জালে আটকা পড়ে গেল মানুষটা। সুবল তাকে চেপে ধরল।

পাট গাছগুলো মানুষের চেয়েও বড় বড় হয়। সেই খেতের মধ্যে কেউ ঢুকে পড়লে তাকে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। লোকটা তার আগেই ধরা পড়ে গেছে।

তারপর যুগল আর সুবলের চ্যাঁচামেচিতে ছুটে এলো গ্রামের অনেক মানুষ। লোকটাকে টানতে টানতে এনে বেঁধে রাখা হল একটা খুঁটির সঙ্গে। তার পুঁটুলির মধ্যে পাওয়া গেল দু'খানা সোনার হার।

সোনার হার যখন পাওয়া গেছে, তখন নিশ্চয়ই লোকটা চোর। কিন্তু চোরেরা তো চুরি করে রাত্তিরেই পালিয়ে যায়। ঘুমিয়ে থাকবে কেন?

একজন বলল, চোরের মাথায় বাবরি চুল থাকবে কেন? ওরকম গোঁফও থাকে না।

তা শুনে অনেকেই ঠিক ঠিক বলে মাথা নাড়ল। কোনো চোরের গোঁফদাড়ি থাকে না, আর মাথা প্রায় ন্যাড়া থাকে। না হলে, ধরা পড়লে তাদের চুল-দাড়ি টেনে শাস্তি দেবার সুবিধে হয়। চোরেরা জুতোও পরে না, জামাও পরে না, নেংটি পরে গায়ে তেল মেখে রাখে। যাতে কেউ জাপটে ধরলেও সড়াৎ করে পিছলে যেতে পারে।

তাহলে কি গুপ্তচর? কিন্তু গুপ্তচররা তো লুকিয়ে বা ছদ্মবেশে খবর নিতে আসে, তারা তো চুরি করে না। এই গ্রামের পাশেই একটা গড় বা ছোট দুর্গ আছে, সেখানে প্রতাপাদিত্য অনেক সৈন্য রেখে দিয়েছেন। সেইজন্যই গুপ্তচররা এদিকে আসে।

লোকটা চোর না গুপ্তচর, এই নিয়ে গ্রামের লোকেদের মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল।

চোর হলে নিজেরাই কিছু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেন, বড় চোর হলে ডান হাতের আঙুলগুলো কেটে নেয়। আর গুপ্তচর হলে পাঠাতে হয় রাজার কাছে। প্রতাপাদিত্য গুপ্তচরদের এক কোপে গলা কাটার আদেশ দেন।

তর্ক যখন মিটছে না, তখন পুরুতমশাই বললেন, ঠিক আছে, মির্জা সাহেবের ছেলে কাশেমকে ডাকো!

মির্জা সাহেবের সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির নাম কাশেম। তার বয়েস এগারো। রোগা পটকা চেহারা। শুধু চোখদুটি যেন কাজলটানা। অন্য ভাইবোনের তুলনায় সে একেবারে আলাদা। সে পাঠশালায় যায় না, মাঠের কাজ করে না। বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়ায়। কারুর সঙ্গে মেশে না। কথাও বলে না। সে আপন মনে থাকে। একা একা গান গায়, অনেকটা পাখির শিসের মতন।

গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে এসে বলল, মির্জা সাহেব, আপনার ছোট ছেলেটাকে যে একবার চাই।

সব ব্যাপার শুনে মির্জা সাহেব বললেন, অবশ্যই অবশ্যই, দেখা যাক না, ছেলেটা এর ফয়সালা করতে পারে কি না।

কোথায় কাশেম? সে তো বাড়িতেই থাকতে চায় না। খোঁজ করে দেখা গেল, সে পুকুর ধারে একটা বকের পাশে চুপটি করে বসে আছে। মানুষ অত কাছে এলে বকরা উড়ে যায়। এ বকটি কিন্তু উড়ে যায়নি।

কাশেম লোকজন দেখেই পালাতে চেষ্টা করল। এরকম ব্যাপারে তাকে অনেকবার ডাকা হয়েছে। সে যেতে চায় না।

তবু লোকজন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু কেউ তাকে বকুনি দিল না। কয়েকজন মিষ্টি করে বলল, চল বাবা, চল বাছা! তোকে মেঠাই খেতে দেব।

একজন লোক প্রায় কোলে করেই নিয়ে এলো কাশেমকে সেই চণ্ডীমণ্ডপের কাছে। তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল সেই ধরাপড়া লোকটার সামনে।

লোকটি এর মধ্যে বেশ কিছু চড়-থাপড় খেয়েও নিজের নাম বলেনি, একবারও মুখ খোলেনি। সে কটমট করে চেয়ে রইল কাশেমের দিকে।

পুরুতমশাই বললেন, বাবা কাশেম, তোর কোনো ভয় নেই। তুই ঠিক করে বলতো, এই লোকটা কে? কোথা থেকে এসেছে?

কাশেম আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতের এক আঙুল দিয়ে লোকটির বুক ছুঁয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, এর নাম রহমৎ খান। সেনাপতি মানসিংহ ওকে পাঠিয়েছে!

খুঁটিতে বাঁধা লোকটি থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমায় মারবেন না। দয়া করুন, দয়া করুন। রাজার কাছে পাঠাবেন না। আমি এক বাড়ি থেকে সোনার হার চুরি করেছি। আমায় চোরের শাস্তি দিন।

কাশেম ছুটে চলে গেল সেখান থেকে। সে আর লোকটির শাস্তি দেখতে চায় না।

কাশেমের এই এক অদ্ভুত শক্তি। সে যে কোনো মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। তার সামনে কেউ মিথ্যে কথা বলতে পারে না। সে একবার ছুঁয়ে দিলেই মানুষ বদলে যায়।

মাত্র একবছর আগে থেকে কাশেমের এরকম ব্যাপার হয়েছে। গ্রামের আশে-পাশে অনেক জঙ্গল, সেখানে সে ঘুরে বেড়ায়। পাখিদের ডাক নকল করতে করতে সে অনেক পাখির ভাষা শিখে গেছে।

একদিন চালতা বাগানে সে একটা অদ্ভুত পাখি দেখেছিল। প্রায় চিলের মতোই বড় সেই পাখিটার কিন্তু গায়ের রং গাঢ় নীল, আর ঠোঁটটা হলুদ। চালতা গাছের ডালে বসে পাখিটা কাশেমের দিকে তাকিয়ে বার বার ডাকছিল।

কাশেম অবশ্য সেই পাখিটার ভাষা বুঝতে পারেনি। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, পাখিটা তাকে কী যেন বলতে চায়।

একটু পরে পাখিটা উড়ে যাবার সময় তার একটা পালক ফেলে গেল কাশেমের সামনে। সেই লম্বা নীল পালকটা হাতে তুলে নিতেই কাশেমের সারা গায়ের লোমগুলো যেন খাড়া হয়ে গেল, বেশ খুশি খুশি ভাব হল।

নীল পালকটা সে রেখে দিয়েছে বালিশের নীচে।

তাদের ঠিক পাশের গ্রামে একটা পাজি লোক থাকে, তার নাম জনার্দন। সে প্রত্যেকদিন পাখি শিকার করে বেড়ায়। তার হাতে একটা গুলতি থাকে, তার দারুণ টিপ। টিয়া, হরিয়াল, ডাহুক, ইস্টকুটুম, বউ-কথা-কও, বুলবুলি এইসব কত পাখি যে সে মারে, তার ঠিক নেই। তার নামই হয়ে গেছে পাখিমারা জনার্দন।

লোকটাকে দেখলেই কাশেমের রাগ হয়। পাখিরা যে তার বন্ধু। কিন্তু সে বয়েসে অনেক বড়, কাশেম আর কী করে তাকে বাধা দেবে!

একদিন একটা সুযোগ এসে গেল।

ওই গ্রামেরই জমিদার বাড়ির মন্দিরের সোনার রাধাকৃষ্ণ মূর্তি চুরি গেছে। তাই নিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড। গ্রামে ছোটখাটো ডাকাতি আর চুরি তো লেগেই থাকে। কিন্তু মন্দিরের ঠাকুর চুরি করতে চোরেরাও সাহস পায় না। সব চোররাই ভয় পায়।

জমিদারবাবু রেগে আগুন। তিনি হুকুম দিয়েছেন। যেমন করেই হোক চোর ধরতেই হবে। তার সেপাইরা তিনজনকে ধরে এনেছে। জমিদারবাবু তাদের বিচার করবেন।

বহু লোক ছুটে গেছে সেই চোরেদের বিচার দেখতে। কাশেমও গেছে তার দুই দাদার সঙ্গে।

এক একজন চোরকে চাবুক মারা হচ্ছে আর জমিদারবাবু দাঁত কিড়মিড় করে

বলছেন, বল, বল, কোথায় রেখেছিস আমার মন্দিরের ঠাকুর!

চোর তিনটে শুধু হাউ হাউ করে কাঁদছে!

সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পাখিমারা জনার্দন! তার মুখ খানা হাসি মাখা।

তার দিকে তাকিয়ে কাশেম দারুণ চমকে উঠল। তার শরীরে আবার রোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। সে যেন শুনতে পাচ্ছে জনার্দনের মনের কথা।

সে আরও কাছে গিয়ে জনার্দনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এবার সে স্পষ্ট শুনল, জনার্দন মনে মনে বলছে, আমায় কেউ ধরতে পারবে না। আমি মূর্তিটা কোথায় রেখেছি, তা কেউ খুঁজেও পাবে না। আমার উঠোনের তুলসি গাছের নীচে, অনেকখানি গর্ত খুঁড়ে—

কাশেম এক লাফে জমিদারবাবুর সামনে গিয়ে বলল, হুজুর, এরা কেউ চোর নয়। চোর ওই গুলতিওয়ালা লোকটা। ওর বাড়ির তুলসি গাছের তলায় খুঁড়ে দেখতে বলুন—

একটা বাচ্চা ছেলে জমিদারবাবুর সামনে এসেছে দেখে একজন সেপাই তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেল।

জমিদারবাবু সেপাইকে বাধা দিয়ে কাশেমকে বললেন, দ্যাখ ছোঁড়া, তুই যা বললি তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তোকে তিন খানা মোহর দেব। আর মিথ্যে হলে তিরিশ ঘা চাবুক খাবি।

পাখিমারা জনার্দন ততক্ষণে থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে।

সেপাইরা ছুটে গিয়ে তার উঠোনের তুলসিগাছের তলা খুঁড়ে পেয়ে গেল রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।

পরে কাশেমের বাবা-দাদারা অনেকবার জিজ্ঞেস করেছে, তুই কী করে একথা বলতে পারলি?

কাশেম তার উত্তর জানে না। লোকটার দিকে তাকিয়েই যে সে তার মনের কথা জেনে ফেলেছে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

এর পরে আরও কয়েকবার চুরি কিংবা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া কিংবা খুনের ঘটনায় কাশেমকে ডেকে আনা হয়েছে। সে ঠিক ঠিক ধরিয়ে দিয়েছে অপরাধীকে।

কী করে সে এরকম পারে, তার ব্যাখ্যা মেলে না।

এই গুণের জন্য চতুর্দিকে নাম ছড়িয়ে গেছে কাশেমের। কিন্তু কাশেম সে জন্য খুশি নয়। সে পালিয়ে থাকতে চায়। সে অপরাধীকে ধরিয়ে দিলে যে তক্ষুনি তাকে মারধর শুরু হয়ে যায়, সেটা কাশেম সহ্য করতে পারে না। রক্ত দেখলে তার মাথা ঘোরে।

কাশেমের এই গুণের কথা স্বয়ং রাজা প্রতাপাদিত্যের কানে গিয়েও পৌঁছল। একদিন তিনি দুর্গ পরিদর্শনে এসে সহচরদের বললেন, চলো তো ওই কাশেম

ছেলেটাকে একবার দেখে আসি!

ঘোড়া ছুটিয়ে প্রতাপাদিত্য সহচরদের নিয়ে এলেন মির্জা সাহেবের বাড়িতে। তারপর তিনি বালক কাশেমের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, অনেকরকম উপহার দিলেন।

কাশেম কিন্তু প্রতাপাদিত্যকে দেখামাত্র চমকে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে। স্বয়ং রাজামশাই এসেছেন তাদের বাড়িতে, এ তো কত বড় সৌভাগ্যের কথা। তবু সে কাঁদছে কেন, কিছুতেই বোঝা গেল না।

প্রতাপাদিত্য মির্জা সাহেবকে বললেন, আপনার ছেলে এমন গুণী! ও আর একটু বড় হলে, এই ধরুন বছর খানেক বাদে ওকে যশোরে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দেবেন। মনে থাকে যেন। তাতে আমার ওখানে বিচার করারও অনেক সুবিধে হবে।

কিন্তু বছর কাটবার আগেই যুদ্ধ লেগে গেল।

প্রতাপাদিত্যের আসল নাম প্রতাপ রায়। তাঁর বাবা আর কাকা মিলে একটা ছোট জমিদারি স্থাপন করেছিলেন। প্রতাপ রায় নিজের বুদ্ধি আর সাহসে সেই জমিদারি অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছেন, নিজেকে তিনি এখন বলেন রাজা।

বাংলার রাজধানী এখন গৌড়। তার থেকেও প্রতাপের রাজধানী যশোরের এখন নাম ডাক বেশি। দিল্লির সম্রাট এখন আকবর। প্রতাপ এখন আর তাঁকেও মানেন না। নিজে হয়ে উঠলেন স্বাধীন রাজা।

প্রতাপের অনেক গুণ থাকলেও দোষও আছে কিছু কিছু। দারুণ রাগী আর বদমেজাজি। রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। অনেককে কটু বাক্য বলেন, কম অপরাধে বেশি শাস্তি দেন। কেউ কেউ বলে, তিনি একদিন রেগে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় তাঁর কাকা বসন্ত রায়েরও মুণ্ডু কেটে ফেলেছেন।

প্রতাপের কীর্তি কাহিনি আকবরের কানেও পৌঁছেছে। প্রতাপ দিন দিন গায়ের জোরে নিজের এলাকা বাড়িয়ে নিচ্ছেন। নিজের সৈন্যবাহিনী খুব বড় না হলেও তাদের নিয়ে ঝড়ের বেগে এক একটা মুঘলদের ঘাঁটি আক্রমণ করেন আর জিতেও যান।

সুবে বাংলার এই খুদে জমিদারটি স্বাধীন রাজা হতে চাইছে জেনে সম্রাট আকবর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে আদেশ দিলেন, যত শিগগির পারো ওই বাঙালিটাকে ধরে আনো আমার কাছে!

মানসিংহ আগেই পৌঁছেছিলেন বাংলায়, এবার তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে এগোলেন যশোরের দিকে। প্রতাপ দারুণ বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করলেন বটে। কিন্তু অতবড় মুঘল সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁর ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী কতদিন আর যুঝতে পারবে? অনেকে প্রাণ দিল, অনেকে ভয়ে পালাল। শেষ পর্যন্ত লড়াই করেও প্রতাপ হেরে গিয়ে বন্দি হলেন।

তাঁর হাত পায়ে শেকল বেঁধে নিয়ে আসা হল মানসিংহের সামনে।

ধরা পড়েও প্রতাপের তেজ একটুও কমেনি। শৃঙ্খলিত সিংহের মতন ফুঁসছেন।

মানসিংহের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনার লজ্জা করে না? আপনি রাজপুত হয়েও আমার মতন একজন স্বাধীন রাজাকে মুঘলের হাতে তুলে দিচ্ছেন? মুঘলরা তো বিদেশি, আপনি আর আমি একই দেশের মানুষ!

মানসিংহ গম্ভীরভাবে বললেন, স্বদেশি-বিদেশির প্রশ্ন থাক। দেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আমার। আপনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ আপনি একজন খুনী। আপনার বিচার হবে!

প্রতাপ বললেন, রাজত্ব চালাতে হলে তো কিছু লোককে মারতেই হবে! সম্রাট আকবরও তো কতজনকে মেরেছেন।

মানসিংহ বললেন, বিনা দোষে কারুকে খুন রাজা বা সম্রাটের পক্ষেও অপরাধ। আপনি আপনার কাকা বসন্ত রায়কে অকারণে খুন করেছেন।

প্রতাপ গর্জন করে উঠলেন, মিথ্যে কথা? কে বলেছে, আমি কাকাকে খুন করেছি? তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তাই মারা গেছেন।

মানসিংহ বললেন, আপনি তাকে খুন করেছেন। এটা সবাই জানে।

প্রতাপ বললেন, এটা আমার শত্রুদের মিথ্যে রটনা! রাজত্ব চালাতে গেলে কিছু শত্রু হয়ই!

মানসিংহ বললেন, বসন্ত রায়ের ছেলে কচু রায় দিল্লি গিয়ে সম্রাট আকবরের কাছে নালিশ জানিয়েছেন।

প্রতাপ বললেন, সেটা তো একটা সত্যিই কচু! নিজের কিছু এলেম নেই, তবু আমার রাজত্বের ভাগ চেয়েছিল। তা দিইনি বলেই এইসব মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে।

মানসিংহ তাঁর এক অনুচরকে বললেন, দশজন সাধারণ মানুষকে ডেকে আনো তো। তারা কী বলে দেখা যাক।

প্রতাপ হিন্দু-মুসলমান সব প্রজাদের মধ্যেই জনপ্রিয় ছিল। দিল্লির বাদশা অতদূর থেকে বাঙালির সুখ-দুঃখ কী বোঝেন? প্রতাপ তবু এখানকার মানুষদের দিয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বাদ।

সেই দশ জনের কেউই প্রতাপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল না। সবাই বললেন, আমরা ওই খুনের কথা কিছু জানি না।

প্রতাপ হা-হা করে হেসে উঠলেন।

তখন এক অনুচর মানসিংহকে বলল, এখানে কাশেম নামে একটি বাচ্চা ছেলে আছে। সে এলেই খাঁটি সত্যি-মিথ্যে জানা যাবে!

তখনই একদল সৈন্য ছুটে গিয়ে ধরে আনল কাশেমকে।

মানসিংহ আর প্রতাপকে দেখেই কাশেম কাঁদতে শুরু করেছে। দারুণ ফুঁপিয়ে

কাঁদছে। তার বাপ-দাদারা তাকে বলে দিয়েছে, সে যেন মহারাজ প্রতাপের বিরুদ্ধে কিছু না বলে।

মানসিংহ কাশেমকে বললেন, বাচ্চা, তুমহার কুছ ডর নেই। যা সত্যি শুধু তাই বলবে। এই লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখো, এ কী এর চাচাকে হত্যা করেছে?

কাশেম কিছু না বলে কাঁদছে, এবারে প্রতাপের সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল। তাঁর মনে পড়ল, প্রথম দিন তাঁকে দেখেই এ ছেলেটি কেঁদেছিল। এ ছেলেটি সত্যি কথা জানে। এর মুখ দিয়ে নাকি মিথ্যে বেরোয় না!

কাশেম আঙুল দিয়ে প্রতাপকে ছুঁয়ে নিল একবার। মুখে কিছুই বলল না। প্রতাপ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে বললেন, হ্যাঁ আমিই আমার কাকা বসন্ত রায়কে হত্যা করেছি রাগের মাথায়। আমার ধারণা হয়েছিল তিনি চক্রান্ত করে আমার রাজ্য কেড়ে নেবার জন্য মুঘলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। সেটাই আমার জীবনের চরম পাপ! সে জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে জানি! মানসিংহ, আমাকে শাস্তি দিন।

মানসিংহ প্রতাপকে দিল্লি নিয়ে গেলেন। তারপর মুঘল সৈন্য ধ্বংস করে দিল প্রতাপের রাজধানী যশোর। প্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একজন বাঙালির স্বাধীন হবার স্বপ্নও মিলিয়ে গেল।

ইতিহাসে এসবই লেখা আছে। শুধু ছোট্ট কাশেমের ভূমিকার কথা লিখতে ভুলে গেছেন ইতিহাস-লেখকেরা।

সেই সাধুটি আসলে কে?

এই দুপুরে বাড়িতে জয় একা। আর আছে তাদের কুকুর ভুলু।

মা-বাবা গেছেন দিল্লিতে। দাদা আর বউদি দু'জনেই অফিস যায়। ছোড়দি কলেজে। এমনকি যে পিসিমণি প্রায় কক্ষনো বাড়ির বাইরে যান না, তিনিও আজ পাশের বাড়ির লোকদের সঙ্গে গেছেন দক্ষিণেশ্বর।

এক একদিন হঠাৎ এমন হয়, সবাই একসঙ্গে বাইরে চলে যায়।

জয় অবশ্য এখন দিব্যি একা থাকতে পারে।

জয় এখন ঠিক ছোটও নয়, আবার ঠিক বড়দের দলেও চলে আসেনি। সে মাঝামাঝি রয়েছে।

সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে এ বছর। তার দাদা বলে, তুই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর যখন কলেজে ভর্তি হবি, তখন তুই বড় হবি। তার আগে কেউ তোকে বড়ো বলে মানবে না।

কলেজে ভর্তি হলেই বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার পারমিশন পাওয়া যাবে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখনো রেজাল্ট বেরোয়নি। এই সময় ছুটি।

জয় অনেক গল্পের বই জমিয়ে রেখেছে, এই ছুটিতে পড়বার কথা। কিন্তু যখন টানা ছুটি থাকে, তখন গল্পের বইতেও মন বসে না। পরীক্ষার আগে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ার মজা অনেক বেশি।

একলা দুপুরে জয় মাঝে মাঝে গল্পের বই পড়ছে, মাঝে মাঝে গিয়ে বসছে কম্পিউটারে। দাদার কম্পিউটারে অন্য সময় দাদা জয়কে হাত দিতে দেয় না। জয় অবশ্য গোপনে গোপনে সবই শিখে গেছে। ঝট করে ইন্টারনেট খুলতে পারে।

ভুলু ঘুমোচ্ছে তার পায়ের কাছে।

হঠাৎ কী একটা আওয়াজে জয় মাথা তুলে দেখলো, রাস্তার দিকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ।

একজন মানুষকে দেখলে ভয় পাবার তো কিছু নেই। তবু কেন জয়ের বুক একবার কেঁপে উঠলো?

মানুষটি ঠিক সাধারণ নয়, বেশ লম্বা, মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কপালে ছাই মাখা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। হাতে ত্রিশূল।

সারা শরীরে একটা কম্বল জড়ানো। আর ঠিক নাকের ডগায় একটা বড় কালো

আঁচিল।

সিনেমায় এই ধরনের চেহারার লোকেরা সাধারণত ডাকাতের সর্দার হয়। কিন্তু এখনকার ডাকাতের সর্দারের হাতে তো ত্রিশূলের বদলে বন্দুক থাকবে।

কাপালিক কিংবা সন্ন্যাসীও হতে পারে। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় তো এদের দেখা যায় না।

লোকটির চোখ জ্বলজ্বল করছে। সত্যিই, না মনে হচ্ছে এরকম! সব কাপালিকেরই চোখ জ্বলজ্বল করে, আর ডাকাতের সর্দাররা হাঃ হাঃ-র বদলে বিশ্রীভাবে হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসে।

লোকটি জয়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, কেয়া বাচ্চা, পরীক্ষা হো গ্যয়া?

জয় বেশ চমকে উঠলো। এই লোকটি কী করে জানলো তার পরীক্ষার কথা?

জয়কে বাচ্চা বলেছে, তাই জয় উত্তর দিলো না।

লোকটি এবার ভাঙা বাংলায় বললো, আও, পাস মে আও। তুমহার নাম কী আছে? ঠারো ঠারো, হামি জানি। জয়ব্রত্ চৌধুরী। ঠিক আছে না?

এবারে জয় শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী করে জানলেন আমার নাম?

লোকটি বললো, হাম নাগা সাধু। হামি সব কুছ জানি।

নাগা সাধুদের কথা জয় কোনো কোনো গল্পের বইতে পড়েছে। ভালো করে তেমন কিছু জানে না।

নাগা সাধু হলেই তার নাম জেনে যাবে, এটা জয়ের বিশ্বাস হয় না।

সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি কী এর আগে কখনো আমাদের বাড়িতে এসেছেন?

জয়ের কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে নাগা সাধু বললো, কেয়া?

জয় এবার চেষ্টা করে হিন্দিতে বললো, আপ কভি এই কোঠিতে আয়া হ্যায়?

নাগাসাধু প্রথমে হাঃ হাঃ করে হাসলো। তারপর হাতের ত্রিশূলটা মাটিতে ঠুকলো দু'বার।

এই সময় ভুলু জেগে উঠে ভুক ভুক করে ডাকলো। কিন্তু জানলার কাছে গেল না।

নাগাসাধু বললো, চুপ যা!

ভুলু অমনি চুপ।

ভুলুর আগের ডাক শুনেই জয় বুঝেছিল, সে লোকটিকে পছন্দ করেনি।

ওটাই অপছন্দের ডাক। তবে চুপ করে গেল কেন?

কে যেন বলেছিল, কুকুররা ভূত আর সাধুদের ভয় পায়।

সাধু এবার বললো, জয়ব্রত্ তুম মেরা পাস আসছো না? ডর লাগছে?

জয় এবার অনেকখানি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। সাধু হোক আর যাই-ই হোক, একজন মানুষকে সে ভয় পাবে কেন?

সে এগিয়ে এলো জানলার কাছে।

সাধু গ্রিলের মধ্য দিয়ে একটা হাত গলিয়ে খপ করে জয়ের একটা হাত চেপে ধরলো।

তারপর বললো। হামি হিমালয়সে সোজা চলিয়ে এসেছি তুমহারা সাথ মুলাকাত করার জন্য। কলকাতায় হামি আগে কভি নেহি আয়া!

এ আবার কী কথা?

এই সাধু হিমালয় থেকে সোজা চলে এসেছে শুধু তার সঙ্গে দেখা করার জন্য?

জয় বললো, কেন? মানে, কাঁহে?

সাধু বললো, হামি গঙ্গাসাগর মেলা জায়েগা। তুম দোশো রুপিয়া দো। তুমহার বহুৎ বিপদ আছে। হামি তুহার নামে যজ্‌গিঁয়ো করবো। তুমহার বিপদ কেটে যাবে।

জয় এবার খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

ও, টাকা চাইছে! তার মানে, সাধু বেশে ভিখিরি। সব মিথ্যে কথা বলছে। হিমালয়ে থাকে না ছাই! হিমালয়ে থেকে বাংলা শিখবে কী করে? নিশ্চয়ই এদিকে কোথাও থাকে। এ পাড়াটা চেনে। তাই পরীক্ষা টরীক্ষার কথাও জানে।

এবার জয় হেসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি বাংলা কোথায় শিখলেন?

সাধু বললো, ম্যায় নাইনটি সিক্স ল্যাঙ্গোয়েজ জানি। ছিয়ানব্বই ভাষা।

তারপর সে নিজের অন্য হাতটা খুলে দেখালো একটা কমলালেবু।

বললো, খা লেও!

জয় বললো, ম্যাজিক? আমি ম্যাজিকের জিনিস খাই না।

সাধু সেই হাতেই বার করলো একটা সবেদা।

বললো, ইয়ে খাওগে।

জয় বললো না।

সাধু বললো, আউর দো মিনিট টাইম হ্যায়। দেও, দোশো রুপেয়া দেও, আভি জানে হোগা।

জয় দুশো টাকা পাবে কোথায়? তার কাছে আছে মাত্র সতেরো টাকা। তা ছাড়া কেউ চাইলেই টাকা দিতে হবে নাকি?

জয় বললো, কেন দুশো টাকা দেব? এমনি এমনি কেউ টাকা দেয়? আপনি তো মোটে দুটো সহজ ম্যাজিক দেখালেন।

সাধু বললো, দেখো!

সে এক হাতে জয়ের একটা হাত ধরে আছে এখনো, অন্য হাতটা তুললো

ওপরের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশে শোনা গেল বজ্র গর্জন। চড়াৎ করে ঝলসে উঠলো বিদ্যুৎ।

এটা সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। এখন বর্ষাকাল নয়, সারা দিন কটকট করছে রোদ। এর মধ্যে বজ্র-বিদ্যুৎ?

জয় খুব অবাক হয়ে চুপ করে গেল।

সাধু কিন্তু বজ্র-বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছুই না বলে মন দিয়ে দেখতে লাগলো জয়ের হাত।

জয় জিজ্ঞেস করলো, আপনি হাত দেখতে জানেন?

সাধু দু'বার মাথা নাড়লো।

জয় বললো, দেখুন তো, আমার পরীক্ষায় কী হবে?

সাধু বললো, তবু তুম রুপিয়া দেবে?

জয় বললো, দেবো, নিশ্চয়ই দেবো।

এ কথা বলেই জয়ের একটু অনুতাপ হলো।

প্রথম কথা, তার কাছে দুশো টাকা নেই। সে কী করে দেবে?

দ্বিতীয় কথা, সে কেন হাত দেখাতে রাজি হলো?

তাদের বাড়িতে কেউ হাত দেখায় বিশ্বাস করে না। সাধু-সন্ন্যাসীদের পাত্তা দেয় না। মা তবু মাঝে মাঝে মন্দিরে যান, বাবা কখনো সে-মুখো হন না। মা চেয়েছিলেন, দাদার পৈতে হোক, ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতে হবে না? বাবা বলেছিলেন, দেখো, ছেলে যদি চায়, আমি আপত্তি করবো না।

দাদার ঘোর আপত্তি, সে নিজেই পৈতে চায়নি। তার হয়নি। জয়েরও পৈতে হবে না। আগেই ঠিক হয়ে আছে।

জয় একজন সাধুর কাছে হাত দেখাচ্ছে, একথা শুনলে দাদা নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে।

জয় পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। তবু, রেজাল্ট বেরুবার আগে কার না ভয় থাকে? কোথায় কী ভুল হয়ে গেছে, কে জানে।

জয় ঠিক করলো, এই হাত দেখাবার কথা সে কারুকে বলবে না।

সাধুটি প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে মন দিয়ে জয়ের হাত দেখলো।

তারপর মুখ তুলে চেয়ে রইলো জয়ের দিকে।

তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো। অদৃশ্য হয়ে গেল সেই সাধু। একটাও কথা বললো না।

কোনো মানুষ কি সত্যিই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে?

হিমালয় থেকে যেমন এক লাফে বৃন্দাবন পাল লেনে আসা যায় না। তেমনি একটা জলজ্যান্ত মানুষ চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না।

সেটা বুঝতে জয়ের একটু সময় লাগলো।

প্রথমটা সে বেশ চমকে গিয়েছিল ঠিকই।

তারপরই সে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। ভুলুও ডাকতে ডাকতে গেল তার সঙ্গে।

সাধুটি সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়ে যায়নি।

জয় একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তার মধ্যেই সে সরে গেছে জানলার কাছ থেকে।

এখন সে বড় বড় পা ফেলে চলে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। একটা রিক্‌শা তাকে আড়াল করে দিলো। আর দেখা গেল না তাকে।

জয় দৌড়ে গেল না সাধুটির দিকে। দাঁড়িয়ে রইলো বাড়ির দরজার কাছে।

তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।

সাধুজি অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়নি বটে। কিন্তু হাত দেখার পর সে কিছুই না বলে চলে গেল কেন?

জয়ের হাতে খুব খারাপ কিছু দেখেছে? তাই আর টাকাও চাইলো না!

সাধারণত কী হয়, হাত দেখার পর এইসব লোকেরা বলে, তোমার হাতে এই খারাপ ব্যাপার আছে, ওই বিপদ আছে, তুমি একটা আংটি পরো, মাদুলি নাও কিংবা পুজো দাও, তাতে সব ঠিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ টাকা খরচ করো।

এই সাধু তো তা কিছুই বললো না। তার মানে, জয়ের হাতে এমন কিছু খারাপ ব্যাপার আছে, যা টাকা খরচ করলেও ঠিক হবে না?

তার মানে কি পরীক্ষার রেজাল্ট? কোনো একটা সাবজেক্টে ফেল করলেই একেবারে ফেল। অঙ্কগুলো সব ভুল হয়েছে।

আবার ডেকে উঠলো মেঘ। আকাশ কালো হয়ে গেছে, সত্যি সত্যি বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!

জয়ের চোখে জল এসে গেল। পরীক্ষায় ফেল!

তার মানে সে উচ্চ মাধ্যমিকে আর ভর্তি হতে পারবে না? কলেজ জীবন আরও দূরে সরে গেল?

তার বন্ধুরা, রণজয়, বাপ্পাদিত্য, শৌভিক, অর্জুনরা তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে? অঙ্কের পেপারটা এত খারাপ হয়েছে? অথচ, অঙ্কে সে ভালো, এরপর তার বিজ্ঞান পড়ার কথা।

কিছুক্ষণ একা একা কাঁদলো।

ছোড়দি কলেজ থেকে ফেরার আগেই সে মুছে ফেললো চোখ।

তবু তার মুখখানা ভার হয়ে রইলো। দাদা জিজ্ঞেস করলো, তোর কী হয়েছে রে জয়?

জয় ফ্যাকাশেভাবে বললো, কই কিছু না তো!

হাত-দেখা সাধুর কথা সে কারুকে বলতে পারছে না।

ক্রমশ তার ধারণা হচ্ছে, সাধুটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে ঠিকই।

সে আঙুল তোলামাত্র মেঘ ডেকেছিল।

সে হঠাৎ এলো, হঠাৎ চলে গেল! আগে টাকা চাইছিলো, হাত দেখার পর কিছুই না বলে চলে গেল! এরকম কখনো হয়?

এরপর কয়েকদিন জয় বন্ধুদের ডাকলো না। কোথাও খেলতেও গেল না। মন খারাপ বাড়তেই লাগলো ক্রমশ।

এমনকি একথাও তার মনে হলো, ফেল করার পর আর বেঁচে থেকে লাভ কী? মরে গেলেই তো হয়!

সাধুটা যদি হাত দেখার পর কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে চলে যেত, তা হলেও তবু বোঝা যেত, সে মিথ্যে কথা বলে ঠকিয়ে গেছে। কিন্তু আর কিছু না বলে চলে গেল, তার মানে সে ঠিক ঠিক খারাপ খবরটা জেনে ফেলেছে।

জয়ের রেজাল্ট বেরুলো আটদিন পরে।

ফেল করা তো দূরের কথা, সে স্ট্যান্ড করেছে ন'নম্বরে। স্টার পেয়েছে পাঁচটা বিষয়ে। অঙ্কে একশো'র মধ্যে ছিয়ানব্বই।

বাড়ির সবাই যখন আনন্দ করছে, তখনও মনে মনে গজরাচ্ছে জয়। ওই জোচ্চোর সাধুটাকে এখন হাতের কাছে পেলে এক ঘুঁষিতে নাক ফাটিয়ে দিত।

তখনই জয় বুঝতে পারলো, হাতে একটা আপেল কিংবা সবেদা আনা খুব সহজ ম্যাজিক। কলকাতায় নিয়মিত যাওয়া-আসা থাকলেই কিছুটা বাংলা শেখা যায়। নাগা সাধুর কথা শুনলেই অনেকে সম্ভ্রম করে, আসল না নকল, তা যাচাই করে দেখে না।

হঠাৎ আকাশে বাজের গর্জন আর বিদ্যুৎও অলৌকিক কিছু নয়। এরকম তো হয়ই মাঝে মাঝে। নীল আকাশ, তবু হঠাৎ মেঘে ছেয়ে যায়। সেদিনও তো তারপরে বৃষ্টি পড়েছিল কিছুক্ষণ।

তারপর কেটে গেল তিন বছর। সেই সাধুর কথা ভুলেই গেছে জয়।

উচ্চ মাধ্যমিকেও ভালো রেজাল্ট করে কলেজে ভর্তি হয়েছে জয়।

তার অনেক বন্ধু জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, জয় খুব ভালো ছাত্র হয়েও ঠিক করেছে পিওর সায়েন্স পড়বে। ফিজিক্স। মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি তার খুব ঝোঁক। অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমি। আর হাত দেখা। কুষ্ঠি বিচার ইত্যাদি যাকে বলে অ্যাস্ট্রোলজি, তা সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বন্ধুদের কারুর হাতে আংটি দেখলেই সে ঠাট্টা করে বলে, কী রে, কোনো গুরু ঠাকুর এটা দিয়েছে বুঝি? এই আংটি ধারণ করলে পেট খারাপ ভালো হয়ে যাবে?

কলেজে পড়ে জয়। তাই সে এখন বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার অনুমতি পেয়েছে।

পুজোর ছুটিতে চার বন্ধু ঘুরে এলো কালিম্পঙ।

এক সময় তার বন্ধু বাপ্পাদিত্য বললো, আমার জামাইবাবু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর একটা নিজস্ব লঞ্চ আছে, বেড়াতে যাবি?

চল, আমরা গঙ্গায় মোহনা পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারি। খাওয়া-থাকা সব ফ্রি।

জয় এককথাতেই রাজি। জুটে গেল আরও পাঁচ বন্ধু।

এই সময়েই গঙ্গাসাগর মেলা। আরও অনেক লঞ্চ যাচ্ছে সেদিকে।

এ মেলায় নানা জায়গা থেকে আসে বহু তীর্থযাত্রী। আসে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী। অনেকেই থাকে অস্থায়ী তাঁবুতে। কেউ কেউ খোলা আকাশের নিচেই কয়েকটা দিন আর রাত কাটিয়ে দেয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের অতিথিদের অবশ্য কষ্ট করতে হয় না। তারা লঞ্চেই থাকতে পারে সর্বক্ষণ, কিংবা পাড়েও নিজস্ব বাংলো আছে।

জয় আর তার বন্ধুরা লঞ্চেই রয়ে গেল।

শুধু একবার মেলা দেখতে যায়। ভিড়ের মধ্যে বেশিক্ষণ ভালো না লাগলে ফিরে আসে লঞ্চে।

মেলার মধ্যে হাজার হাজার সাধুর আস্তানা। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ আর মাথার চুলে জটা। বেশির ভাগ সাধুদেরই একই রকম দেখায়।

তবু, এক জায়গায় একজন সাধুকে দেখে চমকে উঠলো জয়।

সন্ধেবেলা ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে একজন সাধু, তাকে ঘিরে গোল হয়ে রয়েছে ষাট-সত্তর জন লোক।

এ সাধুর নাকের ডগায় একটা কালো আঁচিল।

এই কি সেই সাধু? জয়ের মনে হলো, কোনো সন্দেহ নেই, এই সাধুটাই এক দুপুরে তাকে ভয় দেখিয়ে চলে গিয়েছিল।

তখন যে জয় ভেবেছিল, সাধুটাকে আবার কখনো দেখলে তার নাকে একটা ঘুঁষি মারবে, সেই ইচ্ছেটা জেগে উঠলো আবার।

লোকটা তার জীবনের সাত-আটটা দিন নষ্ট করে দিয়েছে। এরজন্য কাঁদতেও হয়েছে জয়কে। আর তার যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হয়েছিল, যদি সে সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়তো মেট্রো রেলের লাইনে?

এত লোকের সামনে ঘুঁষি মারা যায় না।

জয় তার বন্ধুদের বললো। চল, চল, হাত দেখাবি? এই সাধুর কাছে?

বাপ্পাদিত্য বললো, ধুৎ! হাত দেখা আবার কী? যত সব বুজরুকি!

রণজয় বললো, সে কি রে, জয়! তুই বিজ্ঞানের ছাত্র, ওসবও বিশ্বাস করিস নাকি?

জয় বললো, বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। চল না, বেশ মজা হবে!

সাধুটির কাছাকাছি জয় বসে পড়লো তার বন্ধুদের নিয়ে।

অন্য লোকরা হাত দেখাচ্ছে।

জয় লক্ষ্য করলো। সাধুটি কিন্তু কারুর কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছে না। মানে চাইছে না। কেউ কেউ পাশে কিছু দিয়ে যাচ্ছে।

অন্য কয়েকজনকে ঠেলে ঠুলে জয় একেবারে তার সামনে গিয়ে বসলো একটু কাছে।

সাধু তার হাত ধরে বললো। কী জানতে চাস বেটা?

জয় বললো, কিছু না।

পাশ থেকে বাপ্পাদিত্য বললো, এই যে গুরুজি, ভালো করে দেখে দাও! নইলে কিন্তু

সাধু একবার জয়ের দিকে, আর একবার বাপ্পার দিকে তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কেয়া মাঙতা?

জয় বললো, কুছ নেই!

বাপ্পাদিত্য বললো, আমরা যদি তোমাকে কাতুকুতু দিই, তুমি রেগে গিয়ে চোখ দিয়ে আমাদের ভস্ম করে দিতে পারবে?

রণজয় বললো, সাবধান! তোকে কিন্তু ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে!

সাধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জয়ের দিকে।

রণজয় বললো, কী রে, তোকে হিপনোটাইজ করছে নাকি?

জয় বললো, অত সোজা নয়, মনের জোর থাকলে কেউ হিপনোটাইজ করতে পারে না।

তারপর সে সাধুকে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে চিনতে পারেন?

সাধু দু'বার মাথা নাড়লো।

জয় খানিকটা অবাক হয়ে বললো, সত্যি চিনতে পারেন? কোথায়, কবে দেখেছিলেন বলুন তো।

সাধু বললো, তিন বরষ হুয়া, কলকাত্তাকা এক গলিমে, পিলা রঙের কোঠি, দুপহরবেলা...

সাধুটির কোনো অলৌকিক শক্তি থাক বা না থাক, স্মৃতিশক্তি যে খুব ভালো, তা স্বীকার করতেই হবে।

জয় এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, সেদিন আপনি আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন কেন? অ্যাঁ? আমাকে বাচ্চা ছেলে ভেবেছিলেন?

সাধুটি ভুরু তুলে বললো, ভয় দেখায়েছি? নেহি তো। ম্যায় কুছ, নেহি বোলা।

জয় বললো, আমার পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয়নি তখনো। আপনি আমার হাত

দেখছিলেন, হঠাৎ কিছু না বলে চলে গেলেন, তার মানে কী? আমি ফেল করেছি? তাই না?

সাধু প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, নেহি, নেহি, নেহি! কব রেখা দেখনেসে পরীক্ষাকা রেজাল্ট নেহি মিলতা। ওসব তো হানি না দেখেছি।

জয় ধমক দিয়ে বললো, তা হলে কী দেখেছিলেন? পালালেন কেন?

সাধুর মুখখানা এবার ম্লান হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, ম্যায় দেখা, নিশ্চিত দেখা, তুমহার মা তিন মাসের মধ্যে মরে যাবে। এমন খারাপ খবর হামি কিসিকো বলি না। হামার খুব কষ্ট হয়েছিল বেটা। এই দুনিয়ায় জননীই তো সবসে আপন! আহা!

জয় বললো, আপনি দেখেছিলেন আমার মা মারা যাবেন? তিন মাসের মধ্যে?

সাধু মাথা নেড়ে বললো, হা। এতে হামার ভুল হয় না। আহা হা!

জয় বললো, আপনার একশো ভাগ ভুল হয়েছিল। আমি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করেছি। আমার মা-ও দিব্যি বেঁচে আছেন। মা একটা বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়ান। তা ছাড়া ছবি আঁকেন।

সাধু খুবই অবাক হয়ে বললো, মা জিন্দা হ্যায়? আভি তক?

জয় বললো, হ্যাঁ, মা আরও অনেকদিন বাঁচবেন।

সাধু এবার জয়ের মাথায় হাত রেখে বললো, তব তো ঠিক হ্যায়। হামার ভুল।

পাশ থেকে বাপ্পা বললো, কীরে, কী বলছে?

জয় বললো, অনেকদিন আগে আমার হাত দেখে সব ভুলভাল বলেছিল। তারজন্য কটা দিন আমার এমন মন খারাপ ছিল।

রণজয় বললো, বেশ হয়েছিল। কেন হাত দেখাতে গিয়েছিলি? চল, চল, এক্ষুনি বৃষ্টি আসছে মনে হচ্ছে।

ওরা উঠে পড়লো।

জয় যে সাধুকে একটা থাপ্পড় মারবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। অনেক দিন আগেকার পুষে রাখা রাগ আর তেমন তীব্র থাকে না।

যেতে যেতে বাপ্পা জিজ্ঞেস করলো, হাত দেখিয়ে কত টাকা গচ্চা দিয়েছিলি?

জয় বললো, একটা পয়সাও নেয়নি কিন্তু।

পেছনে একটা হৈ হৈ শব্দ শুনে ওরা ফিরে তাকালো।

একদল লোক সেই সাধুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চড় চাপড় মারছে আর বিশ্রী সব গালাগাল দিচ্ছে।

জয় বন্ধুদের বললো, চল তো দেখি কী ব্যাপার!

তারা দৌড়ে ফিরে এলো।

লোকদুটি ঠিক কী কারণে মারছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কিছু একটা মেলেনি, বিয়ে

টিয়ের ব্যাপার...

সাধুটি অসহায়ভাবে দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে মার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

জয় একেবারে কাছে গিয়ে দু'একটা লোককে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, কী হচ্ছে কী? কেন গায়ে হাত তুলছেন?

জয় নিজে এই সাধুকে চড় মারার কথা ভেবেছিল, কিন্তু এখন অন্যরা তাকে মারছে দেখে সে সহ্য করতে পারছে না।

জয়ের দেখাদেখি তার বন্ধুরাও হাত লাগালো, ঠেলতে লাগলো অন্যদের।

আজকাল একসঙ্গে চারজন যুবককে মারমুখী দেখলে সবাই ভয় পায়। সেই লোকগুলিও রণে ভঙ্গ দিয়ে ভয়ে পালালো।

সাধুটি বেশ আহত হয়ে শুয়ে পড়েছে। অন্য অনেক লোক দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না।

জয় বললো, সবাই ধরতো ওঁকে আমাদের লঞ্চে নিয়ে যাই। ওখানে তো ডাক্তার আছে।

চার বন্ধু ধরাধরি করে নিয়ে চললো সাধুটিকে। মনে হয় যেন সে জ্ঞান হারিয়েছে।

রণজয় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, কী রে জয়, তোর হঠাৎ এই বুজরুক সাধুর ওপর দয়া উথলে উঠলো কেন?

জয় বললো, দ্যাখ, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হলো। লোকটি কিন্তু ইচ্ছে করে মানুষকে পয়সা নিয়ে ঠকায় না। ওর যা বিশ্বাস তাই বলে। হাত দেখে যে মায়ের মৃত্যু কিংবা কারুর বিয়ে ঠিক করার ব্যাপার বলা যায় না, সেটাই উনি জানেন না। বিশ্বাসটাই ভুল। কিন্তু মানুষটা খারাপ নয়। তা ছাড়া, ভণ্ড সাধু হোক বা হাত দেখা বুজরুকি করুক, তবু মানুষ তো! বিপদে পড়লে একটা মানুষকে আমরা সাহায্য করবো না?

একটা চিঠি আর সাদা পাখি

প্রিয়ব্রত টেবিলে বসে টেলিফোনে কথা বলছিলেন, এই সময় বাড়ির কাজের ছেলেটি একটা চিঠি দিয়ে গেল। লম্বা খামের চিঠি ডাকে এসেছে।

কথা বলতে বলতেই তিনি খামটা ছিঁড়লেন। প্রায় তিন পাতা হাতের লেখা, বাংলায়। প্রিয়ব্রত শেষের নামটা আগে দেখে নিলেন। অরুণ! তাঁর স্কুলের বন্ধু, অনেকদিন দেখা হয় না। সে তো অনেক বছর ধরে আফ্রিকার নাইরোবিতে থাকে। দেশে ফিরে এসেছে নাকি?

ফোনটা জরুরি, দিল্লি থেকে সরকারের একজন বড় অফিসার তাঁকে কিছু নির্দেশ দিলেন। এখন চিঠিটা পড়া যাবে না।

টেবিলের ওপরে রাখলেন। সেটা হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে লাগল। চাপা দেবার কিছু নেই, তাই তিনি চিঠিটা আবার তুলে রাখলেন পাশে একটা বইয়ের ভাঁজে।

টেলিফোনে কথা বললেন প্রায় আধঘণ্টা ধরে।

তারপরেই কাজের ছেলেটি এসে খবর দিল বাইরে থেকে তাঁর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

ইনি একজন কলেজের প্রফেসার। বিকেল চারটেয় একটা মিটিং-এ প্রিয়ব্রতের যাবার কথা। ইনি নিতে এসেছেন। ওঃ, তাই তো! মিটিংটার কথা প্রিয়ব্রতর মনেই ছিল না। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

মিটিং চলল প্রায় আটটা অবধি। তখন খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, বেরুনো যায় না। বাড়ি ফিরতে দশটা বেজে গেল।

খেতে বসে প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল তাঁর অনেক দিনের বন্ধু অরুণ এতদিন পরে চিঠি লিখেছে, সেটা তো পড়া হয়নি।

কোথায় যেন রেখেছিলেন চিঠিটা? টেবিলের ওপরে নেই। কোনো ড্রয়ারে?

একটুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর মনে এসে গেল, চিঠিটা তো তিনি একটা বইয়ের ভাঁজে রেখে দিয়েছিলেন। কী বই যেন?

টেবিলের ওপর সব সময় তিন-চারখানা বই থাকে। সেগুলো মাঝে মাঝে বদলে যায়।

টেবিলের ওপর রাখা বইগুলোর পাতা উল্টে উল্টে দেখলেন। কোনোটায় চিঠিটা নেই। তবে গেল কোথায়?

একটু চিন্তা করতেই আবার মনে পড়ল। বইটা রবীন্দ্রনাথের 'গল্প-গুচ্ছ'। সে বইটা টেবিলের ওপর দেখা গেল না।

বাড়িতে শুধু তিনি আর তাঁর স্ত্রী মানসী। কাজের ছেলেটি রাত ন'টার পর বাড়ি চলে যায়।

প্রিয়ব্রত তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানসী, তুমি কি গল্প-গুচ্ছ বইটা টেবিল থেকে সরিয়েছ?'

মানসী বললেন, 'নাতো, তোমার বই সরাতে যাব কেন?'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'বইটা দেখতে পাচ্ছি না।'

মানসী বললেন, 'কী বই বললে? গল্প গুচ্ছ? ওঃ হো, আজ বিকেলে আমার ছোট বোন সুজাতা এসেছিল। সুজাতা বলল, অনেক দিন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি পড়িনি, খুব ভালো লাগে আমার। দিদি, এই বইটা দু'-তিন দিনের জন্য নিয়ে যাব?'

'আমি বললুম নে।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তুমি দিয়ে দিলে? আমাকে না জিজ্ঞেস করে?'

মানসী বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? গল্পগুচ্ছ তুমি হাজার বার পড়েছ।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তবু আমার যখন তখন কাজে লাগে। তাছাড়া ওই বইয়ের মধ্যে আমার একটা খুব দরকারি চিঠি ছিল।'

মানসী বললেন, 'সে কথা আমাকে বলে যাওনি কেন?'

প্রায় ঝগড়া লেগে যাচ্ছিল—প্রিয়ব্রত অতি কষ্টে নিজেকে শান্ত করলেন। সকালবেলা উঠেই প্রিয়ব্রত মানসীকে বললেন 'এক্ষুনি সুজাতাকে ফোন কর। বইটা ফেরত দিয়ে যাক। অন্তত তার ভেতরের চিঠিটা।'

কয়েকবার চেষ্টা করবার পর মানসী বললেন, 'এই রে, সুজাতা তো কালই বলেছিল ওদের বাড়ির ফোন কয়েকদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে।'

প্রিয়ব্রত আবার রাগ চেপে রাখলেন।

সুজাতারা থাকে পার্ক সার্কাসে।

সকালবেলায় কিছু জরুরি কাজ সেরে প্রিয়ব্রত বেরিয়ে পড়লেন, একটা বাস ধরে চলে এলেন সুজাতাদের বাড়ি।

সুজাতা আর তার স্বামী সোমনাথ দু'জনেই অফিসে চাকরি করে। সোমনাথ বেরিয়ে যায়, সুজাতা এখন তৈরি হচ্ছে।

প্রিয়ব্রতর কথা শুনে সুজাতা জিভ কেটে বললেন, 'এই রে, বইটা খুব দরকার বুঝি! কী হয়েছে জানেন, কাল আমি রাত জেগে বইটা পড়ছিলুম, সোমনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কী বই?' তারপর কেড়ে নিতে চাইল আমার কাছ থেকে। এখন তো রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প নিয়ে টিভি সিরিয়াল হচ্ছে, তাই ও গল্পগুলো একবার পড়ে নিতে চায়। মিলিয়ে দেখবে। আজ আমাকে কিছু না বলে বইটা নিয়ে অফিসে চলে

গেছে।'

প্রিয়ব্রত মনে মনে বললেন, রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ার যদি এত শখ থাকে তো একটা বই কিনে নেয় না কেন? এমন তো কিছু দাম না। মুখে বললেন, 'সোমনাথ অফিস থেকে কখন ফেরে?'

সুজাতা বলল, 'বেশ দেরি হয়। সাতটা-সাড়ে সাতটা হয়ে যায়।'

প্রিয়ব্রত সে বাড়িতে ফিরে এলেন আটটার সময়। সোমনাথ ফিরে এসে চা খাচ্ছে।

সে বললে, 'প্রিয়দা, আপনি নাকি বইটার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে গেছেন। আমার অনেকগুলো গল্প পড়া হয়ে গেছে। আর দু'-দিন রাখতে পারি না?'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'ঠিক আছে রাখ, বইটার মধ্যে একটা চিঠি আছে সেটা আমার দরকার।'

সোমনাথ বললেন, 'চিঠি? আমি কোনো চিঠি দেখিনি তো!'

ভেতর থেকে সে বইটা নিয়ে এল। সব পাতা উল্টে নেড়ে চেড়ে দেখা হল, বইয়ের মধ্যে কোনো চিঠি নেই।

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তোমার অফিস যাবার পথে চিঠিটা কোথাও পড়ে যায়নি তো?'

সুজাতা বলল, 'আমিও তো কোনো চিঠি দেখিনি।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'তোমাদের বিছানায় বা খাটের নীচে একটু খুঁজে দেখবে!'

সব খুঁজে দেখা হল! কোথাও নেই সেই চিঠি।

সুজাতা বলল, 'দরকারি চিঠি বইয়ের মধ্যে রাখেন কেন? ভারি বাজে অভ্যেস। যেখানে সেখানে তো পড়ে যেতে পারে।

প্রিয়ব্রত বললেন, 'সব দোষ আমারই।'

বাড়িতে ফিরে তিনি বারান্দায় চুপ করে বসে রইলেন। খুব মনটা খারাপ লাগছে।

অরুণ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সঙ্গে পড়াশুনো করেছে। এক সঙ্গে বেড়াতে গেছে কত জায়গায়। শুধু একবার কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। তারপর অরুণ আফ্রিকায় চলে গেল। সেখান থেকে আর চিঠি লেখেনি। এতদিন যোগাযোগও ছিল না।

এতদিন পরে অরুণ ফিরে এসেছে। চিঠি লিখেছে নিজের থেকে। সে চিঠির সবটা পড়াও হয়নি প্রিয়ব্রতর। সে চিঠিতে নিশ্চয়ই অরুণের ঠিকানা-ফোন নম্বর সব ছিল। কী করে প্রিয়ব্রত উত্তর দেবেন!

উত্তর না দিলে অরুণ ভাববে প্রিয়ব্রত এখনো রাগ করে আছে।

প্রিয়ব্রত ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন, 'চিঠি ফিরে এসো। চিঠি তুমি কোথায়? কোথায় তুমি পড়ে আছ বলো, আমি সেখান থেকে তোমাকে তুলে আনব। চিঠি চিঠি আমাকে দয়া কর!'

কিন্তু এভাবে বললেই কি চিঠি ফিরে আসবে নাকি। চিঠির কি প্রাণ আছে যে মানুষের কথা শুনবে! কিছু হল না, রাত বেড়ে গেল।

এরপর ঘুমের মধ্যে প্রিয়ব্রত একটা স্বপ্ন দেখলেন—আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। উড়তে উড়তে গোল হয়ে ঘুরছে। তারপর সবগুলোর মধ্যে থেকে একটা পাখি আলাদা হয়ে গেল। সেটা একা উড়তে লাগল অন্যদিকে।

পাখিটা সাদা ধপ্‌ধপে। ঘুঘু কিংবা পায়রার থেকে একটু বড়। সেটা উড়ছে একটা রাস্তার মাঝখান দিয়ে, দু' দিকে বাড়ি।

প্রিয়ব্রত স্বপ্নের মধ্যে ভাবলেন, এটা কোন রাস্তা? ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

এক সময় পাখিটা একটা বাড়ির তিনতলার বারান্দায় বসল। প্রিয়ব্রত দেখলেন সে বাড়ির একতলায় একটা বেশ বড় ওষুধের দোকান। সাইনবোর্ডে লেখা 'বেঙ্গল ফার্মেসি'।

তারপরই স্বপ্নটা ভেঙে গেল। সকালবেলা উঠে স্বপ্নের সব মনে পড়ে গেল। প্রিয়ব্রত ভাবলেন এ স্বপ্নের মানে কী?

তাঁদের পাড়াতেই একটা বেঙ্গল ফার্মেসি ওষুধের দোকান আছে। কিন্তু পাখিটা যে বাড়িতে বসেছিল, এ বাড়িটা সে রকম দেখতে নয়।

তিনি সেই ওষুধের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের আর কোনো দোকান আছে কলকাতায়?'

তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আরও দুটো দোকান আছে। একটা নিউ আলিপুরে আর একটা সি. আই. টি. রোডে।' তারা ঠিকানা দিয়ে দিল।

প্রিয়ব্রত প্রথম গেলেন নিউ আলিপুরে। সে বাড়ির একতলা ওই স্বপ্নের বাড়িটা নয়।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলেন সি. আই. টি. রোডে। নম্বর খুঁজে পেয়ে দেখলেন একতলায় ওষুধের দোকান আর তিনতলায় একটা বারান্দা আছে।

তিনি ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়াতেই একটা ছেলে বলল, 'কাকু, আপনি এসেছেন? বাবা কাল থেকে বারবার আপনার কথা বলছেন। বাবার খুব অসুখ।'

ছেলেটির সঙ্গে প্রিয়ব্রত খুব তাড়াতাড়ি উঠে এলেন তিনতলায়।

একটা খাটে শুয়ে আছে অরুণ। চোখ দুটো একেবারে গর্তে বসে গেছে। চেহারাও খুব রোগা।

প্রিয়ব্রত তাঁর শিয়রের কাছে বসে একটা হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে।

অরুণ বললেন, 'প্রিয় তুই এসেছিস? আমি চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি পেয়েও তুই না এলে আমি ভাবতাম তুই এখনো আমার ওপর রাগ করে আছিস! আমি বাঁচব না। মরার আগেও আমার এই দুঃখ থেকে যেত! সেই যে ঝগড়া হয়েছিল, সে দোষ ছিল আমারই।'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'আমি রাগ করে থাকব কেন? তোর দোষ নয়, দোষ ছিল আমার। কিন্তু এতদিন তোর ঠিকানা জানতাম না। তুই মরবি না মোটেই। তুই আরও অনেক দিন বাঁচবি।'

অরুণ ফ্যাকাসে হেসে বললেন, 'আমি বাঁচব? তুই কী করে জানলি? তুই কি ডাক্তার?'

প্রিয়ব্রত বললেন, 'না, কিন্তু আমাকে একটা পাখি বলেছে, তোর সঙ্গে আমার দেখা হলেই আমরা দু'জনেই আরও অনেক দিন বাঁচব!'

ম্যাজিশিয়ানের পায়রা

ম্যাজিশিয়ান বাবলু রায়, প্রথমে মাথা থেকে টুপিটা খুলে দেখালেন। টুপির মধ্যে কিছু নেই। তাঁর মাথাতে শুধু চুল। তিনি টুপিটা হাতে নিয়ে এক পাক ঘুরে গেলেন। তাঁর গায়ে লাল আর কালো রঙের ডোরাকাটা আলখাল্লা। সেই আলখাল্লাটা দুলিয়ে আরও এক পাক ঘুরতে ঘুরতে তিনি বললেন, এই বার! এই বার দেখুন, বাবলু রায়ের নতুন খেলা!

ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে পাড়ার পার্কে। এই পার্কের মধ্যে আছে মিলন সঙ্ঘ নামে ক্লাব। সেই ক্লাবঘরের সামনে একটা ছোট মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। পেছনে শুধু একটা কালো রঙের পর্দা। এর আগে বাবলু রায় তাসের ম্যাজিক, দড়ি কেটে দু'টুকরো করে আবার জোড়া লাগানোর ম্যাজিক আর ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার খেলা দেখিয়েছেন। এবারে হবে তাঁর শেষ খেলা।

বাবলু রায় টুপিটা আবার মাথায় পরলেন। দু'হাত তুলে গানের মতো সুর করে বললেন, আয়, আয়, আয়। দুধ খাওয়াব, মধু খাওয়াব, পায়েস খাওয়াব। আয়, আয়, আয়।

তারপর আলখাল্লাটা দুলিয়ে আবার একবার ঘুরলেন। আর মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেললেন ঝট করে।

তাঁর মাথায় একটা পায়রা বসে আছে!

পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে রুকু একেবারে সামনে বসে আছে। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। আপন মনে বলল, পায়রাটা কী করে এল?

সে কথা শুনতে পেয়ে বাবলু রায় মুচকি হেসে বললেন, সেইটাই তো ম্যাজিক!

রুকু এবার জোরে বলল, ওটা কি সত্যিকারের পায়রা? পায়রাটা বাবলু রায়ের মাথার ওপর চুপ করে বসে আছে। বাবলু রায় বললেন, দেখবে, সত্যি কি না! তোমাদের চোখের সামনে উড়তে উড়তে এল তোমরা দেখতে পাওনি!

তিনি মাথা থেকে পায়রাটাকে ধরে নিয়ে এলেন সামনে। তারপর তাকে একটা চুমো দিয়ে বললেন, যা, এখন আকাশে যা! পরে আমার বাড়িতে আসবি, তোকে অনেক কিছু খেতে দেব!

বাবলু রায় পায়রাটাকে উড়িয়ে দিলেন। সেটা ঝটপট করে কয়েকবার ঘুরপাক খেল দর্শকদের মাথার ওপরে। তারপর সাঁ করে চলে গেল উঁচুতে।

সব দর্শকরা হাততালি দিল খুব জোরে।

সবাই স্বীকার করল, এটা খুব দারুণ ম্যাজিক।

রুকু কিছুতেই বুঝতে পারছে না টুপির মধ্যে পায়রাটা এল কী করে? আগে তো টুপিটা খালি ছিল। মাথার চুলের মধ্যেও অতবড় পায়রাটা লুকিয়ে থাকতে পারে না!

বাড়িতে এসে মাকে বলল সব।

মা বললেন, কী করে হয়, তা বুঝতে পারা যায় না বলেই তো ম্যাজিক বলে। ম্যাজিশিয়ানদের নানারকম কায়দা থাকে। ওসব অনেক দিন ধরে শিখতে হয়।

মা-ও স্বীকার করলেন, টুপি থেকে পায়রা বার করা খুব আশ্চর্য নয়। ম্যাজিশিয়ানরা টুপি থেকে অনেক কিছু বার করতে পারে। কিন্তু মাথার ওপরে পায়রাটার চুপ করে বসে থাকাটা সত্যি অবাক হবার মতন। নিশ্চয়ই পায়রাটাকে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং দিয়েছে।

এক একটা ঘটনা কিছুতেই ভোলা যায় না। অনবরত মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। বাবলু রায়ের মাথার ওপর চুপ করে বসে থাকা পায়রাটাকে সে যখন তখন মনে মনে দেখতে পায়।

দু'দিন বাদে রুকু পায়রাটাকে সত্যি সত্যি আবার দেখতে পেল।

রুকুদের বারাসাত নিউ মডেল স্কুল বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। অনেক ছেলেমেয়ে অবশ্য ভ্যান-রিকশায় আসে। রুকু হেঁটেই চলে যায়। ক্লাস ফাইভের আরও একটি ছেলে হেঁটে আসে। সে থাকে আরও দূরে। সেই দীপু তাকে রোজ ডেকে নিয়ে যায়।

দু'দিন ধরে দীপুর জ্বর। সে আসছে না। রুকু একাই স্কুলে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখল একটা বন্ধ দোকানঘরের ওপরে একটা পায়রা বসে আছে।

রুকু থমকে দাঁড়িয়ে সেই পায়রাটাকে দেখতে লাগল। এইটাই সেই বাবলু রায়ের ম্যাজিকের পায়রাটা নয়? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে!

পায়রাটাও যেন রুকুকে চিনতে পেরেছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পাশ দিয়ে একটা ভ্যান-রিকশা যাচ্ছে। সেখান থেকে রুকুর আর এক বন্ধু বিবো চেঁচিয়ে বলল, এই রুকু, ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? স্কুলের দেরি হয়ে যাবে না।?

রুকু বলল, আমি ভ্যাবাগঙ্গারাম, আর তুই কী রে? তুই ঘণ্টেশ্বর!

বিবো বলল, তুই হিজবিজবিজ।

রুকু বলল, তুই কাকেশ্বর কুচকুচে!

রিকশা-ভ্যানটা চলে গেল দূরে।

রুকু আবার এদিকে তাকাতেই দেখল, পায়রাটা নেই। এর মধ্যে উড়ে গেল? নাকি অদৃশ্য হয়ে গেল?

বাড়ি ফিরে উত্তেজিতভাবে সে বলল, মা, মা, আমি সেই পায়রাটাকে আজ দেখতে পেয়েছি!

মা এর মধ্যে ভুলে গেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ পায়রা?

রুকু বলল, ম্যাজিশিয়ানের টুপির পায়রা!

মা হেসে ফেলে বললেন, পায়রা আবার চেনা যায় নাকি? বেশিরভাগ পায়রাই তো দেখতে একরকম!

রুকু বলল, না, এই পায়রাটা একেবারে ধপধপে সাদা। শুধু মাথার কাছে একটা কালো টিপ।

মা বললেন, ওরকম পায়রাও আরও অনেক থাকতে পারে।

রুকু জিজ্ঞেস করল, মা, সেদিন যে ম্যাজিশিয়ান ওই পায়রাটা উড়িয়ে দিলেন, অন্য কোনো জায়গায় যদি ওই ম্যাজিকটা কেউ দেখাতে বলে, তখন পায়রা পাবেন কোথায়?

মা বললেন, তা আমি কী করে জানব? আমি কি ম্যাজিশিয়ান! নে, হাত-মুখ ধুয়ে নে!

রুকু বলল, মা, আমি ম্যাজিক শিখব!

মা বললেন, এখন তো পড়াশুনো করো ভালো করে। বড় হয়ে যদি ইচ্ছে হয় শিখবে!

পরের দিন রুকু আবার দেখতে পেল পায়রাটাকে। আজ স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফেরার পথে। আজও দীপু আসেনি। সে একা হাঁটছে।

পায়রাটা বসে আছে একই জায়গায়।

এখানে একটা ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান ছিল, কেন যেন অনেক দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। সেই দোকানের টিনের চালে বসেছে পায়রাটা।

রুকুর আজ দৃঢ় ধারণা হল, এটা নিশ্চয়ই সেই ম্যাজিকের পায়রা। তার দিকেই চেয়ে আছে।

একবার সেটা বুকুম বুকুম করে ডেকে উঠল।

পায়রাটা রুকুকে কিছু বলতে চাইছে নাকি? এই রে, রুকু তো পায়রাদের ভাষা জানে না!

রুকু আর একটু এগিয়ে গেল। পায়রাটা উড়ে গেল না।

রুকু ভাবল, ওকে কি ধরে ফেলা যাবে?

সে হাত বাড়াতেই কিন্তু পায়রাটা ঝটপট করে উড়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর গেল না। রাস্তার ধারে একটা পাঁচিলের ওপর বসল।

সেখানে বসে পায়রাটা ডাকল, বুকুম বুকুম!

রুকু শুনল, পায়রাটা যেন তার নাম ধরে ডাকছে, রুকু, রুকু।

রুকু বলল, কী বললে তুমি? তুমি কি মানুষের ভাষা জানো? আমার নাম জানলে কী করে?

সে পাঁচিলের দিকে এগোতেই পায়রাটা আবার ডানা মেলল।

এরপর একটা কাণ্ড হল বটে।

রুকু কাছে যেতেই পায়রাটা উড়ে যায়, কিন্তু বেশি দূরে যায় না। কাছাকাছি কোথাও বসে। রুকু আবার এগিয়ে যায়।

বাড়ি ফেরার কথা ভুলেই গেল রুকু। পায়রাটার সঙ্গে সঙ্গে সে যেতে লাগল। বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায়, তারপর একটা ছোট মাঠ। তারপর একটা বাগানবাড়ি। পায়রাটা শেষ পর্যন্ত চলে গেল সেই বাড়ির ছাদের দিকে।

পুরোনো আমলের বাড়ি। ছাদে এক এক জায়গায় বট গাছ গজিয়ে গেছে। একদিকের একটা বারান্দা হেলে পড়েছে অনেকটা ভেঙে।

সদর দরজাটা হাট করে খোলা।

রুকু সেই দরজার ধারে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল ভেতরের দিকে। সেখানে একটা উঠোন। মাঝখানে খাটিয়ায় বসে আছেন একজন মাঝবয়েসি লোক। লুঙ্গিপরা, খালি গা, বুকে অনেক লোম।

তার সামনে অনেকগুলো পায়রা হুটোপাটি করছে। সেই লোকটি ছোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছেন পায়রাদের।

রুকু সরে আসার আগেই লোকটি দেখে ফেললেন তাকে।

তিনি বললেন, কী খোকা, কী চাইছ? এসো, এসো, ভেতরে চলে এসো—

লোকটির ব্যবহারে হাসিখুশির ভাব আছে। তাই রুকু ভয় পেল না। পায়ে পায়ে এসে সে খাটিয়ার কাছে দাঁড়াল। এই পায়রাগুলোর মধ্যে রয়েছে সেই মাথার কাছে টিপ দেওয়া সাদা পায়রাটাও। খেতে খেতেই সে একবার রুকুর দিকে তাকাল।

লুঙ্গিপরা লোকটি জিজ্ঞেস করল, পায়রা কিনবে? টাকা এনেছ?

রুকু ভাবল, একটা পায়রা কিনে নিয়ে পুষলে তো মন্দ হয় না?

সে পকেটে হাত দিয়ে বলল, দু' টাকা!

লোকটি হো-হো করে হেসে বলল, দু'টাকায় পায়রা কেন, একটা ফড়িংও কেনা যায় না! অন্তত একশো টাকা লাগবে। আমার এখানে সব এক নম্বর পায়রা। আর মা-বাবাকে জিজ্ঞেস না করে যেন কক্ষনো কিনো না!

এই সময় দরজার বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে এলেন একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোক।

তিনি বললেন, আদাব, কেমন আছেন ফারুখ সাহেব?

লুঙ্গিপরা লোকটি বললেন, আদাব, আদাব! আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই আছি। আসুন, বসুন!

রুকু আগে তো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটিকে চিনতে পারেনি। গলার আওয়াজ শুনে ঠিক চিনল। ইনি তো সেই ম্যাজিশিয়ান বাবলু রায়। সেদিন প্যান্ট আর আলখাল্লা পরে ছিলেন, মাথায় টুপি।

ফারুখ সাহেব রুকুকে বললেন, তা হলে তুমি এখন এসো খোকা!

বাবলু রায় বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। মিলন সঙ্ঘের মাঠে তুমি ছিলে না? কী যেন জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে। তুমি এখানে এলে কী করে?

রুকু খুব সরলভাবে বলল, ওই পায়রাটা আমাকে ডেকে এনেছে।

কালো টিপ পায়রাটা ডেকে উঠল, বুকুম বুকুম!

রুকুর কথা শুনে বাবলু রায় একটুও অবাক হলেন না। তিনি বললেন, কে, কুলসম? তুমি বুঝি ওর কথা খুব ভাবছিলে? ও ঠিক বুঝতে পারে।

ফারুখ সাহেব বললেন, কেউ যদি ওর কথা খুব ভাবে, তা হলে ও তাকে এখানে ডেকে আনে। তার সঙ্গে ভাব করতে চায়। কুলসম খুব দুষ্টু।

বাবলু রায় বললেন, এখানে যে-কটা পায়রা দেখছ তারা সবাই কিন্তু পায়রা নয়। তোমার বয়েসি কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে। তারা মাঝে মাঝে পায়রা হয়, আবার অন্য সময় মানুষ হয়ে যায়।

ফারুখ সাহেব বললেন, ঠিক ঠিক!

রুকু মনে মনে ভাবল, তাকে ছেলেমানুষ পেয়ে এরা মজা করছে। কিন্তু সে মোটেই অত ছেলেমানুষ নয়। মানুষ আবার পায়রা হতে পারি নাকি? কক্ষনো তা হয় না।

ঠিক যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরে বাবলু রায় বললেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দ্যাখো তবে!

তিনি কালো টিপ পরা সাদা পায়রাটাকে ধরে ফেলে জোরে উড়িয়ে দিলেন একটা অন্ধকার ঘরের দিকে। পায়রাটা সেখানে ঢুকে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেদিক থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। ফরসা রং, হলদে ফ্রক পরা, কপালে একটা টিপ।

মেয়েটা হাসছে।

বাবলু রায় বললেন, এর নাম কুলসম। তোমার নাম কী?

রুকু বলল, আমার নাম হীরক মিত্র। কিন্তু আমি জানি ও মোটেই পায়রা ছিল না। একে বলে কাকতালীয়।

বাবলু রায় বললেন, তার মানে?

রুকু বলল, এ কথাটার মানে আমি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। ঘরের মধ্যে একটা পায়রা ঢুকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, তার মানে পায়রাটাই মেয়ে হয়নি!

কুলসম বলল, ছেলেটা তো বেশ পাকা। বড়দের মতন কথা বলে!

ফারুখ সাহেব বললেন, খোকাবাবু, শোনো, আমাদের এই রায়বাবু খুব মস্ত বড় জাদুকর। ইনি ইচ্ছে করলে তোমাকেও পায়রা বানিয়ে দিতে পারেন।

রুকু বলল, দিন তো দেখি!

বাবলু রায় বললেন, এর দেখছি সহজে বিশ্বাস হবে না! কুলসম, তা হলে ওকে পায়রা বানিয়ে দেওয়া যাক, কি বলো?

তিনি রুকুর মুখের কাছে দুটো হাত নাড়তে নাড়তে শিস দিতে লাগলেন। খুব মিষ্টি সেই সুর।

একটু পরেই রুকুর বইয়ের ব্যাগটা খসে পড়ে গেল, গায়ে গজাতে লাগল পালক। সে পায়রা হয়ে গেল।

বাবলু রায় বললেন, যাও, একটু আকাশে উড়ে এসো। ভয় পেও না।

রুকু উঠে গেল ওপরে। উঠোন থেকে ছাদ পেরিয়ে খোলা আকাশে। আর, কী হালকা লাগছে শরীরটা! শরীর মানে মানুষের শরীর নয়, পায়রার।

এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। সে ভাবল, সত্যি আমি পায়রা হয়ে গেছি? আমি আকাশে উড়ছি?

কে যেন তার কানে ফিসফিস করে বলল, সত্যি তুমি পায়রা হয়ে গেছ, সত্যি তুমি আকাশে উড়ছ।

কে বলল? এখানে তো কেউ নেই। শুধু হাওয়া।

রুকু আবার ভাবল, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

নিজের গায়ে সে চিমটি কাটতে গেল।

কিন্তু চিমটি কাটবে কী করে? তার তো হাতই নেই। তার বদলে রয়েছে দুটো ডানা।

বাতাসে উড়তে দারুণ ভালো লাগছে। জলে সাঁতার কাটতে যা পরিশ্রম হয়, বাতাসে ভাসতে তাও নেই। হাওয়াতেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নীচের বাড়িগুলো কী ছোট ছোট দেখাচ্ছে! রাস্তা দিয়ে কত মানুষ যাচ্ছে। সব যেন পুতুল! আর গাড়িগুলোও খেলনাগাড়ি। এখানে যে এত পুকুর আছে তাও তো জানত না রুকু।

দেখা যাচ্ছে রেল স্টেশন। ওই যে লেভেল ক্রসিং-এ থেমে আছে কত কত লরি আর বাস। একটা ট্রেন চলে এল। ঠিক যেন একটা কেন্নো।

নিজেদের স্কুলটাও চিনতে পারল রুকু। তারপর বারাসাতের টেলিফোন অফিস। দূরে দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্ট। দারুণ আওয়াজ করে নামছে একটা প্লেন। ওরে বাবারে! ওই প্লেনে ধাক্কা খেলেই রুকু টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

রুকু অনেকটা নীচে নেমে এল।

কোথাও এবার একটু বসলে হয়। একটা তালগাছ সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারছে আকাশে। ওই তালগাছের ডগায় বসা যায়।

সেদিকে খানিকটা এগোতেই একটা কাণ্ড হল।

তালগাছের বড় বড় পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আর একটা পাখি। পায়রার চেয়ে অনেক বড়। চিল কিংবা বাজপাখি। সেটা যে রুকুর দিকেই তেড়ে আসছে! দারুণ হিংস্র চোখ।

রুকু তার মায়ের কাছে শুনেছে, অনেক বড় বড় পাখি ছোট পাখিদের মেরে ফেলে। সেই জন্যই চড়াইরা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

চিলের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তো পায়রারা হেরে যাবে। চিল উড়তেও পারে অনেক জোরে।

রুকু নীচের দিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামার চেষ্টা করল। কিন্তু চিলটা তেড়ে আসছে। খুব কাছে এসে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে ওর ধারালো নোখ আর ঠোঁট। ঠিক যেন একটা যমদূত।

রুকু ভাবল, আর তার বাঁচার আশা নেই।

তখনই তার কানে বাতাসের ফিসফিসানি শোনা গেল, হ্যাঁ, তুমি বাঁচবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে।

কোথা থেকে রুকু আর চিলটার মাঝখানে চলে এল একটা ঘুড়ি। সেই ঘুড়িটা তরতর করে রুকুকে টেনে আনতে লাগল নীচের দিকে।

চিলটা তবু তেড়ে আসে। মাঝে মাঝে ঠোক্কর মারে ঘুড়িটায়।

একটু পরে রুকু দেখতে পেল, একটা উঁচু বাড়ির ছাদের পাঁচিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন বাবলু রায়। এখন তাঁর পোশাক ম্যাজিশিয়ানের মতন। সেই লাল-কালো আলখাল্লাটা পরা, মাথায় লম্বা টুপি।

বাবলু রায় ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেই মাথার টুপিটা খুললেন। রুকু এসে পড়ল তাঁর চুলের ওপর। বাবলু রায় এবার টুপিটা দিয়ে চাপা দিলেন রুকুকে।

চিলটাও চলে এসেছে ঘুড়ির পিঠোপিঠি। বাবলু রায় হাত বাড়িয়ে চিলটাকেও ধরে ফেললেন। তারপর তাকে বললেন, কী রে, তুই বড় দুষ্ট হয়েছিস। আমার পায়রাদের তুই ধরতে আসিস কোন্ সাহসে? দেব নাকি ঘুম পাড়িয়ে।

তারপর টুপিটা তুলে বললেন, এসো হীরককুমার নেমে এসো। কোনো ভয় নেই।

রুকু চোখ মেলে দেখল সে শুয়ে আছে খাটিয়ার ওপরে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে কুলসম নামের সেই মেয়েটি।

রুকু ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই না?

কুলসম খিলখিল করে হেসে উঠল।

বাবলু রায় বললেন, তোমার আকাশে উড়তে ভালো লেগেছে কিনা বলো?

রুকু বলল, ভালো লেগেছে। খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু মানুষ কি আকাশে উড়তে পারে? মানুষ পায়রাও হতে পারে না। বলুন না, স্বপ্ন দেখছিলাম নিশ্চয়ই?

বাবলু রায় বললেন, স্বপ্ন ঠিক নয়। একেই বলে ম্যাজিক। তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমার মা-বাবা চিন্তা করবেন। একা একা ফিরতে পারবে তো?

রুকু খাটিয়া থেকে নামতে নামতে বলল, পারব!

তারপরই সে আবার দারুণ চমকে উঠল।

ফারুক সাহেবের এক হাতের ওপরে বসে আছে একটা চিল। তার চোখ বোজা। ঠিক যেন ঘুমোচ্ছে। রুকু এত কাছ থেকে চিল কখনও দেখেনি। তাও ঘুমন্ত! তাহলে কি এই চিলটাই তাকে তাড়া করে এসেছিল? তবে কি সত্যি আকাশে উড়েছে?

তবু অবিশ্বাসের সঙ্গে সে জিজ্ঞেস করল, এই চিলটা এখানে কী করে এল?

ফারুক সাহেব বললেন, খোকাবাবু, এসব ম্যাজিকের কথা তো বুঝিয়ে বলা যায় না। ম্যাজিক হচ্ছে ম্যাজিক।

রুকুর ধারণা হল সারা জীবনেও সে এই রহস্যের উত্তর খুঁজে পাবে না।

বটুকদাদার পাখি

আমাদের বটুকদাদা পাখিদের দিয়ে কথা বলাতে পারতেন।

পাখিরা যে সত্যি মানুষের মতো কথা বলতে পারে তা আমি নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। রূপকথায় শুক-সারী আর ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প পড়েছি। কিন্তু রূপকথা তো রূপকথাই। পক্ষিরাজ ঘোড়া, মাছের পেটে মানুষ, আর মানুষখেকো দৈত্য যে সত্যি সত্যি কোথাও নেই, আমরা ছোটবেলাতেই বুঝে গিয়েছিলুম। সেইরকমই জানতুম যে কথাবলা পাখির কথা, এমনিই কথার কথা।

কিন্তু বটুকদাদা আমাদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

বটুকদাদা অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে হঠাৎ এক একদিন উপস্থিত হতেন আমাদের বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাথাভর্তি গল্প আর ঝোলাভর্তি খুচরো পয়সা। একবার তিনি নিয়ে এলেন একটা পাখি। খাঁচায় বন্দি করে নয়, পায়ে শিকল বেঁধেও নয়। পাখিটা বসেছিল বটুকদাদার কাঁধে।

সেটা যে ঠিক কী পাখি তা চেনা গেল না। দেখতে অনেকটা বেশ বড় সড় ঘুঘু পাখির মতো, কিন্তু গায়ের রং সবুজ। সেটাকে টিয়া পাখিও বলা যাবে না। কারণ টিয়া পাখির মতো লাল ঠোঁট নেই। অথচ সবুজ রঙের ঘুঘু পাখিও তো আমরা কখনও দেখিনি।

বটুকদাদা বললেন, ওটা একটা পাহাড়ি পাখি। কি করে যেন একা এদিকে চলে এসেছে। আমি নৌকো করে আসছিলুম। পাখিটা প্রথমে উড়ে এসে ছই-এর ওপর বসল। আমি আদর করে ডাকলুম, আয় আয়, কাছে আয়। কয়েকবার ডাকতেই আমার কাঁধের ওপর এসে বসল। আমার চোখ দেখে ঠিক বুঝেছিল। আমি তো পাখিদের ভালোবাসি, তাই ওরা আমাকে ভয় পায় না।

বটুকদাদার সব কথাই তো অদ্ভুত, তাই এটাকে আমরা আর একটা অদ্ভুত কথা বলে ধরে নিলুম। অবশ্য পাখিটা যে শান্তভাবে বটুকদাদার কাঁধে বসে আছে, সেটাও তো ঠিক।

বটুকদাদা বললেন, দু'দিন ধরে নৌকোয় আসতে আসতে আমি পাখিটাকে কথা বলতে শিখিয়েছি। আমি তো পাখিদের ভাষা জানি তাই ওরাও আমার কাছ থেকে চট করে মানুষের ভাষা শিখে নেয়।

তাই শুনে আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলুম, কই, কই, আমরা পাখিটার কথা শুনব! কথা শুনব!

বটুকদাদা হাত তুলে বললেন, শুনবি, শুনবি। এক্ষুনি না। এত নতুন লোক দেখে লজ্জা পেয়েছে। আমি চান খাওয়া করে নি, তারপর তোদের শোনাব।

আমাদের সেই গ্রামের বাড়িতে ছিল একটা বেশ মস্ত উঠোন। তার তিনদিকেই ছোট ছোট একতলা ঘর। বটুকদাদা এলে তাঁকে দেওয়া হত উত্তর দিকের কোণের একটি ঘর। সেই ঘরের খুব কাছেই পুকুর ঘাট।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বটুকদাদা বললেন, আমার পাখিটা ইচ্ছে মতন এখানে উড়ে বেড়াবে। তোরা ওকে আদর করে ডেকে কথা বলতে পারিস, কিন্তু ওর গায়ে হাত দিস না। পাখিদের গায়ে হাত দিতে নেই। এর নাম আমি দিয়েছি কেষ্ট।

তারপর বটুকদাদা পাখিটাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকবার একটু পরেই স্পষ্ট শোনা গেল, কে বলছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

আমার ছোট ভাই বকু উত্তেজিত ভাবে বলল, ওই যে, ওই যে, পাখিটা কথা বলছে!

আমার ছোড়দি মুন্নির খুব বুদ্ধি আর সব কিছুতেই সন্দেহবাতিক। ছোড়দি ঠোঁট উল্টে বলল, ধ্যাৎ! ওটা আবার পাখির ডাক নাকি? আমাদের সঙ্গে মজা করার জন্য বটুকদাদা নিজেই ওরকম ডাকছে।

তক্ষুনি পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রান্নাঘরের পাশে, পুকুর ঘাটের কাছে তেঁতুল গাছটার একটা নিচু ডালে গিয়ে বসল। আমরা দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে বলতে লাগলুম, কেষ্ট, কেষ্ট, কেষ্ট আমরা তোমায় খুব ভালবাসি, আমাদের একটু কথা শোনাও তো!

পাখিটা যেন অবাক হয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল। তারপর ফুড়ুৎ করে উড়ে চলে গেল অনেক দূরে।

আমাদের বটুকদাদা তখন ধুতি-পাঞ্জাবি খুলে পায়জামা আর আলখাল্লা পরেছেন, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, চিন্তা করিস না, ও আবার ঠিক আসবে। এখন ওর জল-খাবারের সময় তো।

অনেকখানি রাস্তা নৌকো করে এসেছেন বলে বটুকদাদা ক্লান্ত হয়েছিলেন, তাই দুপুরবেলা ঘুমিয়ে নিলেন। এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, তখনও পাখিটার দেখা নেই। বটুকদাদার কাছে আমাদের গল্প শোনা হচ্ছে না বলে আমরা ছটফট করতে লাগলুম। বাড়ির বড়রা বটুকদাদাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে বারণ করেছেন।

আমরা একটা ঘরে বসে ক্যারাম খেলছি, হঠাৎ বকু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, কেষ্ট ফিরে এসেছে। কেষ্ট তেঁতুল গাছটার ডালে বসেছে।

আমরা খেলা বন্ধ করে বাইরে আসতেই স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই পাখির মুখে

মানুষের ভাষা। তেঁতুল গাছটার ডালে বসে সে ডাকছে, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে বাড়ির অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এল। আমরা বললুম, ওই শোন, পাখি কথা বলছে!

ঠাকুমা এক গাল হেসে বললেন, ওটা নিশ্চয়ই একটা সবুজ রং করা ঘুঘু পাখি। ঘুঘু পাখির ডাক এক এক সময় ওইরকম শোনায়। মন দিয়ে শুনে দেখবি, ঘুঘু যেন বলছে, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো, ওঠো...।

বটুকদাদা ঘুম ভেঙে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসে ডাকলেন, কেষ্ট, কেষ্ট! অমনি পাখিটা তেঁতুল গাছ থেকে উড়ে এসে বসল বটুকদাদার কাঁধের ওপর।

আমরা কাছে গিয়ে বললুম, ও বটুকদাদা, তোমার কেষ্ট ওই একটা কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলে না?

বটুকদাদা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরে কেষ্ট, কেষ্টরে, তুই কেমন আছিস?

পাখিটা অমনি বলে উঠল, ভালো, ভালো, ভালো!

বটুকদাদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো? এই জায়গাটা কেমন লাগছে?

পাখিটা আবার বলল, ভালো, ভালো, ভালো।

বটুকদাদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলি? এর আগেও আমি কত পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছি? তোদের ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

সেবারে যে দু'তিন দিন বটুকদাদা রইলেন, পাখিটাকে নিয়ে আমাদের খুব আনন্দে কাটল। এত পোষমানা পাখি আমরা আগে দেখিনি। তার একটুও ভয়-ডর নেই। সে আমাদের পড়াশুনোর সময় ঘরের মধ্যেও চলে আসে, এক পাশে চুপ করে বসে যেন আমাদের পড়া শোনে।

ঠাকুমা বললেন, আহা রে, পাখিটা নিশ্চয়ই আগের জন্মে মানুষ ছিল। তাই মানুষের পাশে পাশে থাকতে এত ভালোবাসে।

আমরা কেষ্টর গায়ে হাত দিই না, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলি। সে বেশি কথা বলতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের সব কথাই যেন সে বুঝতে পারে। অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তরে সে বলে ভালো, ভালো, ভালো। কিংবা না, না, না! প্রশ্নগুলো সেইভাবে সাজাতে হয়। যেমন আমরা যদি তাকে জিজ্ঞেস করি, কেষ্ট, তোমায় কেউ কষ্ট দিয়েছে? অমনি সে বলে, না, না, না! কিংবা, কেষ্ট, আজ কি বৃষ্টি হবে? সে বলবে, না, না, না।

তিনদিন বাদে বটুকদাদা যখন কেষ্টকে নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমাদের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা নৌকোর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে বটুকদাদাকে বললুম,

বটুকদাদা, পরের বার যখন আসবে, তখন কেষ্টকে ঠিক সঙ্গে করে এনো কিন্তু!

বটুকদাদা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আনবো। কি রে কেষ্ট, তুই আসবি না?

কেষ্ট এই কথার উত্তর দিল না, কারণ সে হ্যাঁ বলতে পারে না।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেষ্ট, তুমি অন্য জায়গায় থেকে যাবে না তো?

কেষ্ট তখন বলল, না, না, না!

বটুকদাদা ফিরে এলেন দেড় মাস বাদে। এবারে তাঁর সঙ্গে রতন বলে একটা ছেলে এসেছে কিন্তু তাঁর কাঁধের ওপর পাখিটা নেই।

তা দেখে আমাদের বুকটা ধড়াস করে উঠল। কেষ্ট আসেনি। সে কি অন্য জায়গায় উড়ে চলে গেছে? বটুকদাদা এক সময় বলেছিলেন যে আগেও তিনি অনেক পাখিকে কথা বলা শিখিয়েছেন বটে, কিন্তু এক সময় তাদের আবার আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম, বটুকদাদা, কেষ্ট কোথায়? কেষ্টকে আনোনি?

বটুকদাদা বললেন, হ্যাঁ, এসেছে। কেষ্ট আছে। পরে দেখতে পাবি।

কিন্তু বটুকদাদার সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই, কাঁধে শুধু একটা টাকা-পয়সা রাখার ঝুলি, তার মধ্যে তো একটা পাখিকে রাখা যায় না। তা হলে কেষ্ট কোথায়? সে কি আকাশ-পথে আসছে?

বটুকদাদা বললেন, এবারে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, দারুণ বিপদের মুখে পড়েছিলুম। দাঁড়া, একটু বিশ্রাম করে নিই, তারপর সব কথা শোনাব।

দুপুরবেলা বটুকদাদা ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনও কেষ্টর পাত্তা নেই। আমরা রতন নামে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলুম এই, তুমি কেষ্টকে চেনো? তাকে দেখেছ? সে এখন কোথায় আছে বলতে পারো।

রতন বলল, হ্যাঁ আমি কেষ্টকে চিনি। অনেকবার দেখেছি, কিন্তু সে এখন কোথায় আছে তা তো বলতে পারব না!

বকু জিজ্ঞেস করল, তুমি যে এবারে বটুকদাদার সঙ্গে এলে, আসবার পথে একবারও দেখতে পাওনি?

রতন হঠাৎ মুখ চুন করে বলল, না গো, কি করে দেখব বলো, গত হপ্তায় যে তাকে একটা বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।

আমরা সবকটি ভাইবোন একসঙ্গে আঁতকে উঠে বললুম, অ্যাঁ? বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে? কেষ্টকে? যাঃ, তা হতেই পারে না!

রতন বলল, আমি নিজের চোখে দেখেছি গো! গত হপ্তায় আমাদের নৌকো বাঁধা হয়েছিল চাঁদপুরের ঘাটে। আমরা মুড়ি খেতে বসেছি, কেষ্ট পাশেই বসে আছে। হঠাৎ ঘাট থেকে একটা হুলো বেড়াল লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরল কেষ্টকে। তারপর তো তাকে মুখে নিয়ে দিল একটা উল্টো দিকে লাফ। আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলুম

বটে কিন্তু ততক্ষণে কেষ্টা মারা গেছে। পাখির প্রাণ কি বেড়ালের কামড়ে বাঁচে? বেড়ালটার মুখ থেকে কেষ্টর আধ খাওয়া দেহটা উদ্ধার করা হল, তারপর ভাসিয়ে দেওয়া হল নদীর জলে। বটুকদাদা সেদিন খুব কেঁদেছিলেন!

ভীষণ দুঃখে আমরা সবাই চুপ করে গেলুম। শুধু বকু মিন মিন করে রতনকে জিজ্ঞেস করল, তবে তুমি প্রথমে বললে, কেষ্ট কোথায় আছে তা তুমি জানো না?

রতন এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না।

বিকেলবেলা ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আর বাবা-কাকার আসরে চা-মুড়ি খেতে খেতে বটুকদাদা শোনালেন এবারের বিপদের গল্প। প্রত্যেকবার তাঁর ওই একটা না একটা গল্প থাকে। তবে এবারে নাকি তিনি নির্ঘাৎ প্রাণেই মারা যেতেন।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই পাখিটা কোথায় গেল? ছেলেরা বলছে, তাকে নাকি...

ঠাকুমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বটুকদাদা বললেন, আগে এই ঘটনাটা শুনে নাও তারপর কেষ্টর কথা বলব!

বটুকদাদা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে একটু সুন্দরবনের দিকে গিয়েছিলুম বুঝলে? ওদিকে একটা খেয়াঘাট ইজারা নেবার কথা হচ্ছিল। ওদিকে বড্ড বাঘের ভয়, তাই সন্ধের পর কেউ নৌকো চালায় না। আমিও বিকেল হতে না হতেই মোল্লাখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে ফেলেছি। রাত্তিরে আর রান্নাবান্নার ঝামেলা করিনি, কাছেই একটা হোটেল ছিল সেখান থেকে খেয়ে নিলুম রতন আর আমি। রতনটা খুব ঘুমকাতুরে, সন্ধে হতে না হতেই ওর ঘুম পায়। আমিও আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লুম, শুধু শুধু কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ কি! পাশাপাশি তিন-চারখানা নৌকো, ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ এক সময় আমার কানের কাছে কেষ্ট ডেকে উঠল, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

সেই ডাক শুনে আমি ধড়মড় করে জেগে উঠলুম। অমনি কানে এল হৈ হৈ শব্দ। ছই-এর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি পাশের নৌকোতেই ডাকাত পড়েছে। মশালের আলোয় চোখে পড়ল, একজন ডাকাত একজন মাঝিকে মারার জন্য খাঁড়া তুলেছে।

বুঝলে দাদা, এক মিনিট দেরি হলে সেই ডাকাতরা আমার নৌকোতেও লাফিয়ে চলে আসত। কেষ্ট ঠিক সময় আমার ঘুম ভাঙিয়ে না দিলে প্রাণে মারা যেতুম। আমি সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর দড়ি খুলে দিয়ে একটা ধাক্কা মারতেই আমাদের নৌকো ভেসে পড়ল স্রোতে। ডাকাতরা আর ধরতে পারল না।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, এটা কবেকার ঘটনা?

বটুকদাদা বললেন, এই তো পরশু রাতেই... তারপর সোজা চলে এসেছি তোমাদের এখানে।

ঠাকুমা বললেন, পরশু রাতে? তাহলে যে ছেলেরা বলল, এক সপ্তাহ আগেই নাকি তোমার কেষ্ট পাখিকে বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে। সে পাখিটা তো মরে গেছে?

ঠাকুমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বটুকদাদা বললেন, মরে গেলেই কি সব কিছু শেষ হয়ে যায়? কেউ কেউ থাকে। কেষ্ট হারিয়ে যায়নি, সে এখনো আছে। সেই আমায় বাঁচিয়েছে।

ঠাকুমা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন, রাম, রাম!

গল্পটা শুনে আমাদের গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ছোড়দি বলল, হয় ওই রতনটা মিথ্যে কথা বলেছে, না হলে বটুকদাদা এই গল্পটা বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙতেই আমি শুনতে পেলুম একটা পাখির গলার ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

কেষ্টকে আমি খুব ভালো বাসতুম, কিন্তু ওই ডাক শুনে আমার দারুণ ভয় হল। আমি পাশের ঘুমন্ত ছোড়দিকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে বললুম, ছোড়দি, ছোড়দি, শোনো...

ছোড়দি কান খাড়া করে ডাকটা শুনল। তার ভুরু কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, মানুষ মরে গেলে কখনো কখনো ভূত হয় শুনেছি, পাখি মরে গেলেও ভূত হয়? ধ্যাৎ! যত সব বাজে কথা। চল তো গিয়ে দেখি!

ছোড়দির খুব সাহস, সে আমার হাত ধরে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। ডাকটা আসছে পুকুর ধারের তেঁতুল গাছটা থেকে। আমরা দুজনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালুম। কোনো পাখি চোখে দেখা গেল না। পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে একটা ডাক, বটুকদাদা, ওঠো, ওঠো, ওঠো!

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বটুকদাদা। চোখ মুছতে মুছতে আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, ওই যে কেষ্ট আমাকে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস? আজ আমাকে তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে তো, তাই কেষ্ট ডেকে তুলেছে!

এবারে ছোড়দিও কোনো কথা বলতে পারল না।

ভূতটা আসল কে?

আজ সকাল থেকেই সবাই খুব ব্যস্ত। মজুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত সবাই ছোটাছুটি করছে এদিক-ওদিক। আর ঠিক একঘণ্টা পরেই ব্লাস্টিং হবে।

ব্লাস্টিং মানে পাহাড় ফাটানো।

মধ্যপ্রদেশের গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে পাতা হচ্ছে নতুন রেললাইন। কিছু-কিছু গাছ কেটে ফেলতে হচ্ছে, আর এই জায়গাটার পাহাড় না ফাটিয়ে উপায় নেই। পাহাড়টা ঠিকঠাক রাখতে গেলে রেললাইন ঘুরিয়ে দিতে হবে অনেকখানি। তাতে খরচও যেমন প্রচুর বেড়ে যাবে, দেরিও হবে অনেক। এবছর আর কাজ শেষ হবে না।

রুকুর বাবা এখানকার প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। মাসের পর মাস তিনি জঙ্গলেই পড়ে আছেন, বাড়িতে ফিরতে পারেন না। এখন রুকুর গরমের ছুটি, তাই সে বাবার কাছে চলে এসেছে।

এখানে থাকতে হয় তাঁবু খাটিয়ে। রুকু আগে তো কখনও তাঁবুর মধ্যে শোয়নি, তার খুব মজা লাগছে। ঠিক যেন গল্পের বইয়ের মতন।

রাত্তিরে কতরকম জঙ্গলের শব্দ শোনা যায়। একদিন একটা বাঘের ডাকও শোনা গিয়েছিল খুব কাছেই। অবশ্য তাঁবুর সামনে সারারাত আগুন জ্বলে আর বন্দুক নিয়ে দুজন গার্ড পাহারা দেয়। বাঘের ডাক শুনে বাবাও বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। বাঘটাকে অবশ্য দেখা যায়নি।

শেয়ালের ডাক তো শোনা যায় সব রাত্তিরেই। এ জঙ্গলে হাতিও আছে, কিন্তু তারা এখনও এদিকে আসেনি।

রুক যেদিন এখানে এসে পৌঁছল, সেই দিনই বিকেলবেলা কাটা হয়েছিল দুটো বড়-বড় গাছ। ইলেকট্রিক করাত দিয়ে গাছ কাটার বিকট শব্দ হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর প্রায় একইসঙ্গে দুটো গাছ মড়মড় শব্দ করে পড়ল মাটিতে।

গাছ কাটা দেখলে রুকুর খুব কষ্ট হয়।

গাছ যেন মানুষেরই মতন। একটা দাঁড়িয়ে থাকা গাছকে ডালপালা সমেত যখন কেটে ফেলা হয়, তখন রুকুর মনে হয়, যেন একটা মানুষই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। রুকুর মনে পড়ে, মহাভারতের কর্ণের মৃত্যুদৃশ্য।

বাবা বলেছিলেন,—দ্যাখ, গাছ কাটা আমারও পছন্দ নয়। কিন্তু রেললাইন বসাতে গেলে জঙ্গলের ভেতরের খানিকটা অংশ তো পরিষ্কার করতেই হবে। এখান থেকে

ট্রেন চললে কত মানুষের উপকার হবে। কত গরিব মানুষ কোনোদিন শহরে যেতেই পারে না। তাই ভালো করে লেখাপড়াও শেখা হয় না ওদের। তবে আমি যতদূর সম্ভব কম গাছ কাটাচ্ছি। পরে আবার নতুন গাছ লাগিয়ে দিতে হবে।

সেই রাতে প্রচুর শেয়াল ডেকেছিল, আরও কীসব অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

তাঁবুর মধ্যে খাটিয়ায় শুয়ে বাবা বলেছিলেন,—কেন আজ ওরা এত ডাকছে বুঝলি রুকু? জন্তু-জানোয়াররা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই জঙ্গলটা এতদিন ওদের নিজস্ব ছিল, এখন আমরা এসে উৎপাত করছি। কিন্তু কী আর করা যাবে। এই পৃথিবীতে আগে তো প্রায় সব জায়গাতেই জঙ্গল ছিল আর জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি ছিল, মানুষই ছিল কম। এখন মানুষের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেছে আর নিজেদের সুবিধের জন্য মানুষ অনেক কিছু নষ্ট করছে।

রুকু জিজ্ঞেস করেছিল,—বাবা, আগে যখন রেল লাইন ছিল না, তখনও তো এদিকে মানুষ থাকত।

বাবা বললেন,—হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে বললাম, আমাদের তুলনায় তারা কত খারাপ অবস্থায় ছিল। স্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, খাবার-দাবারও ভালো পায় না। রেললাইন হলে ওরাও বাইরে যেতে পারবে, বাইরের লোকও এদিকে আসবে। মানুষকে তো মানুষের কথাই ভাবতে হবে!

আজ ফাটানো হবে পাহাড়।

সেটার জন্যও রুকুর একটু-একটু কষ্ট হয়।

ছোট্ট একটা পাহাড়, কী সুন্দর দেখতে, ঠিক যেন একটা ওলটানো লাট্টুর মতন। তার গায়ে ছোট-ছোট গাছ। দু-খানা কাঠের বাড়িও আছে। সে বাড়ির লোকজন আর জিনিসপত্র অবশ্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আগেই।

আজ এখানে পাহাড়টা রয়েছে, কাল আর থাকবে না? কীরকম দেখাবে জায়গাটা?

পাহাড়টার ঠিক মাঝখানে, তলায় গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়েছে ডিনামাইট। সেই ডিনামাইটের এমন শক্তি একটা পাহাড়কেও ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

বাবা বলেছেন,—এই ডিনামাইট আবিষ্কার করেছেন সুইডেনের এক বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর সব দেশেই রেললাইন পাতা, রাস্তাঘাট বানানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। সেই আবিষ্কারের জন্য নোবেল সাহেব অনেক টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকা ব্যাঙ্কে রেখে তিনি কয়েকটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে গেছেন, তারই নাম নোবেল প্রাইজ। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, মাদার টেরিজা, অমর্ত্য সেন সেই পুরস্কার পেয়েছেন। চেষ্টা করলে তুইও একদিন পেতে পারিস।

রুকু বলেছিল, আমি?

বাবা বলেছিলেন,—হ্যাঁ, অসম্ভব তো কিছু নয়। ভালো করে বিজ্ঞান শিখেই, বিজ্ঞানের কয়েকটা পুরস্কার পাওয়া যায়। খুব ভালো গল্প কিংবা কবিতা লিখলেও পাওয়া যেতে পারে।

রুকু জিজ্ঞেস করেছিল,—বাবা, পৃথিবীতে তো আরও অনেক বড় লোক আছে, কিন্তু আর কেউ এরকম পুরস্কারের ব্যবস্থা করে না কেন?

বাবা বলেছিলেন,—সেই তো কথা! আর সব বড় লোকরা খুব স্বার্থপর হয়। অন্যদের কথা চিন্তাই করে না!

এর মধ্যে এক রাত্তিরে দেখা গিয়েছিল একটা কেউটে সাপ। সেটা তাঁবুর সামনে আগুনের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল একটা ইঁদুরকে তাড়া করে।

রুকু এতবড় কেউটে সাপ কখনও দেখেনি। প্রায় দু-হাত উঁচু হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল। জ্বলজ্বল করছে চোখ আর চিড়িক-চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে জিভ।

শ্রমিকরা লাঠি আর শাবল নিয়ে হইহই করতে-করতে সেটাকে তাড়া করেছিল। কিন্তু মারতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। শুধু একটা লাঠির ঘা লেগেছিল ওর গায়ে। তারপরই সড়াৎ করে ঢুকে গিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে।

সবাই এখনও সেই সাপটার ভয়ে-ভয়ে আছে। অনেকের ধারণা, বুধন নামে যে লোকটির লাঠির ঘা লেগেছিল কেউটেটার গায়ে, সেই বুধনকে মারবার জন্য প্রতিশোধ নিতে সাপটা ফিরে আসবে!

বাবা অবশ্য বলেছিলেন,—ওসব প্রতিশোধ, ট্রতিশোধ বাজে কথা। সাপ কোনো কিছুই মনে রাখতে পারে না। তবে সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে ঠিকই।

আজ পাহাড় ফাটানো হবে।

বাবা রুকুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে আর একটা ছোট পাহাড়ের ওপর। সেখানে আরও কয়েকজন থাকবে। অলক্লিয়ার হুইশল দেওয়ার আগে রুকুরা কেউ ওই পাহাড় থেকে নেমে আসতে পারবে না।

কারণ, ব্লাস্টিং হবার পর পাথরের টুকরো যে কতদূর ছিটকে যাবে, তার ঠিক নেই। একবার থেমে গেলেও আবার শুরু হয়ে যেতে পারে, সে জন্য খুব সাবধানে থাকতে হয়। মাঝে-মাঝেই দু-একটা দুর্ঘটনাও ঘটে যায়।

রুকুর হাতে ঘড়ি নেই, নির্মলকাকুর হাতের ঘড়িটা সে দেখছে বারবার। আর কুড়ি মিনিট বাকি। এখন চলছে, অধীর প্রতীক্ষা।

তার বারবার মনে পড়ছে, বাবা কেন এখানে এলেন না? বাবা অত কাছে থাকবেন, যদি তার মাথায় পাথর এসে পড়ে?

একবার সে নির্মলকাকুকে বলেই ফেলল কথাটা।

নির্মলকাকু বললে,—তোমার বাবা নিজের হাতে বোতাম টিপবেন। উনি কতবার

এরকম ব্লাস্টিং করিয়েছেন, কী করে সাবধান হতে হয়, সব জানেন। তুমি চিন্তা কোরো না, রুকু।

আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। ব্লাস্টিং-এর সময় পাথরের টুকরো ওপরে উঠে গিয়ে যদি ওদের গায়ে লাগে?

কিন্তু পাখিদের তো আর এখন এদিকে ওড়াউড়ি করতে বারণ করা যায় না?

পাহাড়টার গায়েও থাকে নানারকম খাঁজ আর ফাটল্। সেখানেও থাকে অনেক ছোটখাটো প্রাণী। তাদের কী হবে?

আচমকা যেন আকাশ থেকে বিকট জোরে বাজ পড়ার শব্দ হল।

বাজ তো নয়, এটাই ব্লাস্টিং।

বাজের শব্দের চেয়েও যেন জোরে, কানে তালা লেগে যায়। একবার নয়, পরপর কয়েকবার।

রুকু কান চেপে ধরল, দুহাতে।

এখান থেকেও দেখা গেল আগুনের শিখা। ছিটকে-ছিটকে উঠছে বড়-বড় পাথর। সেগুলোর কোনটা-কোনটা পড়ছে আশপাশের গাছের মাথায়। অন্যগুলো মাটিতে পড়ার গুম-গুম শব্দ হচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর থেমে গেল সব শব্দ।

ধুলো আর ধোঁয়া সরে যাবার পর রুকু দেখতে পেল, পাহাড়টা একেবারে ধ্বংস হয়নি। মাঝখানটা ফাঁক হয়ে গেছে, চূড়াটাও নেই!

বেজে উঠল অল ক্লিয়ারের হুইশল।

নির্মলকাকুর পাশে একজন মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়েছিল, তার দু-হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি।

সে রুকুর কাঁধ চাপড়ে বলল,—তোমার বাবা দারুণ কাজ করেছেন। একেবারে নিখুঁত। তোমার বাবার ওপর সবসময় ভরসা করা যায়।

নির্মলকাকু বললেন,—রুকু, ইনি কে জানো তো? এঁর নাম নটবর জিন্দাল। যে কোম্পানি এখানে এই রেললাইন পাতার কাজ করছে, ইনি সেই কোম্পানির একজন মালিক।

রুকু লোকটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

নটবড় জিন্দাল বললেন, বেশ-বেশ।

সবাই মিলে নেমে আসা হল নীচে। রুকু ছুটতে-ছুটতে তাঁবুর কাছে এসে তার বাবাকে দেখতে পেল না।

একজন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করল, আমার বাবা কোথায় জানো?

সে বলল,—একটু আগে ছিলেন এখানে। এখন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অনেক কাজ। তিনি ঘুরে-ঘুরে দেখবেন, কতখানি রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। পুরো না হলে

আবার ব্লাস্টিং করাতে হতে পারে।

চতুর্দিকে পড়ে আছে পাথরের টুকরো।

দু-একটা গাছ হেলে পড়েছে, অনেক গাছের ডালপালা ভেঙে গেলেও এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছু ইঁদুর আর খরগোশও মরে পড়ে আছে। শোনা গেল, পাহাড়টার ওপাশ থেকে একটা মরা হরিণও পাওয়া গেছে, বেশ বড় হরিণ। সে জন্য অনেকে বেশি খুশি। আজ রাতে আগুন জ্বেলে হরিণ আর খরগোশের মাংস ঝলসে খাওয়া হবে, ভোজ হবে রীতিমতো।

বাবা দুপুরেও খেতে এলেন না।

রুকুকে একজন খাবার দিয়ে গেল তাঁবুতে এসে। তার মুখেই শোনা গেল, পাহাড়টা আরও ভাঙতে হবে। আবার ব্লাস্টিং হবে দুদিন পরে।

বাবা ফিরলেন সন্ধের মুখে-মুখে। যেমন ক্লান্ত, তেমনি গম্ভীর।

রুকু জিজ্ঞেস করল, —কী হয়েছে, বাবা?

বাবা বললেন,—উঁ? কী হয়েছে? তোর এখন জানবার দরকার নেই। দেখি, কী হয়!

বাবা স্নান-টান করে এসে চা নিয়ে বসলেন। সেই সময় তাঁবুর পর্দা ঠেলে ঢুকল নটবর জিন্দাল।

হাত জোর করে বলল,—নমস্কার চ্যাটার্জি সাব। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

বাবা বললেন,—হ্যাঁ। বসুন। ওই চেয়ারটায়।

জিন্দাল তাকাল রুকুর দিকে।

বাবা বললেন,—ও, আচ্ছা, রুকু, তুই কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যা তো! ডাকলে আবার আসবি।

রুকু বেরিয়ে গেল বটে, বেশি দূরে গেল না। তাঁবুর কোণের দিকটায় দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দে। এখান থেকে ভেতরের সব কথা শোনা যায়।

বাবা কেন গম্ভীর, বাবার কেন মন খারাপ? সেটা জানার জন্য কৌতূহলে ছটফট করছে রুকু।

তাঁবুর মধ্যে বসে জিন্দাল বলল, কংগ্রাচুলেশান চ্যাটার্জিবাবু। আজ খুব ভালো কাজ হয়েছে। ভেরি সাকসেসফুল।

বাবা বললেন,—পুরো সাকসেসফুল হতে পারিনি। আবার ব্লাস্টিং করাতে হবে।

জিন্দাল বলল, সে তো লাগতেই পারে। আজ এইট্টি পারসেন্ট কাম হয়ে গেছে। আর ছোটখাটো ব্লাস্টিং করলেই হবে।

বাবা বললেন,—আপনি বুধনের কথা শুনেছেন?

জিন্দাল বলল,—হাঁ-হাঁ, শুনেছি। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভেগে পড়ল নাকি

লোকটা?

বাবা বললেন,—না, ভেগে পড়বে কেন? সে মারা গেছে। পাওয়া গেছে তার ডেড বডি।

জিন্দাল বললেন,—ও হাঁ-হাঁ, পরে শুনেছি। ডেড বডি পাওয়া গেছে। তাকে সাপে কামড়েছে। সে একটা সাপকে লাঠি দিয়ে মেরেছিল নাকি? সেই সাপটা আজ রিভেঞ্জ নিয়েছে।

বাবা রেগে উঠে বললেন,—রাবিশ! মোটেই তাকে সাপে কামড়ায়নি। যদি সাপের কামড়েই সে মরতো, তা হলে আপনার কয়েকজন পেটোয়া লোক চুপি-চুপি তার ডেড বডি সরিয়ে ফেলল কেন? সাপের কামড়ে কেউ মরলে তার জন্য তো এখানকার কেউ দায়ী হতে পারে না। সবাইকে জানিয়ে দিলেই হত।

জিন্দাল বলল,—আপনি ঠিক জানেন না, সাপেই তাকে কামড়েছে। এখন কিছু জানানো হবে না। এখন সবাইকে বলবেন, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কদিন বাদে ডেড বডি আনা হবে।

বাবা বললেন,—আমি খুব ভালো করেই জানি, তার মাথায় পাথর পড়েছিল। বুধন লোকটা খুব সাহসী। একটা ডিনামাইটের স্টিক ফাটেনি, তাই সে কাছে গিয়ে দেখতে চেয়েছিল।

জিন্দাল বলল,—চ্যাটার্জিবাবু, আপনি যদি সে কথা জেনেই থাকেন, তবে এখন কিছুদিন চুপ করে থাকুন। অন্যদের কাছে কিছু জানাবার দরকার নেই। আগে এ কাজটা শেষ হোক।

বাবা বললেন,—কেন, চুপ করে থাকতে হবে কেন? এরকম কাজে দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। বুধনেরও কিছুটা দোষ ছিল। কিন্তু তার বউ, ছেলেমেয়ে আছে, তাদের তো দেখতে হবে। আপনি সবাইকে বুধনের মৃত্যুর কথা জানিয়ে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে দিন।

জিন্দাল বলল,—ওরে বাবা, এখন না, এখন না। এখন ও কথা শুনলেই শ্রমিকরা চ্যাঁচামেচি করবে। অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ চাইবে। এক লাখ, দু-লাখ। আগে সব কাজ শেষ হোক, তারপর আমরা নিশ্চয়ই ঠিকঠাক বিবেচনা করব। ক্ষতিপূরণ অবশ্যই দেব ওর বউ-বাচ্ছাদের।

বাবা বললেন,—কাজ শেষ হয়ে গেলে আপনারা শ্রমিকদের কথা ভুলে যান। তখন বড় জোর দশ-কুড়ি হাজার দিয়ে মেটাতে চাইবেন।

জিন্দাল এবার কড়া গলায় বলল, চ্যাটার্জিবাবু, কোম্পানি কত টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে কি না দেবে, তা আমরা বুঝব। সেটা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করা। শেষ হলে আপনি বোনাস পাবেন।

বাবা বললেন,—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতেই তো আমি চাই। কিন্তু বুধনের

কথা জানাজানি হবেই। তখন যদি শ্রমিকরা খেপে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়, সেজন্য কিন্তু আমি দায়ী হব না।

জিন্দাল বলল,—সে আমরা সামলাবো। সব ব্যবস্থা করা আছে। আপনি চুপচাপ থাকুন।

শুনতে-শুনতে রুকুর মনে হল, এই জিন্দাল তো মোটেই ভালো লোক নয়। সে বাবাকে ধমকাচ্ছে আর মিথ্যে কথা বলতে বলছে!

ইস, এই লোকটাকে সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল কেন? এখন আর প্রণাম ফেরত নেওয়া যায় না?

বাবা কী শুনবেন ওর কথা?

জিন্দালের জন্য পাশেই একটা বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে। তার জন্য আলাদা রান্নার ব্যবস্থা!

সকালে উঠেই বাবা কাজে চলে গেলেন। তাঁকে যেতে হবে পাহাড়ের উলটো দিকটায়। সেখানে আবার ব্লাস্টিং হবে।

রুকুকে তিনি বলে গেলেন বেশি দূরে কোথাও না যেতে।

রুকু সকালবেলা খানিকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরল। কালকের ব্লাস্টিং-এর সেই বিকট আওয়াজের জন্য সব জন্তু-জানোয়ার বহু দূরে পালিয়ে গেছে। শুধু পাখিরা ফিরে এসেছে।

সে শুনতে পেল, শ্রমিকরা বলাবলি করছে, বুধন কোথায়? বুধন কোথায়?

বাবা আজও ফিরলেন সন্ধের সময়। রুকুর সঙ্গে বিশেষ কথা বাবা বললেন না।

মাঝরাত্রে দারুণ চিৎকার শুনে রুকুর ঘুম ভেঙে গেল।

তাঁবুর মধ্যে টিমটিম করে একটা হারিকেন জ্বলে সারারাত। সেই আলোতে রুকু দেখল, পাশের খাটিয়ায় বাবা নেই!

পাশের তাঁবুতে চিৎকার চলছেই,—এবার বোঝা যাচ্ছে, জিন্দালই দারুণ ভয়ের সঙ্গে বলছে, ওরে বাপরে, মর গ্যয়া, বাঁচা দিজিয়ে! মাপ চাইছে, বাঁচাও, বাঁচাও!

এর মধ্যে বাবা দৌড়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন নিজের বিছানায়।

জিন্দাল চেঁচাতে-চেঁচাতে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ডাকতে লাগল, চ্যাটার্জিবাবু, চ্যাটার্জিবাবু, বাঁচা দিজিয়ে, বাঁচা দিজিয়ে।

বাবা সদ্য ঘুম ভাঙার ভান করে উঠে গিয়ে বললেন, কী হয়েছে? চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?

জিন্দাল কাঁদতে-কাঁদতে বলল,—বাঁচান আমাকে। বুধনের ভুত এসেছিল। এত-এত বড় লম্বা, এত বড় দাঁত। আমাকে বলল,—আভি সবকো বোল দেও, আমি মরে গেছি! আমার বউ-বাচ্চাকে কত টাকা দেবে। আজই বলে দাও! নইলে তোমাকে মেরে ফেলব। আমার গলা টিপে ধরেছিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি গলা টিপে ধরেছিল?

জিন্দাল বলল,—হ্যাঁ, সত্যি! ঠান্ডা বরফের মতন হাত। ও আবার আসবে বলেছে! আমি এখনই কমপেনসেশানের কথা ঘোষণা করে দিব। আপনি সব ওয়ার্কারকে ডাকুন।

বাবা হুইশ্‌ল বাজাতে লাগলেন। এখানকার নিয়ম এই, রাত্রিবেলা হুইশ্‌ল শুনলে সবাইকে এক জায়গায় এসে জড়ো হতে হবে!

অনেকেই উঠে এসে দাঁড়াল আগুনটা ঘিরে।

জিন্দাল বলল,—শুনো ভাইসব, বুধন মাঝি আর জিন্দা নেহি হ্যায়। বহুত দুখ কা বাত হ্যায়। কাল সকালে বুধনের জন্য আধা ঘণ্টা ছুটি, আর বুধনের বউ বাচ্চাকে কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবে, হাঁ দেবে, জরুর দেবে...।

আর কথা বলতে না পেরে সে মাটিতে বসে পড়লো। তার শরীর কাঁপছে।

নির্মলকাকু কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কী হল? কী হল?

জিন্দাল বলল,—ওরে বাবা, আমার জিভ শুকিয়ে আসছে। বুক ধড়ফড় করছে। তুমি বলে দাও! সবাইকে জানিয়ে দাও!

নির্মলকাকু বললেন, কী জানাব?

জিন্দাল বলল,—জানাইয়ে যে বুধনের জরু আর বালবাচ্চা পাবে ক্ষতিপূরণ! এক লাখ!

নির্মলকাকু আবার জিজ্ঞেস করলেন,—কত ক্ষতিপূরণ পাবে? কত?

জিন্দাল বলল,—একলাখ! না, না, দু-লাখ! ঠিক হ্যায়, দুলাখ!

নির্মলকাকু চেঁচিয়ে বললেন,—শোনো সবাই, দুর্ঘটনায় বুধন মারা গেছে, সে জন্য তার পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে দু-লক্ষ টাকা। হ্যাঁ, জিন্দাল সাহেব কথা দিয়েছেন দু-লক্ষ টাকা। আর এরপরে যদি আর কোনো দুর্ঘটনা হয়, সবাই পাবে এই সমান ক্ষতিপূরণ। দু-লক্ষ টাকা। বুধনের বউ বা ছেলে, কেউ একজন চাকরিও পাবে।

সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল।

রুকু দেখল, তার বাবার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

বাবা ফিরে গেলেন তাঁবুর মধ্যে।

রুকুর মনে একটা খটকা লাগল। বাবা অনেকবার তাকে বলেছিলেন,—ভূত বলে কিছু নেই। ভূতের ভয় পায় শুধু বোকারা! তাহলে জিন্দাল সাহেব ভূতের কথা বলল কেন?

নিজের খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে রুকু জিজ্ঞেস করল,—বাবা, ওই জিন্দাল সাহেব কি সত্যি ভূত দেখেছে?

বাবা বললেন,—ভূত বলেই তো কিছু নেই। তা-হলে আর সত্যি হবে কী করে? আসলে কী হয় জানিস, মানুষ যখন কোনো দোষ বা অন্যায় করে, তখন বিবেকের

তাড়নায় ভূতের কথা কল্পনা করে নেয়। বুধনের ওপর অবিচার করতে যাচ্ছিল তো, তাই ঘুমের মধ্যে বুধনের ভূত দেখে ফেলেছে!

বাবা হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলেন।

রুকু জিজ্ঞেস করল,—বাবা, তুমি হাসছ কেন?

বাবা বললেন,—হাসি চাপতে পারছি না। আসলে কী হয়েছে জানিস? অনেক মানুষের বিবেক বলে কিছু থাকে না। তারা অন্যায় করেও ভয় পায় না। আমি জানতুম, এই জিন্দাল অন্য কিছু পরোয়া না করুক, রাত্তিরবেলা খুব ভূতের ভয় পায়। তাই আমাকেই বুধনের ভূত সাজতে হল। গায়ে একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে...ও এমন ভয় পেয়ে গেল, খাট থেকে পড়ে গেল মাটিতে!

রুকু বলল,—বেশ হয়েছে! লোকটার ঠিক শাস্তি হয়েছে!

বাবা বললেন,—তুই এবার ঘুমিয়ে পড় রুকু।

কিন্তু বাবা নিজের মনে হাসতে লাগলেন আরও কিছুক্ষণ।

ডাকাতের দল ও এক জমিদার

জমিদার তেজেন্দ্রনারায়ণ গভীর রাত্তিরে বাড়ি ফিরছিলেন, মাঝপথে ডাকাতরা তাঁর ঘোড়ার গাড়ি আটকে দিল।

জায়গাটা জঙ্গল মতন, আর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

কিন্তু তেজেন্দ্রনারায়ণ ডাকাতের ভয়ের কথা একবারও চিন্তা করেননি। তাঁর প্রবল প্রতাপ। লোকে বলে তেজেন্দ্রনারায়ণের ভয়ে বাঘ আর গরুতে একসঙ্গে জল খায়। তাঁর জমিদারির মধ্যে কেউ তাঁর গাড়ি আটকাতে পারে, এ যেন অসম্ভব ব্যাপার।

ঘোড়া দুটো চিঁ-হি-হি করে ডেকে থেমে গেল। তেজেন্দ্রনারায়ণ গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করলেন,—কী রে রহমৎ, কী হল? থামলি কেন?

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

রহমৎ অতি বিশ্বাসী গাড়োয়ান। এ ছাড়া গুরমুখ সিং আর হরি সিং নামে দুজন দেহরক্ষী সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকে। আজ হরি সিং-এর খুব জ্বর হয়েছে বলে শুধু গুরমুখ সিং-ই তাঁর সঙ্গে এসেছে।

রহমৎ-এর কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে তেজেন্দ্রনারায়ণের ভুরু কুঁচকে গেল।

তিনি আবার হাঁক দিলেন,—গুরমুখ! কী হল?

এবারেও কোনো উত্তর নেই।

এ-রকম তো কখনও হয় না। জমিদার ডাক দেওয়া মাত্র সবাই সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়!

অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু মিটমিট করে জোনাকি জ্বলছে দু-একটা। কোথাও কোনো শব্দ নেই।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করেও কারুর সাড়াশব্দ না পেয়ে তেজেন্দ্রনারায়ণ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

তাঁর ভয়-ডর কিছু নেই। গায়ে অসম্ভব জোর, দু-তিনজন লোককে কাবু করে ফেলতে পারেন। সঙ্গে রয়েছে রিভলবার। একটা টর্চও আছে।

টর্চ জ্বেলে প্রথমে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। গাড়োয়ানের বসবার জায়গায় রহমৎ নেই। পেছন দিকটায় এসে গুরমুখকেও দেখতে পেলেন না।

এরা দুজন গেল কোথায়? হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাবে? কিংবা গাড়ি ছেড়ে পালাবে,

এটাও তো অবিশ্বাস্য!

একটা খড়মড় শব্দ হতে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। অন্ধকারের মধ্যে আবছা মতন যেন একটা মানুষের মূর্তি। আগাগোড়া সাদা কাপড়ে ঢাকা।

তিনি সেটা দেখেও ভয় না পেয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—এই, ওখানে কে রে?

কোনো উত্তর নেই।

তেজেন্দ্রনারায়ণ রিভলবার তুলে বললেন,—সামনে এগিয়ে আয়, না হলে আমি গুলি করব!

এবারেও তিনি উত্তর না পেয়ে একটা গুলি চালিয়ে দিলেন।

তাতেও কিছু হল না। গাছের ডাল থেকে একটা সাদা কাপড় ঝুলছে, ওখানে কোনো মানুষ নেই।

তেজেন্দ্রনারায়ণ কিছুই বুঝতে না পেরে যে-ই এক পা এগোতে গেলেন, অমনি তাঁর ডান হাতের ওপর কয়েকটা লাঠির বাড়ি পড়ল। রিভলবারটা খসে পড়ে গেল হাত থেকে।

তিনি নীচু হয়ে সেটা তোলার চেষ্টা করেও পারলেন না। কাঁধের ওপর পড়ল লাঠির ঘা। একটা বেশ জোরে মাথায় লাগতেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

এবারে দশ-বারো জন সেখানে জড়ো হয়ে গেল। তাদের দু-জনের হাতে মশাল জ্বলছে দাউ দাউ করে। হাত-পা বাঁধা, অজ্ঞান রহমৎ, গুরমুখকেও টানতে-টানতে এনে রাখল সেখানে।

একজন একটা ঘটি করে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল তেজেন্দ্রনারায়ণের চোখেমুখে।

একটু পরেই জ্ঞান ফিরলে তেজেন্দ্রনারায়ণ ধড়মড় করে উঠে বসতে গেলেন। দেখলেন, তাঁর হাত ও পা বাঁধা।

সামনে একদল লোক গোল হয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকেরই মুখে মুখোশ। শুধু একজন ছাড়া। মাথায় একটা লাল ফেট্টি বাঁধা। মাঝখানে একটা আগুন জ্বলছে।

যে-লোকটার মুখে মুখোশ নেই, সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তেজেন্দ্রনারায়ণের সামনে।

সে বলল,—রাতঃ প্রণাম জমিদার মশাই। আপনার ঘুম ভেঙেছে তাহলে?

তেজেন্দ্রনারায়ণ দারুণ চমকে উঠলেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন,—কানাই?

লোকটি বলল,—ঠিক চিনেছেন, এ অধমের নাম কানাই!

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—তুই, তুই, আমার হাত-পা বেঁধেছিস? তোর এত আস্পর্ধা? চাবকে তোর পিঠের ছাল তুলে নেব।

কানাই একটু হেসে বললেন,—এখন চাবকাবেন কী করে? আপনার হাত খোলা নেই। সঙ্গে চাবুকও নেই।

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—তুই ডাকাতি শুরু করেছিস? তোর মরার ইচ্ছে হয়েছে? কাল সকালেই ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমার খোঁজ না পেলে পুলিশ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। ডগলাস সাহেবের হাত থেকে কেউ নিস্তার পায় না।

কানাই বলল,—আমার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি এখন নিজের কথা ভাবুন।

তেজেন্দ্রনারায়ণ এবার একটু নরম হয়ে বললেন,—কানাই, তোর বাবা হরিচরণ আমার কাছে সারাজীবন কাজ করেছে। আমার নুন খেয়েছে। তার ছেলে হয়ে তুই আমার সঙ্গে নিমকহারামি করছিস?

কানাই বলল,—আমার বাবা আপনার নুন খেয়েছে তো বটেই। চাবুকও খেয়েছে। আপনি কতবার তাকে আদর করে চাবুক মেরেছেন, তা মনে নেই? অন্যকে চাবুক মারলে তার কেমন লাগে এবার একটু দেখুন!

কানাই একটা চাবুক নিয়ে শপাং করে এক ঘা কষালো তেজেন্দ্রনারায়ণের মুখে।

তেজেন্দ্রনারায়ণ এতই অবাক হয়েছেন যে যেন ব্যথা পেতেও ভুলে গেলেন। এ-পর্যন্ত তাঁর গায়ে কেউ কক্ষণও হাত তোলেনি। তিনি অনেককে চাবুক মেরেছেন বটে, কিন্তু মার খেতে কেমন লাগে তা তিনি জানেনই না।

এখন তাঁর চাকরের ছেলে তাঁকে চাবুক মারল?

কানাই আবার বললে,—আমার বাবার পিঠে চাবুকের দাগ আছে। আরও অনেক প্রজাকে চাবুক মেরেছেন, তার জন্য এই নিন আর-এক ঘা!

এবারে সে আরও জোরে মারল। তেজেন্দ্রনারায়ণের কপাল কেটে রক্তের ধারা বেরুতে লাগল।

কানাই বলল,—আপনি অনেক প্রজাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিয়েছেন। তাই আপনার জিভটা কেটে নিতে হবে। আপনি অনেক অসহায় মানুষের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য আপনাকেও আমরা আগুনে পুড়িয়ে মারব। তাতে কিছুটা শোধবোধ হবে।

এবারে তেজেন্দ্রনারায়ণ সত্যিকারের ভয় পেলেন। কানাই এমন ঠান্ডা গলায় কথা বলছে, যেন সে সত্যিই তাঁকে মেরে ফেলবে। এইরকমভাবে তাঁর মৃত্যু হবে?

তিনি অন্য লোকগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন,—কী রে, তোরাও তো আমার প্রজা? তোরাও এই কানাইয়ের কথা মেনে নিবি? আমি কি প্রজাদের জন্য ভালো কিছু করিনি? তোরা এই কানাইকে বন্দি কর, আমি তোদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে দেব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি!

একথা শুনে অন্যরা হো-হো করে হেসে উঠল।

একজন এগিয়ে এসে খুব করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল তেজেন্দ্রনারায়ণের মুখে।

কানাই বলল,—জমিদারবাবু, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা ডাকাতের দল নই। আমরা স্বদেশি। আমরা পরাধীন দেশ-জননীকে বিদেশিদের কাছ থেকে মুক্ত করতে চাই। আপনার মতো অত্যাচারী জমিদারদের শাস্তি দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু হাতে আরও বড় কাজ আছে। আপনার চেয়েও বেশি অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেবকে খুন করতে হবে দু-একদিনের মধ্যেই। উনি এর মধ্যে তিনজন স্বদেশিকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। এবার আমরা ওঁকে খতম করব।

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—এত সোজা? ব্রিটিশ রাজত্বে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে তোরা মারবি কী করে? চতুর্দিকে পুলিশ পাহারা।

কানাই বলল,—হ্যাঁ, এতই সোজা। কারণ, আমাদের কারুরই প্রাণের পরোয়া নেই। আমরা দশজনেও যদি মরি, তাতেও একজন সাহেবকে মারতে পারব না?

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—তার বদলে আমি যদি সেই ভার নিই?

কানাই বলল,—তার মানে?

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—আমি অনেক পাপ করেছি ঠিকই। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোদের চেয়ে আমার পক্ষে যখন-তখন ডগলাস সাহেবের সঙ্গে দেখা করা অনেক সহজ। আমি জরুরি কাজের কথা বলার নামে ডগলাস সাহেবের সামনে গিয়ে বসতে পারি। তারপর সোজাসুজি গুলি করব, যাতে ওর বাঁচার আশা না থাকে।

কানাই বলল,—তারপর আপনার কী হবে?

তেজেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—তারপর যদি ধরা পড়ি, যদি ফাঁসি হয়, তাও ভালো। এভাবে মরার চেয়ে তো অনেক ভালো।

অন্য একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—সব ধাপ্পা। কানাই ওর কথা একেবারে বিশ্বাস কোরো না। ওকে ছেড়ে দিলে, ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে আমাদের কথা জানিয়ে দেবে। তারপর ভালোমানুষ সেজে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আশ্রয় নেবে।

তেজেন্দ্রনারায়ণ বলে উঠলেন,—না, না, না!

কানাই বলল,—এই জমিদারবাবুর একটা গুণ আছে। খুব ভালো রিভলবার চালাতে জানে। উনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটকে এক গুলিতে খতম করতে উনিই পারবেন। আর যদি মিথ্যে হয়, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহলে আমাদের কাজ কিছুটা পিছিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা প্রতিশোধ নেবই। আমরা যদি ধরা পড়ি, অন্যরা নেবে। আমি এই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। তোমাদের কার কী মত বলো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সবাই একে-একে কানাইয়ের সমর্থনে হাত তুলল।

এরপর হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই তেজেন্দ্রনারায়ণকে তোলা হল ঘোড়ার গাড়িতে। দুজন বসল তাঁর দুপাশে। কানাই নিজে চালাতে লাগল জুড়িগাড়ি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলো থেকে আধমাইল দূরে এসে থামল সেই গাড়ি।

তেজেন্দ্রনারায়ণের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। একটু দূরের একটা গাছের কোটরে রিভলবারটা রেখে এসে কানাই বলল,—এবার আপনি যান, আপনার জিনিস নিয়ে নিন। তারপর আপনার যা ধর্ম হয় তাই-ই করুন। শুধু মনে রাখবেন, বিশ্বাসঘাতকদের স্থান হয় নরকে। আমরা প্রতিশোধ নেবই!

তেজেন্দ্রনারায়ণ হেঁটে গিয়ে রিভলবারটা হাতে নেবার আগেই কানাই উলটোদিকে চালিয়ে দিল ঘোড়ার গাড়ি। তখন সবে ভোর হয়ে এসেছে।

এসব অনেক দিন আগেকার কথা। সুবুদ্ধিনগরের চৌরাস্তার মোড়ে আছে তেজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর একটা মূর্তি। তার নীচে লেখা আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা। এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে হত্যা করে তিনি শহিদ হয়েছেন।

প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসে তাঁর মূর্তিতে মালা দেওয়া হয়। তাঁর পুরোনো পরিচয় কেউ জানে না। আর কানাই চন্দ্র দাসের নাম কেউ মনেও রাখেনি।

হারানো সেই খাম

ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে গিয়ে একটা অসুবিধে হল। খুচরো নেই।

ভাড়া হয়েছে একশো পাঁচ টাকা। বাবার কাছে সব একশো টাকার নোট। পাঁচ টাকার জন্য ড্রাইভার একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে পারবে না।

বাবা রুকুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর কাছে আছে পাঁচ টাকা?

রুকু বলল, ট্রেনে যে ঝালমুড়ি খেয়ে ফেললাম। এখন আছে মোটে তিন টাকা।

বাবা এদিক-ওদিক তাকালেন। এক্ষুনি একটা জরুরি টেলিফোন করা দরকার। শুধু-শুধু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তার উলটোদিকে একটা পানের দোকান। বাবা রুকুর হাতে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, ওর কাছ থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আয় তো! ওর কাছেও যদি ভাঙানি না থাকে, এমনিই দু-টাকা চেয়ে নিয়ে আয়, পরে শোধ দিয়ে দেব।

রুকু দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার!

বাবা বললেন, আপনি ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে ওই দোকানের কাছে যান, আমার ছেলে বাকি দু-টাকা দিয়ে দেবে।

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল সে দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মনে পড়ল, খামটা? সেটা ট্যাক্সিতে রয়ে গেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে বাবা চেঁচিয়ে বললেন, রুকু, রুকু, ট্যাক্সিটা ছাড়িস না, দাঁড়াতে বল!

তিনিও দৌড়ে গেলেন গাড়িটার কাছে।

কিন্তু সেখানে খামটা নেই।

একটা বড় লম্বা খাতার সাইজের খাঁকি রঙের খাম। অত্যন্ত দরকারি কাগজপত্র রয়েছে সে খামে, হারালে মহা মুশকিল হবে।

ট্যাক্সিতে নেই, তা হলে কোথায় গেল?

বাবা চিন্তা করতে লাগলেন। ট্যাক্সিটা ধরা হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে। তবে, কি হাওড়া স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে হাত থেকে পড়ে গেছে?

তা হলে কি আর সেটা ফেরত পাওয়া যাবে? রেল স্টেশনে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে। অনেকে দৌড়োয়। একটা খাম মাটিতে পড়ে থাকলে সবাই সেটা মাড়িয়ে চলে যাবে। কেউ হয়তো শুট করে ফেলে দেবে লাইনে।

তবু শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিয়েছে, বাবা বললেন, দাঁড়ান, আমরা আবার হাওড়া স্টেশনে ফিরে যাব!

রুকুকে বললেন, চট করে গিয়ে তোর মাকে একটা খবর দিয়ে আয়, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।

রুকুকে আর বাড়ির ওপর তলায় যেতে হল না। তাদের বাড়ির ছেলে রঘুকে দেখে বলে দিল।

ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করতেই রুকু জিজ্ঞেস করল, বাবা, খামটায় কী ছিল?

বাবা অন্যমনস্কভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে বললেন, সে তুই বুঝবি না!

তারপরই তিনি বললেন, বুঝবি না কেন? ক্লাস নাইনে পড়িস! ওতে ছিল আমার অফিসের জরুরি কিছু দলিল। দলিল মানে জানিস, ইংরেজিতে বলে ডকুমেন্টস! কাল সকাল দশটার মধ্যে সেটা একজন ব্যারিস্টারকে পৌঁছে দেওয়ার কথা। কাল হাইকোর্টে কেস উঠবে। তখন ওই দলিলগুলো দেখাতে না পারলে আমাদের কোম্পানির খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। ছি-ছি-ছি-ছি, খামটা হারিয়ে ফেললে আমি আর অফিসে মুখ দেখাতে পারব না।

রুকু বলল, তোমার হাতের ব্যাগে কেন খামটা রাখোনি?

বাবা বললেন, খামটা বড়। ব্যাগে ঢোকাতে গেলে ভাঁজ করতে হত। ভাঁজ করা বারণ ছিল, তাই খামটা আলাদা রেখেছিলাম! তুই কি হাওড়া স্টেশনে আমার হাতে খামটা দেখেছিলি?

রুকু চুপ করে রইল। সে লক্ষ করেনি। ট্রেন থেকে নামার পরেই এত ভিড় ছিল।

বাবা বললেন, হাওড়া স্টেশনে নিশ্চয়ই লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড অফিস আছে। লোকে হারানো জিনিস পেলে জমা দেয়। খামটার মধ্যে টাকাপয়সা তো কিছু নেই। কেউ খামটা তুলে নিলেই বুঝবে, ভেতরের কাগজ পত্রগুলো নিশ্চয়ই খুব দরকারি। যদি জমা দেয়—

রুকুর একটা কথা মনে এল, কিন্তু বলল না।

খামটা তো বাবা ট্রেনের কামরাতেও ফেলে আসতে পারেন। স্টেশনেই যে-হাত থেকে পড়ে গেছে, তার কী মানে আছে?

হাওড়া স্টেশনে এসে আর খুচরোর সমস্যা হল না। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ভেতরে এসে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করতেই পাওয়া গেল হারানো-প্রাপ্তি কাউন্টার। একজন লোক বসে আছে সেখানে।

বাবার প্রশ্ন শুনে লোকটি বললেন, খাম? শুধু খাম? না, খাম কেউ কোনোদিন জমা দেয় না। দেখুন না, ব্যাগ আছে অনেকগুলো, মাফলার, জুতো, কানের দুল, এরকম কত কিছু আছে, কিন্তু খাম নেই!

বাবা বললেন, চল তো রুকু, ন'নম্বর প্ল্যাটফর্মটা খুঁজে দেখি। যদি সেখানে এখনও পড়ে থাকে।

সন্ধে হয়ে গেছে। বিকেলবেলা প্ল্যাটফর্মে যত ভিড় ছিল, এখন আর ততটা নেই। এক-এক জায়গায় কুলিরা বসে গল্প করছে।

বাবা সেই কুলিদের জিজ্ঞেস করলেন, একঠো খাম দেখা?

কুলিরা প্রথমে বুঝতেই পারে না। খাম? সে আবার কী? হিন্দিতে বলে লেফাফা। যেখান দিয়ে হাজার-হাজার লোক যাওয়া-আসা করে, সেখানে একটা লেফাফা পড়ে আছে কি না, কে দেখবে?

বাবা বললেন, তুই আর আমি দুদিকের রেল লাইন দেখি। যদি নোংরার মধ্যে, জলকাদার মধ্যেও পড়ে থাকে, তাও তুলতে হবে।

এ প্ল্যাটফর্মে এখন ট্রেন নেই। বাবা আর ছেলে দুদিকের রেল লাইন দেখল ভালো করে। কিন্তু কোনো খামের চিহ্ন নেই।

এবার বাবা নিজেই বললেন, যদি ট্রেনের মধ্যেই ফেলে এসে থাকি?

সেটাই বেশি বাস্তব। কিন্তু সেখানে কেউ দেখলেও কি গ্রাহ্য করবে? হারানোপ্রাপ্তির লোকটাই তো বলল, শুধু খাম কেউ জমা দেয় না।

সেটা ছিল লোকাল ট্রেন। সে-ট্রেন এখন কোথায় চলে গেছে, কে জানে!

হতাশ ভাবে বাবা একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন।

কিছুদিন আগেই বাবার হার্টের অসুখ হয়েছিল, অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন অনেকটা সেরে উঠেছেন, তবু মা তাঁকে কোথাও এখন একা যেতে দেন না। অফিসের কাজে এক বেলার জন্য বাবাকে ট্রেনে করে এক জায়গায় যেতে হবে শুনে মা রুকুকে সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

রুকু জানে, বেশি দুশ্চিন্তা করলে হার্টের অসুখ বেড়ে যায়। বাবার মুখখানা দেখে তার খুব কষ্ট হল। কিন্তু সে এখন কী করবে।

বাবা ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, আমাদের দুপুরে পলাশপুরে যেতে হল, সেখানে আমাদের অফিসের একজন মালিক থাকেন। তাঁর খুব জ্বর বলে অফিসে আসছেন না। দলিলটায় তাঁর একটা সই দরকার ছিল। সই-টই সব ঠিকঠাক করানো হল, তারপর খামটা আমি হারিয়ে ফেললাম? কালকে হাইকোর্টে কেস উঠলে আমরা হেরে যাব। সব দোষ পড়বে আমার ওপর।

রুকু বলল, বাবা, আমরা পলাশপুর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসেছিলাম।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, ফেরার ট্রেন লেট ছিল, প্রায় দেড় ঘণ্টা। তবে কি সেখানে ফেলে এসেছি?

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, চল, পলাশপুর যেতে হবে আবার। শেষ চেষ্টা করে দেখতেই হবে। যদি সেখানে ফেলে আসি...হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার যতদূর

মনে পড়ছে, ওখানে বেঞ্চের ওপর খামটা রেখেছিলাম...আমার তখন একটু ঘুম এসে গিয়েছিল।

আধ ঘণ্টা পরে একটা লোকাল ট্রেন। পলাশপুর পৌঁছোতে লাগল এক ঘণ্টা দশ মিনিট।

দিনেরবেলা এ-স্টেশনের এক রকম চেহারা ছিল, এখন একেবারে বদলে গেছে!

তখন অনেক দোকানপাট ছিল, অনেক লোক ছিল। এখন একেবারে নিঝুম।

ছোট স্টেশন, প্ল্যাটফর্মের ওপর কোনো ছাউনি নেই। শুধু কয়েকটা গাছ, আর এক-একটা গাছের তলায় একটা করে বেঞ্চ। সব দোকান বন্ধ, আলোও জ্বলছে না। বোধহয় আজ রাত্তিরে এখানে আর কোনো ট্রেন থামবে না। তাই চলে গেছে সবাই।

কারুকে যে কিছু জিজ্ঞেস করা হবে, তার উপায় নেই। শুধু কয়েকটা কুকুর ঘুমোচ্ছে এখানে-ওখানে।

অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজে-খুঁজে ওরা একটা বেঞ্চের কাছে এল! এখানেই বসে ওরা অপেক্ষা করছিল বিকেলে।

ফাঁকা বেঞ্চ। তার তলায় কিংবা আশপাশে সে-খামের চিহ্নমাত্র নেই।

শেষ আশাও গেল। আর সে-খাম পাওয়া যাবে না।

বাবা বললেন, রুকু, খামটা যদি তোর হাতে দিতাম, তা হলে নিশ্চয়ই হারাত না।

রুকু বলল, দিলে না কেন?

বাবা বললেন, আমারই দোষ। তখন ভেবেছিলাম, তুই ছেলেমানুষ, ঠিক রাখতে পারবি না। আসলে, ছেলেমানুষদের কোনো একটা দায়িত্ব দিলে তারা ঠিকই দায়িত্ব নিতে পারে।

রুকু বললে, বাবা, ও-খামটা না পাওয়া গেলে কী হবে?

বাবা বললেন, কালকের পরে পেলেও তো কোনো লাভ হবে না। পাওয়া যাবে না বোঝাই যাচ্ছে। আমাকে ওই চাকরি ছেড়ে দিতে হবে!

রুকুর মনে হল, চাকরি ছেড়ে দেওয়া বোধহয় খুব খারাপ ব্যাপার নয়। তখন বাবা অনেক ছুটি পাবেন, বাড়িতে থাকবেন বেশ।

কিন্তু এখন ফেরা হবে কী করে?

একটু পরেই ঝমঝম করে একটা ট্রেন চলে গেল, কিন্তু থামল না এ স্টেশনে।

ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর রুকু দেখল, দূরে একটা লোক হাতে একটা লাল লণ্ঠন দোলাচ্ছে।

বাবা বললেন, রুকু, ওই লোকটিকে জিজ্ঞেস করে আয় তো, এরপরে কখন কোন ট্রেন থামবে!

রুকু দৌড়ে গেল সেদিকে।

কিন্তু লোকটি কাছে পৌঁছাবার আগেই সে যেন মিলিয়ে গেল কোথায়!

এ কী-রে বাবা, লোকটা কি অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

রুকুর একবার গা-ছমছম করে উঠল। তারপরই ভাবল, যাঃ! মিলিয়ে যাবে কেন, নিশ্চয়ই লাইনের পাশে নেমে গেছে।

লাইনের দিকে গিয়ে উঁকি মারতেই রুকুর বুক আবার কেঁপে উঠল।

না, লোকটির কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু লাইনের পাশে কী পড়ে আছে? একটা চৌকো খাম না?

লাফিয়ে নেমে পড়ে রুকু তুলে নিল খামটা, হ্যাঁ, বেশ বড় খাম, মুখটা বন্ধ করা।

আনন্দে বুক ভরে গেল রুকুর। তার বাবার মুখে এবার হাসি ফুটবে। এতদূরে ফিরে আসার পরিশ্রম সার্থক।

কাছাকাছি এসে রুকু চিৎকার করে বলল, বাবা, পেয়েছি, পেয়েছি!

বাবা দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলেন, বোধহয় কাঁদছিলেন।

মুখ তুলে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, পেয়েছিস? সত্যি?

খামটা হাতে নেওয়ার পর তাঁর মুখ আবার কুঁচকে গেল।

তিনি বললেন, এ কী, এটা তো আমার খাম নয়! অনেকটা আমারটারই মতন, কিন্তু এটার রং হলুদ। অন্ধকারে অবশ্য হলুদ আর খাঁকির তফাত বোঝা যায় না।

আকাশ মেঘলা-মেঘলা, আবার একটু জ্যোৎস্নাও আছে।

প্রথমে যেমন সবদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা মনে হচ্ছিল, এখন চোখ অনেকটা সয়ে গেছে। একটু-একটু দেখা যায়।

খামটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বাবা বললেন, এটাকেও কেউ দেখতে পেয়ে তুলে নেয়নি। শুট করে লাইনে ফেলে দিয়েছে। এটার মধ্যে কী আছে কে জানে?

সাবধানে তিনি খামটা না ছিঁড়ে, খুলে ফেললেন।

ভেতরে রয়েছে অনেক চিঠিপত্র আর একটা পঞ্চান্ন হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট!

কম আলোয় চিঠিগুলো পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না।

বাবা বললেন, খাম মাটিতে পড়ে থাকলে কেউ তুলেও দেখে না। পা-দিয়ে ঠেলে দেয়। এর মধ্যে রয়েছে এতগুলো টাকার ব্যাপার। চিঠিগুলোও খুব জরুরি হতে পারে। যে হারিয়েছে, সে এতক্ষণে মাথা চাপড়াচ্ছে।

খামটার ওপর একজনের নাম আর ঠিকানা লেখা আছে। ঠিকানাটা বেহালার দিকে একটা রাস্তার।

বাবা বললেন, রুকু, যার খাম তাকে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে আমরা ফিরব কী করে? যদি আর ট্রেন না থাকে? সারারাত আমাদের এখানে বসে থাকতে হবে। স্টেশনে তো একটা লোকও দেখছি না!

রুকু বলল, লাল লণ্ঠন হাতে সেই লোকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল!

বাবা বললেন, আমার অফিসের সাহেবের বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাব কোন মুখে? কী বলব!

রুকু জিজ্ঞেস করল, বাবা, খামটা ও-বাড়িতেই পড়ে নেই তো?

বাবা বললেন, না, আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেটা নিয়ে আমি বেরিয়েছি। স্টেশনে একবার খুলেও দেখেছি। ট্রেনেও সেটা নিয়ে উঠেছি কি না মনে করতে পারছি না। আমাদের খামটার ওপরে তো কোনো ঠিকানাও লেখা নেই।

স্টেশনের শুনশান অবস্থা দেখেই মনে হচ্ছে, আর কোনো ট্রেন আসার আশা নেই।

রুকু টিকিট ঘরটার দিকে একবার দেখতে গেল।

সে ঘরের ভেতরেও কেউ নেই। কিন্তু একটু দূরে একজন ভিখিরি-মা তার বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে শুয়ে আছে।

রুকু সেই ভিখিরি-মাকেই জিজ্ঞেস করল, শুনুন, এরপর ট্রেন কখন আসবে?

ভিখিরি-মা হাই তুলে বলল, পরের ট্রেন সেই ভোর-পাঁচটায়!

রুকু বলে ফেলল, যাঃ! কী হবে!

ফিরে এল বাবার কাছে। বাবা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। ধরা গলায় বললেন, এখানে বোস রুকু! যা হওয়ার তা হবে!

ঠিক তখনই সিটি দিতে-দিতে এগিয়ে এল একটা ট্রেন।

বাবা ধরেই নিলেন, এটাও ঝড়ের বেগে চলে যাবে।

ট্রেনটা আলো ফেলে স্টেশনে ঢুকে বেরিয়ে যাচ্ছে, রুকু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ট্রেনটা স্লো হয়ে যাচ্ছে বাবা! থামছে!

সত্যিই ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে একটু দূরে থেমে গেল।

অনেকসময় এরকম হয়। কোনো স্টেশনে একটা ট্রেনের থামার কথা নয়, কিন্তু সিগনাল না পেয়ে থেমে যায়।

বাবা বললেন, দৌড়ো, রুকু!

দুজনে প্রাণপণে ছুটে এসে উঠে পড়ল একেবারে শেষে গার্ডের কামরায়।

আশ্চর্য ব্যাপার, তক্ষুনি আবার চলতে শুরু করল ট্রেনটা। যেন, ওদের দুজনকে তোলবার জন্যই ট্রেনটা আধমিনিট দাঁড়িয়েছে!

গার্ডসাহেবকে বাবা বললেন, আমরা খুব বিপদে পরেছিলাম...

গার্ড সাহেব সবটা না শুনেই বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

তিনি মন দিয়ে পড়তে লাগলেন একটা ডিটেকটিভ বই।

ট্রেনটা হাওড়ায় পৌঁছল রাত পৌনে বারোটার সময়।

কামরা থেকে নেমেই বাবা বললেন, সেই খামটা!

রুকু বলল, এই তো, আমার হাতে। আমি হারাব না।

খামটার ওপর লেখা, সুকুমার দাস, ৫৭ নম্বর বি এন রায় রোড, বেহালা।

বাবা বললেন, কাল সকালেই খামটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে। আমাদেরটা পেলাম না বটে, তবু তো একজনের কিছুটা উপকার করা হবে!

ট্যাক্সি আছে কয়েকটা। প্রথম যে ট্যাক্সিটা এগিয়ে এল, তার ড্রাইভারকে দেখে রুকু চমকে উঠল। এ সেই বিকেলের ড্রাইভার। একই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিনে দুবার দেখতে পাওয়া খুবই কম ঘটে।

রুকু চিনতে পারছে, বাবা লক্ষ করেননি।

ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করার পর ড্রাইভারটি বলল, খামটি পেয়েছেন তা হলে? আপনাদের পরিশ্রম সার্থক।

রুকু বলল, না, পাইনি।

ড্রাইভার বলল, হাতে একটা খাম দেখছি।

রুকু বলল, এটা অন্য একজনের। আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি।

ড্রাইভার বলল, অন্য একজন হারিয়ে ফেলেছে? ভেতরে কিছু দামি জিনিস আছে? তা হলে সে ভদ্রলোক এখন হায়-হায় করছে!

বাবা হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, বেহালার দিকে চলুন!

রুকু বলল, বেহালা? আমরা এখন বাড়ি যাব না? মা চিন্তা করছে।

বাবা বললেন, বেহালা ঘুরে যেতে বড় জোর আর আধঘণ্টা বেশি সময় লাগবে! যার খাম হারিয়েছে, তার সারারাত ঘুম হবে না! তাকে এখন ফিরিয়ে দিলে তবু বাকি রাতটা ঘুমোতে পারবে!

বেহালায় গিয়ে বাড়ি খুঁজে পেতে অনেকটা সময় লাগল। বড় রাস্তা নয়, গলির মধ্যে।

বাড়িটা একেবারে অন্ধকার। পুরো পাড়াটাতেই কোনো বাড়িতে আলো নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেই ঠিকানায় বেল বাজাতেই ওপর থেকে একজন কেউ বলল, কে?

বাবা বললেন, সুকুমার দাস আছেন।

ওপর থেকে সেই লোকটি বলল, আছেন। কিন্তু এখন দেখা হবে না! মানুষ কি একটু ঘুমোতেও পারবে না!

বাবা বললেন, বিশেষ দরকার আছে। এক মিনিটের জন্য নীচে আসুন।

একজন লোক নীচে এসে দরজা খুলে খুব রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কী চাই? চাঁদা?

রুকু খামটা বাড়িয়ে দিয়ে বল, এটা আপনাদের?

লোকটি বলল, কী?

তার চোখ যেন বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। খামটা হাতে নিয়ে ভেতরটা শুধু একবার দেখলেন।

তারপর বলল, এটা...আপনারা

বাবা বললেন, আমরা পলাশপুর গিয়েছিলাম, সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছি। নাম লেখা আছে।

লোকটি বলল, এ-খামটা না পেলে যে আমাদের কত ক্ষতি হত, তা আপনাদের বোঝাতে পারব না। আপনার পায়ের ধুলো নেব?

বাবা তাড়াতাড়ি না-না-না বলে সরে গেলেন।

আবার উঠে পড়া হল ট্যাক্সিতে।

বাড়ি ফেরার পর ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল একটা নিদারুণ চমক।

আবার ট্যাক্সি ভাড়ার খুচরোর সমস্যা। ওপর থেকে টাকা আনতে হবে। রুকু দৌড়ে চলে গেল।

টাকা নিয়ে ফিরে এল লাফাতে-লাফাতে। তার হাতে একটা বড় খাম। চেঁচিয়ে বলল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

একটু আগে কেউ একজন এসে এই খামটা দিয়ে গেছে। সে তার নাম বলেনি। দিয়েই চলে গেছে, কিন্তু খামের ওপরে তো কোনো নাম লেখা নেই, তবু সে এই ঠিকানায় এল কী করে?

সে সমস্যার সমাধান কোনোদিন হয়নি। সেই উপকারী বন্ধুটির নাম জানা যায়নি কখনও।

জোজো-সন্তুর গল্প কাকাবাবুর উত্তর

রান্নাঘরে ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানাচ্ছে জোজো। এর মধ্যেই নষ্ট হয়েছে দুটো ডিম।

মা আর বাবা গেছেন দক্ষিণেশ্বর। রঘুর জ্বর। আজ দুপুরে রান্না বন্ধ। মা-বাবা ফেরার সময় চিনে খাবার কিনে আনবেন।

কাকাবাবু মিশরের কয়েকখানা পুরোনো ম্যাপ নিয়ে মেতে আছেন ক'দিন ধরে। মানচিত্র-চর্চা করা তাঁর নেশা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি কী যে পান, কে জানে!

বসবার ঘরে আড্ডা মারছিল সন্তু আর জোজো।

এগারোটা বাজবার কিছুক্ষণ আগে সন্তু বলল, "তুই একটু বোস জোজো, আমি একটু আসছি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু বলল, "রান্নাঘরে। রোজ এগারোটার সময় কাকাবাবুর কফি খাওয়া অভ্যেস। আজ তো রঘু নেই, বাড়ি চলে গেছে। আমিই কফি বানিয়ে দেব।"

"তুই কফি বানাতে পারিস?"

"কফি বানানো তো সবচেয়ে সহজ। খানিকটা জল গরম করে কফি গুলে দিলেই হয়। কাকাবাবু চিনি-দুধও মেশান না। কালো কফি। আমি এটা পারি। আর কোনো রান্নাবান্না জানি না।"

"চল, আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি রান্নাঘরে। আমরাও কফি খেতে পারি। কাকাবাবু শুধু কফি খান? সঙ্গে কিছু লাগে না?"

"দু-একখানা বিস্কুট দেওয়া হয়। তা-ও উনি খেতে চান না।"

রান্নাঘরে ঢোকার মুখেই রয়েছে ফ্রিজ।

জোজো সেটা খুলে দেখল।

কৃষ্ণনগর থেকে এক ভদ্রলোক আগের দিন কাকাবাবুর জন্য মিষ্টি দিয়ে গেছেন। জোজো সেই বাক্সটা বার করে বলল, "এ তো দেখছি সরপুরিয়া আর সরভাজা। কাকাবাবু তো মিষ্টি ভালোবাসেন না। আমি একটু টেস্ট করে দেখব?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, নে না।"

জোজো গপগপ করে চারখানা মিষ্টি টেস্ট করে দেখল।

তারপর অনেকগুলো ডিম সাজানো রয়েছে দেখে সে আবার বলল, "সন্তু, বড্ড খিদে পেয়েছে, আমরা একটা করে ওমলেট খেতে পারি না?"

সন্তু বলল, "আমি ডিম সেদ্ধ করে দিতে পারি। ওমলেট বানাতে জানি না ভাই!"

জোজো বলল, "আমি বানাব? কতরকম ওমলেট জানি, মাশরুম-ওমলেট, চিজ-ওমলেট, কোরিয়ান ওমলেট, হাওয়াইয়ান ওমলেট! একবার নেপালের এক রানি এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, বাবার কাছে একটা আংটি নিতে। আমি তাঁকে এমন মাশরুম-ওমলেট বানিয়ে খাওয়ালুম যে, তিনি বললেন, এটা খেতেই তোমাদের বাড়িতে আবার আসতে হবে! আজ তোকেও একটা বানিয়ে খাওয়াচ্ছি!"

সন্তু বলল, "অত কিছু করার দরকার নেই। রান্নাঘর নোংরা করলে মা রেগে যায়। তা ছাড়া, মাশরুম-টাসরুম কোথায় পাবি?"

জোজো বলল, "চিজও তো নেই দেখছি। তা হলে এক কাজ করা যাক। পাউরুটি রয়েছে, ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানানো সোজা। কফির সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্ট পাঠিয়ে দিয়ে কাকাবাবুকে চমকে দেব।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু কফির সঙ্গে কিছু খেতে চান না তো বললাম তোকে!"

জোজো বলল, "ফ্রেঞ্চ টোস্ট দেখলে ঠিকই খাবেন। আগেরবার কুলু-মানালিতে গিয়ে দেখেছি, কাকাবাবু এটা ভালোবাসেন!"

জোজো যা বলবে, তা তো করবেই!

একটা বড় বাটিতে গোটা ছয়েক ডিম ভেঙে নিয়ে ফেটাতে শুরু করল। তার মধ্যে একটা ডিম হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে।

তারপর কড়াইয়ে তেল ঢেলে তা গরম হওয়ার আগেই তার মধ্যে ছেড়ে দিল এক পিস ডিমে চোবানো পাউরুটি।

সঙ্গে সঙ্গে চিড়বিড় শব্দ হতে লাগল আর তেল ছিটকে এল গায়ে।

সেই ডিম-পাউরুটি এমনভাবে লেগে গেল কড়াইয়ে যে, চেঁচে-চেঁচেও তোলা যায় না। দেখতে দেখতে সেটা দলা পাকিয়ে হয়ে গেল ঝিরকুট্টি কালো।

সেগুলো ফেলে দিয়ে, কড়াই পরিষ্কার করে আবার ঢালা হল তেল। এবারে তেল গরম হওয়ার পর ছাড়া হল আবার এক পিস ডিম-রুটি। বেশ ভাজা হচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "নুন দিয়েছিস জোজো?"

জোজো বলল, "ও, তাই তো, তাই তো!"

নুন খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। ওপরে খানিকটা নুন ছড়িয়ে টোস্টটা যখন তোলা হল, তখন দেখা গেল, তার একদিক কালো, অন্য দিকটা ভাজাই হয়নি!

জোজো বিরক্তভাবে বলল, "নুনের কথাটা আগে বলিসনি কেন? এটা ঠিক সময় উলটে দিতে হয়। ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানানো অত সহজ নয়! এইবার দ্যাখ!"

আবার কড়াই পরিষ্কার, আবার তেল ঢালা।

ছেড়ে দেওয়া হল ডিম-রুটি।

জোজো একটা খুন্তি এমনভাবে বাগিয়ে ধরে আছে, যেন অপারেশনের আগে

ডাক্তারের হাতে ছুরি।

আর সন্তু তাকিয়ে আছে ব্যগ্রভাবে।

একটু পরেই জোজো বলল, "এইবার উলটে দিতে হবে।"

খুন্তিটা দিয়ে সে এমনভাবে ওলটাল যে, টোস্টটা লাফিয়ে উঠে এল। জোজো সেটা লুফে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। সন্তু তবু লুফে নিল শেষ মুহূর্তে, কিন্তু সেটা এতই গরম যে, ধরে রাখা গেল না, পড়ে গেল মাটিতে!

আর একটা নষ্ট।

জোজো এক ধমক দিয়ে বলল, "তুই কী করলি সন্তু? এমন একটা সহজ ক্যাচ মিস করলি? কোনোদিন ক্রিকেট খেলিসনি?"

সন্তু বলল, "রান্না করার সময় যে ক্যাচ লুফতে হয়, তা আমি জানব কী করে?"

জোজো বলল, "সবকিছুর জন্য সবসময় তৈরি থাকতে হয়।"

সন্তু বলল, "ভাই জোজো, কাকাবাবুকে আর ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাওয়ানো হবে না বোঝাই যাচ্ছে। শুধু কফি দিতেই দেরি হয়ে যাবে। তুই সর, আমি কফিটা বানিয়ে ফেলি। যেটুকু ডিম গোলা বাকি আছে, তা পরে আমরা একসঙ্গে ভেজে খেয়ে ফেলব। পুড়ে কালো হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই!"

জোজো বলল, "পুড়বে কেন?" এর পর ওই ডিম গোলা দিয়ে আমি ককেশিয়ান পুডিং বানাব!"

স্টোভে জলের কেটলি বসিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই নেপালের রানিকে কী করে মাশরুম টোস্ট খাওয়ালি রে? কে ক্যাচ ধরেছিল?'

এবারে জোজো একগাল হেসে বলল, "তুই তো আসল কারণটাই জানিস না। আমাদের বাড়িতে এরকম আজেবাজে ডিম কক্ষনো আসে না। সব স্পেশ্যাল ডিম, অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। কী চমৎকার স্বাদ। রান্না করাও সোজা।"

সন্তু বলল, "অর্ডার দিয়ে আনাতে হয় মানে? হাঁস-মুরগিকে অর্ডার দিতে হয়, অন্যরকম ডিম পাড়ো!"

জোজো বলল, "তুই কি ভাবছিস, সেটা অসম্ভব নাকি? আমার বাবা হাঁস-মুরগির ভাষা জানেন। বারুইপুরে এক চাষির বাড়িতে পাঁচটা হাঁস আছে। সেগুলো আমাদেরই পোষা বলতে পারিস। সেই হাঁসগুলোকে আগে থেকে মাশরুম খাইয়ে দিলে ওদের ডিমের মধ্যেই মাশরুম থাকে। তা ছাড়া ওদের বলে দিলেই সেদ্ধ ডিম আর ওমলেটের জন্য ওরা আলাদা ডিম পাড়ে। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই!"

সন্তু সরলভাবে বলল, "সেই হাঁসগুলো সোনার ডিম পাড়তে পারে না? যদি বলে দিস?"

জোজো বলল, "তুই বিশ্বাস করছিস না? জানিস, সত্যিকারের বাছাই করা হাঁসের ডিম দিয়ে কত কাজ করা যায়? ডিম খুব ভালো মন্ত্র নিতে পারে। মন্ত্র-পড়া ডিম

দিয়ে আমরা একবার জীবন বাঁচিয়ে দিলাম।"

সন্তু বলল, "শোনা যাক সেই গল্পটা।"

জোজো বলল, "গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তুই জানিস, আমরা একবার টাকলা মাকান মরুভূমি পার হয়েছিলাম পায়ে হেঁটে। আমরা মানে, তিনজন, বাবা, আমি আর মারটিন বোরম্যান নামে একজন সুইডিশ অভিযাত্রী। তিনি এই ঘটনা নিয়ে একটা বইও লিখেছেন। তুই পরে পড়ে নিস। সেই মরুভূমিতে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছিল।"

সন্তু বলল, "দাঁড়া, জলটা ফুটে গেছে।"

জোজো বলল, "না, ভালো করে ফোটেনি। টগবগ করেনি। তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? জল বেশি ফুটলেও ক্ষতি হয় না।"

সন্তু বলল, "বাষ্প হয়ে উপে যায়। তারপর আকাশে মেঘ হয়।"

জোজো বলল, "মরুভূমিতে কিন্তু মেঘ হয় না। সেখানে জল সাঙঘাতিক দামি। এক ফোঁটাও নষ্ট করা চলে না। আমাদের সঙ্গে ছিল অনেক জল আর খাওয়ার জন্য শুধু পাউরুটি আর ডিমসেদ্ধ!"

সন্তু বলল, "বারুইপুরের হাঁসের স্পেশ্যাল ডিম?"

জোজো বলল, "ঠিক ধরেছিস। অর্ডার দিয়ে স্পেশ্যাল ডিম নিয়ে গিয়েছিলাম পঞ্চাশটা, তাও সাধারণ ডিমেরচেয়ে দু'গুণ বড়। দুটো ডিম খেলেই পেট ভরে যায়!"

সন্তু বলল, "অত ডিম পাড়ার জন্য পাঁচটা হাঁসকে ওভারটাইম খাটতে হয়েছিল।"

এ-কথাটা গ্রাহ্য না করে জোজো বলল, "দেড় দিনের একটানা জার্নি। এর মধ্যে কোথাও মরূদ্যান নেই। রাত্তিরে বালিতে শুয়েই ঘুমনো। এর মধ্যে ঝড় উঠলে আর প্রাণে বাঁচার উপায় নেই।"

সন্তু বলল, "ঝড় ওঠেনি বোঝাই যাচ্ছে। কারণ তুই বেঁচে আছিস!"

জোজো বলল, "ঝড়ের চেয়েও বড় বিপদ হতে পারে। আমি সংক্ষেপে বলছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ রে, কফির দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

জোজো বলল, "শোন্ না। আচমকা দেখি, সামনে একটা সিংহ!"

"মরুভূমিতে সিংহ?"

"মরুভূমিতে সিংহ থাকে না? তোর জেনারেল নলেজ বড্ড কম রে সন্তু। সিংহের গায়ের রং কীরকম? একেবারে বালির মতন নয়? তখন বিকেল শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ সিংহটা বেরিয়ে এল একটি বালিয়াড়ির পাশ থেকে। গ-র-র-র করে গর্জন করছে। খুব ক্ষুধার্ত, বোঝাই যায়! আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ভয় পেয়ে মারটিন বোরম্যান দৌড়বার চেষ্টা করছিল। বাবা তাকে এক ধমক দিলেন। দৌড়ে সিংহের হাত থেকে বাঁচা যায়? তবু আমরা বেঁচে গেলুম কী করে বল তো?"

"মন্ত্রবলে।"

"ঠিক বলেছিস। বাঁচিয়ে দিল ডিমগুলো। বাবা মন্ত্র পড়ে ডিম ছুড়ে মারতে লাগলেন সিংহটার দিকে। বেশি না, মাত্র তিনটে। মন্ত্র পড়া ডিম তো, একেবারে কামানের গোলার মতন, তাতেই সিংহটা অজ্ঞান! বেচারাকে একেবারে মেরে ফেলতে হল না। বাবা বললেন, ও প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকবে। তারপর জেগে উঠে ওই ডিমগুলোই খেতে পারবে, ততক্ষণে নরম হয়ে যাবে ডিমগুলো।"

সন্তু বলল, "বাঃ!"

জোজো বলল, "আচ্ছা ধর সন্তু, তুই আর কাকাবাবু এরকম অবস্থায় পড়েছিস। সঙ্গে রিভলভার-বন্দুক নেই, কাকাবাবু কোনো মন্ত্র জানেন না, মানেনও না। তা হলে বাঁচবি কী করে?"

সন্তু বলল, "আমরা কখনও এরকম অবস্থায় পড়িনি, তাই জানি না। তবে কাকাবাবু নিজে একবার দুটো পাগলা হাতির সামনে পড়েছিলেন। বেঁচে গিয়েছিলেন প্রায় অলৌকিকভাবে।"

"কোথায় হয়েছিল ব্যাপারটা?"

"জায়গাটার নাম মার্গারিটা।"

"তার মানে কি ইতালিতে?"

"না, অসমে।"

"অসমে এরকম নামের জায়গা আছে?"

"তোর জিওগ্রাফির জ্ঞান বড্ড কম রে জোজো। অসমের পাহাড়ে এক জায়গায় ইতালিয়ানরা কয়লা খনি চালাত জানিস না?"

"অসমে কয়লাখনি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আসল কথাটা শুনবি না কি?"

"হ্যাঁ, বল, বল।"

"সংক্ষেপেই বলছি। কাকাবাবু একলা ছিলেন না, পাঁচজনের একটি দল, একটা প্লাটিনামের খনি খোঁজার কাজ চলছিল। ব্যাপারটা খুব গোপন। ওঁদের সঙ্গে বন্দুক-টন্দুক ছিল। খাবারদাবারও প্রচুর ছিল, রাত্তিরবেলা জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে থাকলেও একজন করে পাহারা দিত সারারাত। ওদিকটায় প্রচুর হাতি আছে। কিছু কিছু গন্ডারও আছে। তাঁবুর কাছাকাছি হাতি এলে গুলি না করে ছুঁড়ে মারা হত বোমা। সে বোমা লাগলে মরে না, কিন্তু বিকট শব্দ হয়, আর ধোঁয়া বেরোয়, তাতে খুব বিচ্ছিরি গন্ধ। সেই গন্ধের জন্যই হাতি পালিয়ে যায়।

জোজো বলল, "বোমা নয়, ওগুলোকে বলে ধোঁয়া পটকা।"

সন্তু বলল, "বিপদের ভয় না থাকলেও কাকাবাবু ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আনেন। এক রাতে কাকাবাবু জেগে পাহারা দিচ্ছেন, অন্যরা ঘুমোচ্ছে, ভোর হয়ে

এল, আর কোনো ভয় নেই, কাকাবাবু তখনও ঘুমোতে না গিয়ে মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে পড়লেন। মর্নিংওয়াকের অভ্যেস তো রোজ!"

জোজো বলল, "জঙ্গলের মধ্যে মর্নিং ওয়াক?"

সন্তু বলল, "অভ্যেস তো আর ছাড়তে পারেন না। ক্রাচ নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন। তারপর এক সময় আর খেয়াল রইল না। এক ঘণ্টা প্রতিদিন হাঁটা অভ্যেস। ঢুকে গেলেন জঙ্গলের মধ্যে। ঘন জঙ্গল। কত পাখি ডাকছে। গাছ থেকে গাছে বাঁদর লাফাচ্ছে। কয়েকটা হরিণ দৌড়ে চলে গেল। আর ময়ূর তো আছেই। অসংখ্য ময়ূর। সেসব দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে ভুলে গেলেন বিপদের কথা।"

জোজো বলল, "হঠাৎ হাতি এসে পড়ল?"

সন্তু বলল, "দুটো হাতিও মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিল। কাকাবাবুকে দেখেই তাদের মেজাজ গরম। বাজে গন্ধওয়ালা বোমার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে ওরা খুব বিরক্ত হয়ে আছে। মানুষ দেখলে রেগে যাচ্ছে। দু'টো হাতি দু'দিক থেকে তেড়ে এল কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু বন্ধুকটন্দুক নিয়ে যাননি।"

জোজো বলল, "বন্দুক থাকলেই বা কী লাভ হত? দু'দিকে দুটো হাতি।"

সন্তু বলল, "ঠিক তাই। খুব কাছ থেকে হাতিকে গুলি করলে বিপদ আরও বাড়ে। ওরা তো একটা-দুটো গুলিতে মরে না। তেড়ে এসে একেবারে থেঁতলে দেয়। একটা হাতি কাকাবাবুকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে শূন্যে তুলে ফেলল।"

একটু থেমে সন্তু বলল, "কাকাবাবুর কাছে বন্দুক নেই, মন্ত্রটন্ত্রও কিছু জানেন না, তবু বাঁচলেন কী করে বল তো?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু কি হাতিদের ভাষা জানেন? ওদের বুঝিয়ে বললে অনেক সময় কাজ হয়।"

সন্তু বলল, "না, হাতিদের ভাষাও জানেন না। একটা হাতি ছুঁড়ে দিল শূন্যে, সেই অবস্থায় আর একটা হাতি লুফে নিল শুঁড় দিয়ে। সেও ছুড়ে দিল আবার। যেন এটা ওদের খেলা। এরকম কয়েকবার করলেই মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু কাকাবাবুর প্রাণ কি সহজে যায়? উনি কী করলেন বল তো? তুই সার্কাসে সামার সল্ট দেখেছিস? শূন্যের ওপর কয়েকবার ডিগবাজি? কাকাবাবুর তো শরীরের ওপর দারুণ কন্ট্রোল। তিনি একবার সেইরকম ভল্ট খেয়ে একটা হাতির পিঠে গিয়ে পড়লেন। তারপর প্রাণপণে চেপে ধরলেন তার মস্ত বড় ডান কানটা! একটা ব্যাপার অনেকেই জানে না। কিন্তু ডান কানটা খুব স্পর্শকাতর। কেউ ডান কান ধরলেই হাতিরা আর স্থির থাকে না, দৌড়তে শুরু করে। এ-হাতিটাও শুরু করল ছুটতে। অন্য হাতিটা একটুক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেলেও আসতে লাগল পেছনে পেছনে। জঙ্গল লণ্ডভণ্ড করে ছুটছে দুটো হাতি, বিকট চিৎকার করছে, আর কাকাবাবু চেপে ধরে আছেন বড় হাতিটার ডান কান। তারপর এক জায়গায় একটা বড় গাছের ডাল দেখে

কাকাবাবু লাফিয়ে সেটা ধরে ফেললেন। বড় হাতিটাও যেন নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে বাঁচল। অন্য হাতিটাও আর মাথা ঘামাল না।"

জোজো বলল, "বাই চান্স বেঁচে গেছেন। আরও বিপদ হতে পারত।"

এই সময় শোনা গেল হা-হা হাসির শব্দ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু।

জোজো আর সন্তু দু'জনেই লজ্জা পেয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, "এগারোটা বেজে গেছে, ভাবলাম, নিজেই কফিটা বানিয়ে নেব। রান্নাঘরের কাছে এসে শুনি তোমাদের গল্প। সন্তু, তুই বুঝি জোজোর সঙ্গে পাল্লা দিতে চাইছিস?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আমার গল্পটা খারাপ হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর সঙ্গে তুই পারবি না। হাঁসের ডিম ছুড়ে সিংহকে ঘায়েল করার সঙ্গে হাতির ডান কান চেপে ধরার তুলনা হয়?"

এগিয়ে এসে বললেন, "জল তো অনেকক্ষণ ফুটে গেছে দেখছি। কফিটা বানিয়ে ফেলি।"

কফিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "আমি ওরকমভাবে দুটো হাতির মাঝখানে কখনও পড়িনি। তবে আফ্রিকার কিনিয়ায় একবার একটা হাতির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ। বেশ বেকায়দায় অবস্থাই হয়েছিল। আমি তো আর দৌড়তে পারি না। আমার কাছে বন্দুকটন্দুক না থাকলেও একটা মাউথ অর্গান ছিল। হাতিটা সোজাসুজি আসছে আমার দিকে, আমি ভাবলাম, মরেই যদি যাই, তার আগে একটা গান বাজাতে-বাজাতে মরি। কোন গানটা বাজালাম জানিস? 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে...'। অনেকেই জানে না, হাতি গানবাজনা খুব ভালোবাসে। হাতিটা থেমে গেলই, বাজনা শুনতে শুনতে একটু-একটু নাচতেও লাগল। হাতি বেশ ভালো নাচতে পারে। তারপর হাতিটার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল।"

সন্তু মুচকি মুচকি হাসলেও জোজো বলল, "আমার মনে হয়, ওটা পোষা হাতি ছিল!"

সত্যি ভূত, মিথ্যে ভুত

অনেক ছোটখাটো স্টেশন থাকে, যেখানে সন্ধ্যের পর কোনো ট্রেন থামে না। চণ্ডীগোলা সেইরকম একটা স্টেশন। ঠিক রাত বারোটা দশে এই স্টেশন দিয়ে একটা মেল ট্রেন পাস করে যায় ঝমঝমিয়ে, একটুও গতি কমায় না। ব্যাস তারপর আবার সেই সকাল আটটায় থামে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

স্টেশনটি ছোট হলেও দেখতে ভারী সুন্দর।

প্ল্যাটফর্মের পাশে পাশে কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া আর কাঞ্চন-ফুলের গাছ। যখন ফুল ফোটে, তখন গাছগুলো একেবারে ভরে যায়। পাখিও আসে অনেক, মাঝে মাঝে কোথা থেকে আসে একদল বাঁদর, গাছগুলোর ওপর লাফালাফি করে, আবার চলেও যায়।

রেলের চাকরি নিয়ে এই স্টেশনে কেউ বেশিদিন থাকতে চায় না। কাছাকাছি কোনো স্কুল নেই। হাসপাতাল নেই। যাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাদের খুব অসুবিধে।

অভীক বিয়েও করেনি, তার ওসব ঝঞ্ঝাট নেই। নিরিবিলি জায়গা তার খুব পছন্দ। সে গল্পের বই পড়তে ভালোবাসে। কবিতাও পড়ে খুব, বারবার পড়ে কবিতা মুখস্ত করে। একা থাকলেই বই পড়ার বেশি সুবিধে।

স্টেশনের পাশেই তার কোয়ার্টার। বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সঙ্গে একটা বাগানও আছে। আগের স্টেশনমাস্টার সেই বাগানে বেগুন আর কাঁচালঙ্কার চাষ করেছিলেন, সেই গাছগুলি এখনও রয়ে গেছে।

সন্ধের পর অভীক একা একা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে, আর মুখস্ত বলে কবিতা। হাওয়ায় ভেসে আসে ফুলের গন্ধ। মাঝ রাত্তিরের মেল ট্রেনটা পাস করার পর সে ঘুমোতে যায়। আরও কয়েকজন কর্মচারীর কোয়ার্টার আছে তার কোয়ার্টারের কাছেই। কিন্তু সেগুলো সব ফাঁকা। সেই কর্মচারীরা বিকেল শেষ হলেই সাইকেল চালিয়ে চলে যায় দু'মাইল দূরের গ্রামে। কেন তারা এখানকার কোয়ার্টার ছেড়ে গ্রামে গিয়ে থাকে, তা প্রথম প্রথম অভীক বুঝতে পারেনি। সহকারী স্টেশনমাস্টারকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, সে বলল, গ্রামে আমার নিজের বাড়ি করেছি, তা ছেড়ে এখানে থাকতে যাব কেন?

কিন্তু সবাই তো গ্রামে বাড়ি করেনি। আসল কারণটা অভীক জানতে পারল কয়েকদিন পরে। এই স্টেশনে ভূত আছে। সেই ভূত রীতিমতো উপদ্রব করে।

গোলাপি নামের একটি মেয়ে অভীকের কোয়ার্টারের ঘর ঝাঁট দেয়, খাবার জল

নিয়ে আসে, দুপুরের রান্নাও করে, তারপর আর সে থাকে না। রাত্তিরের খাবার অভীককেই গরম করে নিতে হয়।

সেই গোলাপি চোখ বড় বড় করে বলেছিল ভূতের গল্প।

আগেকার এক স্টেশনমাস্টারের সাত বছরের ছেলেকে ভূতে ডেকে নিয়ে লাইনের ওপর আছড়ে মেরে ফেলেছে।

একজন লাইন্সম্যান সামনাসামনি ভূত দেখে ফেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল দড়াম করে। পরদিন যখন জ্ঞান ফিরল, তখন তার গলায় দেখা গেল তিনটে আঙুলের দাগ। আর একজনের বউয়ের ভূত দেখে ফিটের রোগ হয়ে গেল। এখনও সারেনি। এইসব কত রোমহর্ষক কাহিনি।

শুনতে শুনতে হাসছিল অভীক। সে ভূত টুত কিছুই বিশ্বাস করে না।

সে গোলাপিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নিজের চোখে ভূত দেখেছ? সত্যি করে বলো। নাকি সবই অন্যের মুখে শুনেছ?

গোলাপি বলল, হ্যাঁ গো মাস্টারবাবু, একবার দেখেছি বোধহয়!

অভীক বলল, বোধহয় মানে কী? হয় দেখেছ, অথবা দেখনি।

গোলাপি আমতা আমতা করে বলল, দেখিছি, তবে দূর থেকে। অভীক বলল, কেমন দেখলে?

গোলাপি বলল, ভূত যেমন হয়। লম্বা, ক্যাংলাপনা। সারা শরীরে শুধু খটাখট করছে হাড়, মাংস নেই। চোখ দুটো কয়লার আগুনের মতন।

অভীক জিজ্ঞেস করল, তা ভূতমশাই কী করছিল?

গোলাপি বলল, রেল লাইনের ধারে মাটির তলা থেকে উঠে এল, তারপর পেলেটফরমটা পার হয়ে দৌড়ে চলে গেল কবরখানার দিকে।

অভীক অবাক হয়ে বলল, কবরখানা? কোথায় কবরখানা?

গোলাপি বলল, কবরখানা দ্যাখোনি? পেলেটফরম পেরুলে যে আমবাগান, তারপর একখানা মাঠ, তার পরেই তো কবরখানা!

অভীক এবার ঠাট্টা করে বলল, ওঃ, কবরখানা আছে। তাহলে তো ভূত থাকবেই!

গোলাপি বলল, তুমি বাপু সাবধানে থেকো। সন্ধের পর ঘর থেকে বেরিওনি। আর সঙ্গে সবসময় একটা লোহা রাখবে। লোহা থাকলে ভূতে ছোঁয় না।

অভীক বলল, ভূত আমায় কিছু করতে পারবে না। ভূতের রাজা আমার বন্ধু। অন্য ভূতরা আমাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

অভীক জানে, যেখানে কবরখানা কিংবা শ্মশান থাকে, সেখানেই ভূতের গল্প বেশি ছড়ায়। একবার গল্প ছড়ানো শুরু হলে সেটা বাড়তেই থাকে। এই সব গ্রাম দেশের লোক তা বিশ্বাসও করে। কেউ অন্ধকারে এমনি আছাড় খেয়ে পড়ে গেল, অমনি রটে গেল যে ভূতে তাকে ঠ্যালা মেরেছে। কেউ জ্বরের ঘোরে ভুল বকলে

লোকে বলবে, ওর শরীরের মধ্যে ভূত ঢুকেছে। কোনো কোনো মানুষ ঘুমের মধ্যে বিছানা ছেড়ে হাঁটতে আরম্ভ করে, লোকে ভাবে, ওকে ভূতে ডেকেছে!

সন্ধের পর থেকে অভীক একা একা থাকে। কিন্তু তার ভয় করে না। যে ভূতে বিশ্বাস করে, সে-ই ভয় পায়। যার বিশ্বাস নেই, সে ভয়ও পায় না।

দিনের বেলা অন্য কর্মচারীরা তার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে থাকে। বীরেনবাবু নামে একজন তো একদিন জিজ্ঞেসই করে ফেলল, মাস্টারবাবু, আপনি রাত্তিরে একা থাকেন, কিছু দেখতে পান না?

অভীক বলল, যেদিন খুব অন্ধকার থাকে, সেদিন কিছুই দেখতে পাই না। আর জ্যোৎস্না ফুটলে আকাশ দেখতে পাই, কত তারা, এক আকাশ তারা, কলকাতায় কিন্তু এমন আকাশও দেখা যায় না, এত তারাও দেখা যায় না।

বীরেনবাবু বললেন, না, মানে, অন্য কিছু। আগে তো অনেকেই দেখেছে!

অভীক বলল, ভূতের কথা বলছেন? আপনি বলতে পারেন, ভূতেরা কবিতা পছন্দ করে কিনা?

বীরেনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, কবিতা? তা তো জানি না।

অভীক বলল, বোধহয় পছন্দ করে না। আমি জোরে জোরে কবিতা আবৃত্তি করি। তাই ভূতেরা আমার ধারে কাছেই আসে না!

সত্যিই তাই। অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অভীক আবৃত্তি করে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ!

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার
বন্দনায় আছি রত, কর্ণ নাম যার
অধিরথ সূত পুত্র, রাধা গর্ভজাত
সেই আমি। কহ মোরে, তুমি কে গো মাতঃ?...

কিংবা, নজরুলের কবিতা,

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।
গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
করে হানাহানি, তবু বল টানি, নিয়াছ যে মহাভার!...

এইরকম ফাঁকা রেল স্টেশনে সাধারণত রাত্তিরের দিকে চোর-টোরদের আড্ডা হয়। সম্ভবত ভূতের ভয়ে তারাও এখানে আসে না।

অভীক এখানে কোনো রাত্তিরেই কোনো জনপ্রাণী দেখেনি।

একদিন শুধু একটা কাণ্ড ঘটল। সে রাতে অল্প অল্প জ্যোৎস্না ছিল। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অভীক। প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্তে কারা যেন বসে আছে। মনে হল, জনাতিনেক মানুষ উবু হয়ে মুখোমুখি বসে কী যেন করছে। ওরা কারা?

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে? কে ওখানে?

কেউ উত্তর দিল না। একজন শুধু মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। তার চোখ দুটো ঠিক দু'টুকরো আগুনের মতো। এরকম চোখ তো মানুষের হতে পারে না। অন্ধকারে মানুষের চোখ জ্বলে না।

অভীকের বুকটা ধক করে উঠল। মানুষ নয়, তবে ওরা কারা!

অভীকের ইচ্ছে হল, পেছন ফিরে দৌড় লাগাতে।

তারপরই সে ভাবল, ছি, ছি, ছি! আমি ভূত বিশ্বাস করি না, তবু ভূতের ভয় পাচ্ছি? পালাতে চাইছিলাম।

সে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার জিজ্ঞেস করল, কে? তোমরা কে?

এবারও কোনো উত্তর নেই। চোখ দুটো জ্বলছে নিভছে। তারপর দুটো চোখ দূরে সরে গেল।

ভয় পেলে মাথার ঠিক থাকে না। চোখ কখনও জ্বলে নেভে? চোখ কখনও দূরে সরে যায়? ভূতের পক্ষে সবই সম্ভব। মানুষ ভাবে।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে, তবু অভীক এগিয়ে গেল কয়েক পা।

এবারে তো বুঝল, ভূতও নয়, চোখও নয়। জ্বলছে নিভছে কয়েকটা জোনাকি। আর এক জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা কুমড়ো ভর্তি বস্তা।

বস্তাগুলোকে দূর থেকে অবিকল মনে হয়, উবু হয়ে গল্প করছে কয়েকজন মানুষ।

এখান থেকে প্রায় রোজই বস্তা ভর্তি করে কুমড়ো চালান যায় ট্রেনে। সেইরকমই তিনটে বস্তা কেউ রেখে গেছে।

অভীক এবার আপন মনে হো-হো করে হেসে উঠল।

এইরকম মাঝেমাঝেই এক একটা জিনিস দেখতে পায় অভীক। প্রথমটা চমকে ওঠে। ভয়ও করে। তারপর জোর করে ভয় ভাঙালে দেখা যায়, সেগুলি সাধারণ কিছু।

একদিন মাঝরাতে অভীকের ঘুম ভেঙে গেল। একটা শব্দ শুনে।

গরমের জন্য সে জানালা খোলা রাখে। তার জানলায় টক টক শব্দ হচ্ছে।

প্রথমে সে ভাবল, কেউ তাকে ডাকছে। অবশ্য এত রাতে কেউই এদিকে আসে না।

কেউ এলেও তো দরজায় শব্দ করবে। জানলায় কেন?

অভীক জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে যদি কোনো মুখটুখ দেখা যেত, তাহলে কি অভীক ভয় পেত না? কিন্তু জানলায় কেউ নেই। দেখা যাচ্ছে তারা ভরা আকাশ।

অথচ এখনও শব্দ হচ্ছে জানলায়। টক টক, টক টক!

ভয় পাবে না ঠিক করেও ঘামে ভিজে গেল অভীকের গা। কেউ নেই, তবু শব্দ হল কী করে? পরিষ্কার শব্দ। যেন কেউ ডাকছে।

ভূতেরা অনেক সময় অশরীরী হয়। তাই দেখা যাচ্ছে না?

সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কে?

কোনো উত্তর নেই, শব্দটাও থামল না।

এই অবস্থায় কি শুয়ে থাকা যায়? ঘুম তো আসবেই না। মরিয়া হয়ে উঠে পড়ল অভীক। যা হয় হবে।

জানলার কাছে কেউ নেই দেখেই তার বেশি ভয় লাগছে। ঘরে একটা লোহার ডান্ডা আছে, সেটা সে হাতে নিয়ে নিল। যদিও ডান্ডা নিয়ে ভূতের সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

জানলার কাছে গিয়ে আবার হেসে উঠল অভীক।

একটা টিকটিকি একটা আরশোলা ধরেছে। আরশোলাটাকে গিলে ফেলার আগে মারছে, সেইজন্যই জানলায় সেটাকে ঠুকছে বারবার। কোনো বড়সড় পোকা ধরলে টিকটিকিরা আগে এইভাবে মেরে নেয়। শব্দটা হচ্ছে অবিকল কারুর আঙুলে টোকা দেবার মতো।

বাইরে ঝকঝক করছে জ্যোৎস্না, কোনো জনপ্রাণী নেই।

আবার এসে শুয়ে পড়ার পর অভীক ভাবল, সে ভয় তো পেয়েছিল ঠিকই। কেন আগেই উঠে দেখে নিল না? কোনো ব্যাপারের ব্যাখ্যা না পেলেই প্রথমে ভূতের কথা মনে হয়। কিন্তু একটা না একটা ব্যাখ্যা তো থাকেই!

এরকম ভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটল।

আর কোনো কিছু দেখে বা শব্দ শুনে অভীক ভয় পায়নি। আগে ব্যাখ্যা খুঁজেছে। পেয়েও গেছে।

নিজের ওপর বেশ গর্ব হল অভীকের।

অনেকেই মুখে বলে, ভূত বিশ্বাস করি না। তবু ভয় পায়। একা থাকতে পারে না। অভীক নিজের কাছে প্রমাণ করেছে, সে ভয়কে জয় করতে পারে।

একদিন সে ভাবল, কবরখানাটা দেখে এলে কেমন হয়?

দিনের বেলা তো যে-কোনোদিন যেতেই পারে। কিন্তু যেতে হবে রাত্তিরে। মৃত মানুষ কিছুতেই আর জেগে উঠতে পারে না, ভয়ও দেখাতে পারে না। মৃতদেহটা পুড়িয়ে দিলে সব ছাই হয়ে যায়, আবার মাটির নীচে কবর দিলে আস্তে আস্তে পচে

গলে যায়। সুতরাং কবরখানায় যাওয়া কিংবা একটা বাগানে যাওয়া তো একই!

সে খবর নিলে জানল, একসময় এই অঞ্চলে অনেক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিল, তারাই কবরখানাটা বানিয়েছিল। এখন পাশের গ্রামের মুসলমানরা এই কবরখানাটা ব্যবহার করে।

তবে যারা কবর দিতে আসে, সবাই দিনে দিনে কাজ সেরে চলে যায়। সন্ধের পর কেউ থাকে না। খুব নাকি ভূতের উপদ্রব সেখানে। কবে যেন একজন ভূত দেখে রক্ত বমি করেছে। কেউ পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছে। একজন তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এক রাত্তিরে অভীক একটা টর্চ আর লোহার ডান্ডাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আমবাগানটা পেরুবার পর মাঠ, তারপরেই কবরখানা। সেখানেও অনেক গাছ। আলো-টালোর কোনো ব্যবস্থাই নেই।

ভেতরে এসে অভীক একটা পাথরের ওপর বসল।

ভয় না পেলেও গা-টা একটু ছমছম করে। এক একবার মনে হচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে পায়ের আওয়াজ, শুকনো পাতার ওপর খরখর শব্দ। কেউ যেন ফিসফিস করে কথা বলছে।

অভীক নিজেকেই বলল, এসবই তো আমার কল্পনা, তাই না?

প্রায় আধঘণ্টা সে বসে রইল এক জায়গায়। কিছুই হল না। ভূত-টুত কিছুর দেখা নেই। একবার শুধু একটা জোর আওয়াজ শুনে সে টর্চ জ্বেলে দেখল। একটা শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে।

অভীক আবার নিজেকে বলল, তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল তো যে আমি ভয়কে জয় করতে পেরেছি। শ্মশানে বসে থাকা আর কোনো বাগানে বসে থাকা একই ব্যাপার!

অভীক কারুর সঙ্গে বাজি ধরেনি। অন্য কারুর কাছে প্রমাণও দিতে হবে না। এ অভিযান শুধু নিজের আনন্দের জন্য।

এবার চলে গেলেই হয়। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকে উঠল। ধপ করে কিছু একটা পড়ার শব্দ।

আজ আকাশে জ্যোৎস্না বেশি নেই, আবার মিশমিশে অন্ধকারও নয়। সব কিছুই আবছা আবছা।

যে-দিক থেকে শব্দটা এল, সেদিকে তাকিয়ে অভীক দেখল, মাটিতে কী যেন একটা পড়ে আছে।

তারপরই অভীকের একেবারে দম বন্ধ হবার মতন অবস্থা। মাটির তলা থেকে উঠে আসছে একটা মুণ্ডু!

ঠিক তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে গোলাপি যেমন বলেছিল, সে মাটির তলা

থেকে ভূতদের উঠে আসতে দেখেছে!

তাহলে সত্যি ভূত আছে? মাটির তলা থেকে উঠে আসছে মৃত মানুষ? নিজের চোখকে অভীক অবিশ্বাস করবে কী করে?

শুধু মুণ্ডু নয়, আস্তে আস্তে উঠছে পুরো দেহটা।

অভীকের মনে হল, তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। সে অজ্ঞান হয়ে যাবে এক্ষুনি। তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

ভয়ের চোটে অভীক টর্চ জ্বালতেও ভুলে গিয়েছিল। এখন সে কাঁপা কাঁপা হাতে বোতাম টিপল।

একটা লম্বা চেহারা, বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জ্বল জ্বল করছে চোখ।

আলো পড়ার পরই কি মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল? আর দেখা যাচ্ছে না।

টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল, না, কোথাও সেই মূর্তিটার চিহ্ন নেই।

তবে কি আবার নেমে গেল মাটির নীচে।

এই সুযোগে পালাতে হবে। অভীক এক দৌড় মারল, তার হাত থেকে পড়ে গেল টর্চটা।

একটুখানি গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

ভূতের সঙ্গে কি দৌড়ে পারা যায়? ভূতটা তাকে তাড়া করেও আসছে না। সে তো ভূতের কোনো ক্ষতি করেনি, ভূতই বা তাকে মারতে আসবে কেন?

বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল অভীক। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। ভূত কি মানুষের সঙ্গে কথা বলে?

টর্চটা কুড়িয়ে নিল অভীক। আবার জ্বালতেই অভীক দেখল, মুণ্ডুটা আবার আস্তে আস্তে ওপরে উঠছিল, আলো পড়তেই মাটির মধ্যে চলে গেল?

অভীক এবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

কোনো উত্তর নেই।

আবার সে বলল, আমি অভীক মজুমদার, এখানকার স্টেশনমাস্টার। আপনি কে?

এবারও কোনো উত্তর নেই।

অভীক এবার আস্তে আস্তে এগোতে লাগল সেই গর্তটার দিকে। এক হাতে টর্চ জ্বালা, অন্য হাতে ডান্ডাটা তোলা।

আর কোনো কিছু ঘটছে না।

একেবারে কাছে এসে দেখল, সেই গর্তটার মধ্যে সত্যি একজন কেউ গুটিসুটি মেরে বসে আছে। চোখের ভুল নয়, দেখার ভুল নয়।

কোথা থেকে যেন জোর এসে গেল অভীকের শরীরে। ডান্ডাটা উঁচু করে বলল, ভূতের নিকুচি করেছে! আর একবার মরতে চান? এই দ্যাখ!

অমনি একজন খনখনে গলায় বলল, মারবেন না, মারবেন না স্যার! দয়া করুন! দয়া করুন!

অভীক বলল, কে তুই, উঠে আয় এবারে!

মাথাটা আবার উঁচু হতে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর দেখা গেল একটা কঙ্কালসার চেহারা, বুকের সব পাঁজরা বেরিয়ে আছে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষেরই মতো চেহারা।

সেই মানুষটা হাত জোড় করে বলল, মারবেন না স্যার। আমায় পুলিশে দেবেন না। তাহলে সবাই মিলে না খেয়ে মরে যাব!

অভীক বলল, তুই একটা চোর? এখানে লুকিয়ে থাকিস?

লোকটি বলল, আমি স্যার, মানুষের কিছু চুরি করি না। আমার নাম আকুল মণ্ডল। আগে রিকশা চালাতাম, এখন হাঁপ রোগ হয়েছে, তাই আর রিকশা চালাতে পারি না। আমার এই চেহারা দেখেই কেউ আর আমার রিকশাতে উঠতেই চায় না। আমি অন্য আর কী কাজ করব? কিন্তু খেতে তো হবেই। তাই এ কাজ ধরেছি।

কথা বলতে বলতেই হাঁপাচ্ছে লোকটি।

অভীক জিজ্ঞেস করল, এ কাজ মানে কী কাজ?

লোকটি বলল, কবরখানা থেকে মড়া মানুষের হাড় তুলে নিয়ে যাই।

অভীক বলল, মানুষের হাড় দিয়ে কী হয়?

লোকটি বলল, হাসপাতালে বিক্কিরি হয়। তাও অন্য একজন বিক্কিরি করে, কিন্তু সে নিজে আসতে ভয় পায়। তাই আমি হাড়গুলো তাকে দিই। সে আমাকে কিছু পয়সা দেয়।

অভীক বলল, সে ভয় পায়, আর তুমি ভয় পাও না?

লোকটি বলল, বাবু, সবচেয়ে বড় ভয় হচ্ছে না খেতে পেয়ে মরে যাবার ভয়। এখানে এসে কোনোদিন কিছু দেখিনি তো ভয় পাবার মতন। তবে আজ আপনাকে হঠাৎ দেখে, উঃ এমন ভয় পেয়েছিলাম গো। মনে হল, এই বুঝি ওনাদের একজন এসেছে আজ, রাগের চোটে বুঝি আমার গলা টিপে মেরেই ফেলবে! উঃ, ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল!

অভীক এবার হেসে ফেলল। সেও তো এই লোকটিকে প্রথমে ভূত ভেবে দারুণ ভয় পেয়েছিল, আর এই লোকটিও তাকে দেখে ভূত ভেবে ভয় পেয়েছে!

সত্যিকারের ভূত বলে যদি কিছু থাকে, তারাও বুঝি মানুষকে দেখে ভয় পায়!

হারানো চাবি আর মুক্তোর দুল

পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যার কখনও চাবি হারায়নি। আর চাবি হারাবার ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ড করতে পারেন আমার মিনিমাসি।

সারাদিনে মিনিমাসির অন্তত দশবার চাবি হারায়। এই আছে, এই নেই! মিনিমাসির মুখে একটা কথা লেগেই আছে, 'কোথায় রাখলাম। কোথায় রাখলাম?'

চাবি ছাড়া আরও অনেক কিছু হারান মিনিমাসি, যেমন কানের দুল, টেলিফোন নম্বরের খাতা, ধূপ জ্বালাবার দেশলাই, কলম, কর্ডলেস ফোন, দরকারি চিঠি, কাঁচি, আর টাকাপয়সা তো আছেই।

এরা কি সত্যি সত্যি হারায়? নাকি ইচ্ছে করে অদৃশ্য হয়ে যায়? আমাদের ধারণা এই সব জিনিসগুলো মিনিমাসির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে সারা দিন।

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় চাবিটা যে পাওয়া যাবে না তা ধরেই নেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেরি তো হবেই। চাবিটাই যেন দুষ্টুমি করে, চায় মিনিমাসির দেরি হোক বেরুতে।

মিনিমাসির 'চাবিটা কোথায় গেল' বললেই বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে খুঁজতে শুরু করে। তিনখানা ঘর, দু'খানা বাথরুম, একটা রান্নাঘর, দুটো বারান্দা, একটা জুতো রাখার জায়গা, সব জায়গায় চাবি খোঁজা হয় তন্ন তন্ন করে।

চাবিটা একটু আগে ছিল, ডানা মেলে তো উড়ে যেতে পারে না? তবু তোশকের তলায়, ফুলদানির মধ্যে, বইয়ের আলমারিতে, পাপোষের নীচে এমনকি রেফ্রিজারেটারের মধ্যেও খোঁজা হয় চাবি। সেটি কোথাও নেই।

পাওয়া যায় ঠিকই, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল চাবিটা দিব্যি বসে আছে যেখানে তার থাকার কথা ঠিক সেখানেই। অর্থাৎ মিনিমাসির বাইরে যাবার হাতব্যাগের মধ্যে। সেখানে কি খোঁজা হয়নি? সেখানেই তো সবচেয়ে আগে দেখা উচিত। মিনিমাসি জোর দিয়ে বলেন, তিনি ব্যাগটার মধ্যে আগে খুঁজেছেন ঠিকই, তখন ছিল না।

'তা হলে নিশ্চয়ই চাবিটা এক সময় ফুরুৎ করে হাতব্যাগ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে নিজে নিজে।'

মেয়েরা কানের দুল হারায় সাধারণত বাথরুমে। কিন্তু মিনিমাসির কানের দুল কী করে পাওয়া যায় জুতোর তাকে? জুতোও হারায়, তবে বাড়ির মধ্যে, জুতো আর কোথায় যাবে, বড় জোর খাটের নীচে? কিন্তু মিনিমাসির জুতো বেরিয়ে পড়ে ধোপার কাপড়ের বান্ডিল থেকে!

আর টাকাপয়সা! সে কখন কোথায় যায় তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আমার এই মাসির বাড়িতে কিছু না কিছু জিনিস হারানো নিয়ে সর্বক্ষণ হুলস্থূল লেগেই আছে।

মেসোমশাই শান্ত ধরনের মানুষ। যখন চাবি কিংবা অন্য কিছু নিয়ে সারা বাড়িতে খোঁজাখুঁজি চলে তিনি তখন নির্বিকারভাবে খবরের কাগজ পড়েন। তিনি নিজে কক্ষনো খোঁজেন না, তিনি তো জানেন সেই জিনিসটা পাওয়া যাবেই।

আর যদি না পাওয়া যায়, তা হলে আর কী করা যাবে।

একবার সেই অপূর্বমেসোমশাই ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন।

একবার তাঁর জরুরি কাজে আন্দামান যাবার কথা। প্লেনের টিকিটি কাটা আছে, সেই টিকিট তিনি রেখে দিয়েছেন নিজের টেবিলের ড্রয়ারে।

নির্দিষ্ট দিনে অপূর্বমেসোমশাই দমদম এয়ারপোর্টে যাবেন, ড্রয়ার খুলে দেখলেন টিকিটটা নেই! কোথায় গেল?

প্লেনের টিকিট খুব দরকারি জিনিস। ড্রয়ারের অন্য কাগজপত্র বার করার সময় সেটা যাতে হারিয়ে না যায় তাই মিনিমাসি খুব যত্ন করে টিকিটটা তুলে রেখেছেন অন্য জায়গায়।

কোথায় রেখেছেন? সেটাই মনে পড়ছে না। শুরু হল খোঁজাখুঁজি। মেসোমশাই অস্থিরভাবে ঘড়ি দেখছেন। সকাল আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছবার কথা। বেজে গেল সাড়ে ন'টা।

মেসোমশাই হতাশভাবে হাত-পা এলিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। যাওয়া হলই না।

সে টিকিট পাওয়া গেল দু'দিন বাদে। মহাভারত বইয়ের ভাঁজে। এবার মেসোমশাই বললেন, 'মিনি, এতটা ভুলো মন হওয়া তো একটা অসুখ। তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।'

মিনিমাসি আপত্তি করলেন না। রোজ খোঁজাখুঁজি করতে করতে অনেক সময় চলে যায়, তিনি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল।

মিনিমাসির ছোট বোনের নাম ফুটকি। তার মাথাটা তো দুষ্টুবুদ্ধিতে ভরা। সেই ফুটকিমাসি মিনিমাসিকে বললেন, 'দিদি, তুই বুঝি পাগল হয়ে গেছিস?'

মিনিমাসি বললেন, 'পাগল হতে একটুখানি বাকি আছে। কেন রে, এই কথা জিজ্ঞেস করলি?'

ফুটকিমাসি বললেন, 'না হলে অপূর্বদা তোকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে কেন?'

মিনিমাসি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার রায়চৌধুরি বুঝি পাগলের ডাক্তার?'

তখন মিনিমাসি জানলার ধারে কাঁদতে বসে গেলেন। তারপর অপূর্বমেসোমশাই এসে তাকে কত বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনতে চান না। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমাকে পাগল বানাতে চাও। বেশ তো আমাকে পাঠিয়ে দাও পাগলাগারদে!'

অপূর্বমেসো বললেন, 'মানুষের মনের নানারকম অসুখ থাকে, তা বলে তারা মোটেই পাগল নয়, সব সময় ভুলে যাওয়াটা একটা অসুখ। চিকিৎসা করলেই সেরে যেতে পারে। ডাক্তার রায়চৌধুরি একজন মনের অসুখের বিশেষজ্ঞ, অনেক মন্ত্রীটন্ত্রিরাও যান তাঁর কাছে।'

মিনিমাসি তবু রাজি হলেন না।

তারপর ঠিক হল এক পেটের অসুখের ডাক্তার। তিনি ওষুধ দিলেন। তাতে মিনিমাসির হঠাৎ পেটের অসুখ হয়ে গেল। জিনিস হারানো একটুও কমল না।

ফুটকিমাসি এসে বলল, 'দিদি, ও ডাক্তারে তোর কোনো কাজ হবে না, তুই হোমিওপ্যাথি কর।'

এলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। তিনি অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন এ পর্যন্ত কী কী জিনিস হারিয়েছিল। তারপর বললেন, 'এমন ওষুধ দেব, তাতে কক্ষনো আর কোনো কিছু হারাবে না।'

তার ফল হল, ওই হারানো জিনিসের তালিকায় বাড়ল আর একটা নাম। হোমিওপ্যাথি ওষুধ। সেই ছোট্ট ছোট্ট শিশিগুলো যখন তখন হারিয়ে যায়। ওষুধ আর ঠিক সময় মতো খাওয়াই হয় না। তখন ডাকা হল বিশ্বমামাকে।

বিশ্বমামা একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক। কত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেন। কত রহস্যের সমাধান করে দেন। তিনি নিশ্চয়ই পারবেন।

বিশ্বমামাকে ডাকতে হলে অবশ্য বড় বড় গলদা চিংড়ির মালাইকারী রান্না করে খাওয়াতে হয়। আর রাবড়ি। সেই ব্যবস্থাই হল।

সেদিন আলমারির চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশ্বমামা আগে ভাতের সঙ্গে তিনখানা চিংড়ি মাছ শেষ করে তারপর রাবড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে বললেন, 'বেশ ভালো রান্না হয়েছে, আমি আবার কাল আসব, কালও ওরকম চিংড়ি রান্না করে রেখো।'

পরের দিন বিশ্বমামা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কালকেই সেই চাবি পাওয়া গিয়েছে?' উনি চলে যাবার পরই সেটা পাওয়া গিয়েছিল।

বিশ্বমামা বললেন, 'দেখি সেটা, দাও তো।'

একটা নয়, এক গোছা চাবি।

বিশ্বমামা তার ওপরে ক্লিপের মতন একটা কী যেন আটকে দিলেন। তারপর কাজের লোক রঘুকে বললেন, 'এটা রান্না ঘরে রেখে এসো!'

মিনিমাসিকে পাশে বসিয়ে বিশ্বমামা বললেন, 'মনে করো দিদি, তোমার চাবির গোছাটা আবার হারিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কী করে খুঁজে পাবে এই দ্যাখো।'

পকেট থেকে তিনি ছোট্ট ঘড়ির মতন একটা যন্ত্র বার করে বললেন, 'এটার ওপরের বোতামটা টেপো!'

মাসি সেই বোতামটা টিপতেই রান্না ঘরের চাবির গোছা থেকে পিঁ পিঁ শব্দ হতে লাগল।

বিশ্বমামা বললেন, 'তা হলে বুঝতে পারছ, চাবিটা কোথায় আছে? যেখানেই যাক এই বোতামটা টিপলেই চাবি ঠিক সাড়া দেবে! তা হলে আর কখনও তোমার চাবি হারানোর সমস্যা রইল না। এই যন্ত্রটা আমার আবিষ্কার।'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। শুধু ফুটকিমাসি বললেন, 'যদি দিদি এই যন্ত্রটা হারিয়ে ফেলে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'গোটাকয়েক দিয়ে যাব। একটা থাকবে জামাইবাবুর কাছে, জামাইবাবু তো হারাবেন না।'

ফুটকিমাসি তবু বলল, 'তুমি তো চাবির ব্যবস্থা করলে কিন্তু অন্য কিছু যখন হারাবে? এই তো দিদি আজকে একটা মুক্তোর দুল হারিয়েছে। দামি জিনিস। তোমার যন্ত্র দিয়ে সেটা উদ্ধার করতে পারবে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'চাবিটাই বেশি দরকারি। এক এক সময় চাবি খুঁজে না পেলে সব কাজ থেমে থাকে। অন্য জিনিস পরে পেলেও চলে।"

ফুটকিমাসি বললেন, 'অন্য জিনিস মানে কী, মুক্তোর দুল! যদি সেটা চুরি যায়?'

বিশ্বমামা বললেন, 'দেখ বাপু, চোর ধরা আমার কাজ নয়, সে রকম দামি কিছু জিনিস চুরি গেলে পুলিশে খবর দেবে।'

ফুটকিমাসি বলল, 'পুলিশ এখন বড় বড় ডাকাতদেরই ধরতে পারছে না, চোরদের নিয়ে মাথা ঘামাতে তাদের বয়েই গেছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'আমিই বা সব বিষয়ে নিজের মাথা ঘামাতে যাব কেন? আমার নিজের কাজ নেই?'

ফুটকিমাসি বলল, 'ছোড়দা, তুমি কিন্তু দিদির ভুলে যাওয়ার অসুখটা সারাতে পারলে না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'আর ফুটকিটা আবার জ্বালালে দেখছি, অসুখ সারাব, আমি কি ডাক্তার? আমার চাবি হারিয়ে যেত বলে আমি এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছি।'

তারপর মিনিমাসির দিকে ফিরে বললেন, 'ছোড়দি, তোমার মুক্তোর দুলটা কখন হারিয়েছে?'

মিনিমাসি বললেন, 'সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

বিশ্বমামা একবার সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, দেখি সেটা

খুঁজে বার করা যায় কি না। আগে একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।'

ফিরে এসে বিশ্বমামা বললেন, 'জার্মানির বার্লিন শহরে একটা লোককে দেখেছিলাম সে চোখ বুজে কিছুক্ষণ থাকলেই দূরের কোনো ঘটনা কিংবা কোনো জিনিসের কথা বলে দিতে পারে। লোকটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, সে আমায় কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। আমি ওটা পারতাম, তবে অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই তো। এখন আর পারব কি না জানি না, তবু চেষ্টা করে দেখা যাক। প্রথমে একটা ঘড়ির দিকে দশ মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। কেউ একটা ঘড়ি দাও তো।'

বিশ্বমামা ঘড়ি পরেন না। ঘরের মধ্যে আর কারুর হাতেও ঘড়ি নেই। ফুটকিমাসি বললেন, 'ওই তো দেওয়ালে একটা ঘড়ি রয়েছে।'

বিশ্বমামা বললেন, 'দেয়ালের ঘড়িতে হবে না। একেবারে আমার চোখের সামনে এনে রাখতে হবে।'

অপূর্বমেসোমশাই বললেন, 'ও ঘরে টেবিলের ওপর আমার হাত-ঘড়িটা আছে, সেটা এনে দাও না।'

ফুটকিমাসি দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে সেখান থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'অপূর্বদা, টেবিলের ওপর তো আপনার ঘড়ি নেই!'

মেসোমশাই বললেন 'ড্রয়ারটা খোলো।'

ফুটকিমাসি পরে এসে বসে বললেন, 'ড্রয়ারেও আপনার ঘড়ি নেই।'

মেসোমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঘড়িটা নেই মানে? একটু আগে রেখেছি। মিনি তুমি আমার ঘড়িটা অন্য কোথাও রেখেছ?'

মিনিমাসি আমতা আমতা করে বললেন, 'না তো। তোমার ঘড়ি আমি... না তো, ধরিনি তো।'

মেসোমশাই বললেন, 'সব সময় একটা জিনিস অন্য কোথাও রাখা তোমার অভ্যেস, সাবধানে রাখতে গিয়ে কোথায় রাখ সেটাই ভুলে যাও।'

বেচারি মিনিমাসি ঘড়িটা সরিয়ে রেখে ভুলে গেছে কি না সেটাই মনে নেই। ফ্যাকাসে মুখে বললেন, 'কী জানি। ঘড়িটা, না... আমি বোধ হয় হাত দিইনি।'

মেসোমশাই বললেন, 'ও সব জানি না এক্ষুনি আমার ঘড়ি খুঁজে বার করবে। ওটা আমার বাবার দেওয়া ঘড়ি।'

বাড়ির সবাই খুঁজতে লাগল ঘড়ি। সারা বাড়িতে আবার হুলুস্থুল। শুধু বিশ্বমামা বসে রইলেন চুপ করে।

হঠাৎ মিনিমাসি চেঁচিয়ে বললেন, 'এই পেয়েছি। পেয়ে গেছি।'

বসবার ঘরে এসে মিনিমাসি বললেন, 'মুক্তোর দুলটা পেয়ে গেলাম ফুলগাছের টবে। সকালে গাছে জল দিতে গিয়েছিলাম, তখন নিশ্চয়ই পড়ে গিয়েছিল।'

বিশ্বমামা এক গাল হেসে বললেন, 'যাক্, পেলে তো। দ্যাখ ফুটকি, কী রকম খুঁজে বার করে দিলাম।'

ফুটকিমাসি বললেন, 'আহা তুমি কী করে বার করলে? তুমি তো চেয়ার ছেড়ে নড়লেই না।'

বিশ্বমামা বললেন, 'কিন্তু আমিই তো তোদের শিখিয়ে দিলাম নতুন কায়দাটা!'

ফুটকিমাসি বললেন, 'নতুন কায়দাটা আবার কী?'

মেসোমশাই বললেন, ও সব কথা পরে হবে। আমার ঘড়িটা গেল কোথায়?

বিশ্বমামা পকেট থেকে মেসোমশাইয়ের ঘড়িটা বার করে দিয়ে বললেন, 'এই তো!'

মেসোমশাই বললেন, 'তুমি আমার ঘড়িটা লুকিয়ে রেখেছিলে?'

বিশ্বমামা বললেন, 'হ্যাঁ। বাথরুমে যাবার সময়। কেন বলুন তো? সবাইকে শিখিয়ে দিলাম নতুন কায়দাটা, দুল হারালে দুল খুঁজতে নেই, অন্য কিছু খুঁজতে হয়। ঘড়ি খুঁজতে গেলে দুল পাওয়া যায়। আংটি খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় মানিব্যাগ। লাইটার খুঁজতে গেলে পেয়ে যাবে পেন। রুমাল খুঁজতে গিয়ে পাওয়া যাবে দরকারি ঠিকানা লেখা কাগজটা।'

তারপর মিনিমাসির দিকে ফিরে বললেন, 'যেটা এক্ষুনি খুঁজে পাওয়া দরকার, সেটা তুমি তখন পাবে না কিছুতেই। আর যেটা পাওয়া যাবেই না ধরে রেখেছিলে, সেটা ঠিক এসে যাবে চোখের সামনে।'

গঙ্গার ধারে চৌধুরি বাড়ি

আমাদের ক্লাবে ক্রিকেট খেলায় একটা বেশ শক্ত নিয়ম ছিল। মাঠটা তেমন বড় নয়, তার আবার এক পাশে গঙ্গা। আশপাশে অনেক নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, ফাঁকা জায়গা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

তবু আমাদের সবুজ সঙ্ঘের মাঠটা কোনোরকমে আটকে রেখেছি। এখানে বাড়ি-ঘর বানাতে দেওয়া হবে না। একবার কারা যেন এখানে কয়েকটা দোকানঘর তৈরি করতে চেয়েছিল, আমরা হৈ-হৈ করে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

এই ক্লাবটা আগে ছিল আমাদের বাবা-কাকা আর তাঁদের বয়েসীদের। এখন এটা আমাদের। হারুকাকা প্রায়ই আমাদের বলেন, দেখিস যেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ক্লাবটা তুলে দিস না। তাহলেই মাঠটা চলে যাবে।

আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় বটে, কিন্তু খুব বেশি না। আমরা সবাই ক্লাবটাকে ভালোবাসি।

সারা বছরই এখানে ক্রিকেট কিংবা ফুটবল কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলা হয়। এক পাশে একটা ছোট টালির ঘরও আছে, খুব বর্ষার সময় সেটার মধ্যে বসে খেলা হয় পিং পং আর ক্যারাম। আমাদের একটা ছোট লাইব্রেরিও আছে।

ক্রিকেট খেলার সময় মুস্কিল হয় এই, ব্যাটসম্যান কোনো বল জোরে হাঁকড়ালেই বলটা এদিক-ওদিক চলে যায়। অনেক সময় বলটা আর পাওয়াই যায় না। তাই নিয়ম করা হয়েছে, যে বাউন্ডারি কিংবা ওভার বাউন্ডারি মারবে, বলটা তাকেই খুঁজে আনতে হবে। যদি না আনতে পারে, তাহলে সে আউট তো হবেই, বলের দামও দিতে হবে তাকে।

সেই জন্য প্রায় সবাই ঠুক ঠুক করে মেরে এক-দু' রান নেয়। কিন্তু বাউন্ডারি-ওভার বাউন্ডারি ছাড়া কি খেলা জমে!

গঙ্গায় পড়ে যে ক'টা বল গোল্লায় গেছে, তার ঠিক নেই!

আমরা সবাই সাঁতার জানি, এই গঙ্গাতেই সাঁতার শিখেছি। কিন্তু গঙ্গায় বল পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা উদ্ধার করার আগেই সেটা স্রোতে ভেসে যায়।

ক্লাব ঘরের পেছন দিকে কিংবা মাঠের ডান পাশের নতুন বাড়িগুলোর দিকে বলটা পড়লে তবু খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু বাঁ পাশে কেউ বল পাঠাই না।

বাঁ পাশে টানা উঁচু দেওয়াল, তার ওপাশে পুরোনো একটা বাড়ি। সবাই বলে চৌধুরি বাড়ি। এককালে এই চৌধুরিরা নাকি বড় জমিদার ছিল, এই সবুজ সঙ্ঘের

মাঠটা তাঁরাই দান করেছেন, ক্লাব ঘরটাও বানিয়ে দিয়েছিলেন।

এখন ওই চৌধুরি বাড়িতে যে কারা থাকে তা বোঝাই যায় না। অনেকেই চলে গেছে কলকাতায়, কেউ কেউ বিলেত-আমেরিকায়। একজন বুড়োবাবু নাকি এখনও রয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁকে আমরা কখনও দেখিনি। মর্চে পড়া লোহার গেটের সামনে বসে থাকে একজন পাহাড়ি দারোয়ান, মাঝে মাঝে একটা গাড়ি সেই গেট দিয়ে বেরোয়, সে গাড়ির কাচগুলো কালো।

মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে শোনা যায় একটা হিংস্র কুকুরের ডাক। সে কুকুরটাও কখনও বাইরে বেরোয় না, তবে মাঝে মাঝে সে-বাড়ির ছাদে কুকুরটাকে দৌড়োদৌড়ি করতে দেখা যায়।

আমাদের খেলার সময় ক্রিকেট বল যদি বাঁ দিকের পাঁচিল পেরিয়ে কখনও ওই চৌধুরি বাড়ির মধ্যে পড়ে, তবে আর সেটা ফেরত পাবার আশা থাকে না।

আমাদের দলে বাপ্পাই ছিল সবচেয়ে আনাড়ি খেলোয়াড়। কয়েকমাস আগে ও এসেছে কলকাতা থেকে। ওর বাবা চাকরিতে বদলি হয়ে চন্দননগরে এসেছেন, বাপ্পাও ভর্তি হয়েছে আমাদের স্কুলের ক্লাস নাইনে।

বাপ্পা বল করতে পারে না, ব্যাট হাতে দাঁড়ালে গোল্লা খায়। কোনো দিন যদি চার-পাঁচ রান করে, তাতেই সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। অথচ বাপ্পার খেলার খুব আগ্রহ।

আমাদের উইকেট কিপার প্রশান্ত দিল্লি চলে যাওয়ায় সেই জায়গায় নামানো হল বাপ্পাকে। সেটা বাপ্পা মোটামুটি চালিয়ে দিল। সব ক্যাচ ধরতে না পারলেও বুক দিয়ে কিংবা হেড মেরে বল আটকে দেয়!

কিন্তু উইকেট কিপারকে তো ব্যাট করতেও হয়। যখন আর পনেরো-কুড়ি রান করলেই জেতা যায়, তখন উইকেট কিপারের কাছ থেকে এই কটা রান আশা করা যায় না? কিংবা আমাদের টিমের ক্যাপটেন রণজয়দা যখন পঁচানব্বই করেছে, ওদিকে নাইন্‌থ উইকেটে বাপ্পা ছাড়া আর কোনো পার্টনার নেই, তখন বাপ্পা কোনোক্রমে টিকে থাকতে পারলেই রণজয়দার সেঞ্চুরিটা হয়ে যায়। আমরা সবাই বলছি, বাপ্পা, ঠুকঠাক করে যা, কোনোরকমে এক রান নিয়ে এদিকে চলে এসে রণজয়দাকে মারতে দে!

কিন্তু বাপ্পা আনতাবড়ি এমন জোর ব্যাট হাঁকড়ালো যে বল গিয়ে পড়ল গঙ্গায়। ব্যস, খেলা বন্ধ!

আর একটা বল জোগাড় করে যদিও বা খেলা শুরু হল একটু পরে, কিন্তু পরের বলেই বাপ্পা আউট। একেবারে বোল্‌ড!

অনেকেই এখন বাপ্পাকে খেলা থেকে বাদ দিতে চায়, কিন্তু বাপ্পা খুব কাকুতি-মিনতি করে। প্রত্যেকবার একটা কিছু গণ্ডগোল করেই ও রণজয়দার কাছে হাঁটুগেড়ে বসে বলে, এর পরের বার ঠিক-ঠাক খেলব, দেখবেন!

এর মধ্যে বাপ্পাকে পাঁচবার বলের দাম দিতে হয়েছে।

আমরা বাঁ দিকের চৌধুরি বাড়ির দিকে কখনও জোরে বল মারি না। উঁচু পাঁচিল বলে সেদিকে বল তেমন বাইরেও যায় না। একদিন বাপ্পা হঠাৎ দারুণ উৎসাহ পেয়ে পর পর দুটো ওভার বাউন্ডারি মেরে বসল। দুটো বলই উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে চৌধুরি বাড়ির মধ্যে।

আমাদের ক্লাবে দুটোর বেশি বল থাকে না। খেলা তো বন্ধ হলই, রণজয়দা দারুণ রেগে গিয়ে বাপ্পাকে বললেন, কালকের মধ্যে তোকে চারটে বল কিনে আনতে হবে, নইলে তোকে সাসপেন্ড করা হবে তিন মাসের জন্য! আমি নিজেই উইকেট কিপার হব!

দুটোর বদলে চারটে বল। অনেক টাকা দাম!

খেলা বন্ধ, বিকেলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ক্লাবের অনেক ছেলেই বাড়ি ফিরে গেল। শুধু বাপ্পা করুণ মুখ করে বসে রইল গঙ্গার ধারে।

বাপ্পাদের বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। রোজ দুজনে একসঙ্গেই ফিরি। এক সময় ওর কাছে গিয়ে বললুম, কী রে, বাড়ি যাবি না?

বাপ্পা বলল, একটু পরে যাব। নীলু, তুই আমার পাশে একটু বসবি?

আমাকে ঠিক সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, না হলেই বাবার কাছে বকুনি। এখন প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে, আরও পনেরো-কুড়ি মিনিট বসা যেতে পারে।

বাপ্পা বলল, হ্যাঁ রে, নীলু, আমার দ্বারা ক্রিকেট খেলা হবে না, তাই না?

আমি বললুম, তুই তো আগে কখনও খেলিসনি! তোর কব্জিতে ঠিক মোচড় লাগছে না। ওটা শিখতে অনেকদিন সময় লাগে।

বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, আমি কি শিখতে পারব?

ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম, হ্যাঁ, পারবি না কেন? অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। বাড়ির উঠোনেও প্র্যাকটিস করতে পারিস।

এবার বাপ্পা জিজ্ঞেস করল, এই চৌধুরি বাড়িটায় কি বাঘ-ভাল্লুক থাকে? কিংবা ভূত বা দৈত্য? ও বাড়িতে বল পড়লে ফেরত আনা যায় না কেন?

আমি বললুম, আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি। গেটে একটা দারোয়ান আছে, সে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেয় না। একবার তো রণজয়দা ঠিক করেছিল, সবাই মিলে দারোয়ানটাকে সরিয়ে দিয়ে জোর করে ঢুকব। কিন্তু হারুকাকা বললেন, ছিঃ, ওসব কোরো না। চৌধুরিরা আমাদের ক্লাবের জমি দিয়েছেন, ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়। ওদিকে বল না মারলেই হয়!

বাপ্পা বলল, গেট দিয়ে ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে এ বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায় না?

—এত উঁচু পাঁচিল।

—পাঁচিলটা গঙ্গার ধারে শেষ হয়ে গেছে। আমি একদিন সাঁতার কাটতে কাটতে দেখেছিলাম, গঙ্গার দিকে পাঁচিল নেই। ওদিকে শুধু ঘাট রয়েছে। ওই ঘাট দিয়ে তো বাড়ির মধ্যে ঢোকা যায়।

—বাড়িটার মধ্যে মস্ত বড় একটা কুকুর আছে।

—তুই কুকুরকে ভয় পাস? দ্যাখ নীলু, চারটে বল কেনার পয়সা আমি জোগাড় করতে পারব না। আমি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকব, বল দুটো খুঁজে আনব। তুই আমার সঙ্গে যাবি?

—না।

—যাবি না?

—না, ভাই। আমাকে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। তা ছাড়া আমি কুকুরকে ভয় পাই!

—ঠিক আছে, তাহলে আমি একাই যাব।

বাপ্পা উঠে দাঁড়িয়ে ওর প্যান্ট গুটিয়ে নিল হাঁটু পর্যন্ত।

হঠাৎ সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আকাশ অন্ধকার। এই সময় আমাদের ক্লাবের মাঠে কেউ থাকে না।

বাপ্পা নেমে পড়ল জলে। তারপর পাঁচিলটার পাশ দিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

আমার তো এখন ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু কিছুতেই যেতে পারছি না। বাপ্পা একটা বিপদের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, ওকে ফেলে আমি যাই কী করে?

একজন কেউ দুঃসাহস দেখালে অন্যরাও সাহসী হয়ে ওঠে।

শুধু কুকুরের ভয় নয়, আমার একটু একটু ভূতের ভয়ও আছে। এই চৌধুরী বাড়ির মতন পুরোনো বাড়ি রাত্তিরবেলা দেখলেই গা ছমছম করে। বন্ধুরা আমাকে বলে ভীতুর ডিম!

তবু আমি নেমে পড়লুম জলে।

এই সময় গঙ্গায় বেশ স্রোত। আমার ডুবে যাওয়ার ভয় নেই, কিন্তু টাল সামলাতে না পারলে জামা-টামা ভিজে যেতে পারে।

বাপ্পা এর মধ্যে চৌধুরি বাড়ির ঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। এক সময় এটা ছিল এ বাড়ির নিজস্ব ঘাট, এখন ভাঙা-চুড়ো অবস্থা। অনেকদিন এ ঘাট দিয়ে কেউ নামে না, বোঝাই যায়। আগাছা আর শ্যাওলায় ভরে গেছে।

বাপ্পা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের কাছে।

বাড়িটার সব ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। কোথাও আলো জ্বলছে না। এক দিকের একটা বারান্দা ভেঙে গিয়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে, যে-কোনো সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে।

মনে হয় যেন এ বাড়িতে কোনো জন-মনুষ্য নেই। কিন্তু শুনেছি একজন বুড়োবাবু

থাকেন। মাঝে মাঝে গাড়িতে চেপে বাইরে যান। অন্য সময় তিনি দরজা-জানালা বন্ধ করে ভেতরে একলা থাকেন কেন?

কাছে গিয়ে বললুম, বাপ্পা, চল, ফিরে চল। এ বাড়ির মধ্যে কেউ ঢোকে না।

বাপ্পা খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বলল, তুই এলি কেন? তুই বাড়ি যা। ভালো ছেলের মতো পড়তে বোস গিয়ে। আমি ভেতরে যাবই।

বাপ্পা সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গেল।

ঘাটের দিকের দরজাও বন্ধ। তবে পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি আছে। বল দুটো নিশ্চয়ই ওখানেই পড়েছে।

বাড়িতে যখন কারুর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বল দুটো চট করে খুঁজে নিয়ে কেটে পড়লেই তো হয়।

আমিও ঘাট দিয়ে উঠে এসে খুঁজতে লাগলুম বল দুটো।

যদিও জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু আমরা দু'জনে মিলে পা ঘষটে ঘষটে পুরো গলিটা দেখলুম, বল থাকলে আমাদের পায়ে তো লাগতই।

একটাও বল সেখানে নেই।

তাহলে বল কোথায় গেল?

বাপ্পা ফিসফিস করে বলল, ছাদে পড়তে পারে। দ্যাখ, দোতলায় একটা ছোট ছাদ আছে।

আমি বললুম, তা হলে তো আর আশা নেই। ছাদে তো আর ওঠা যাবে না!

বাপ্পা বলল, এতদূর এসে ফিরে যাব?

—তা ছাড়া আর কী করবি? সব দরজা বন্ধ।

—জলের পাইপ বেয়ে উঠতে পারবি?

—মাথা খারাপ! ধপাস করে যদি পড়ে যাই!

—তা হলে তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক, নীলু। আমি ছাদটা একবার খুঁজে আসি।

—বাপ্পা, ছাদটায় যদি কুকুরটা থাকে?

—কুকুর থাকলে এতক্ষণ ডাকাডাকি করত না? আমার মনে হয়, বুড়োবাবু কুকুরটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কোথাও একটুও আওয়াজ নেই।

বাপ্পা জলের পাইপ বেয়ে উঠতে লাগল।

হঠাৎ সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চোখে পড়ল একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি।

আগেকার দিনে অনেক বাড়িতে এ রকম সিঁড়ি থাকত বাড়ির পেছন দিকে, মেথরদের ওপরে ওঠার জন্য।

সেই সিঁড়ি দিয়ে আমিও পৌঁছে গেলুম দোতলার ছোট ছাদে।

এখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কেউ কোনোদিন আমাদের

ক্রিকেট খেলা দেখেনি।

এ ছাদটা ছোট, ওপরের তলায় আর একটা ছাদ আছে।

এখানেও বল দুটো নেই। দুজনে দু'দিক দিয়ে কয়েকবার খুঁজেও কোনো লাভ হল না। বল দুটো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

ভেতর দিকে একটা দরজা আছে, সেটা বন্ধ।

কিন্তু একটু জোরে ঠেলতেই খুলে গেল দরজাটা।

ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়েই আমার দারুণ ভয় লেগে গেল। এই অন্ধকারের মধ্যে কী রহস্যময় ব্যাপার আছে কে জানে।

আমি বাপ্পার জামা টেনে ধরে বললুম, চল, এবার ফিরে যাই।

বাপ্পা বলল, না, আমি একবার ওপরের ছাদটা দেখে আসব। বল যাবে কোথায়?

আমি বললুম, অন্ধকারে ওপরের সিঁড়ি খুঁজে পাবি কী করে?

বাপ্পা বলল, ঠিক পেয়ে যাব।

তবু আমি বললুম, বাপ্পা, বাড়ির মধ্যে ঢুকে...যদি আমরা ধরা পড়ে যাই...

বাপ্পা জোর দিয়ে বলল, তুই ফিরে যা নীলু! আমি শেষ পর্যন্ত দেখবই!

বাপ্পা ভেতরে ঢুকে পড়তেই আমাকেও সঙ্গে যেতে হল। আমি কিছুতেই ফিরতে পারছি না। বাড়িতে গেলে খুব বকুনি খেতে হবে, তাও মনে পড়ছে। তবু বাপ্পা যেন আমাকে চুম্বকের মতন টানছে।

এবারে কেমন যেন একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিসের শব্দ বোঝা গেল না, কিন্তু গা-টা ছমছম করে উঠল।

অন্ধের মতো এক পা এক পা করে এগোচ্ছি। হঠাৎ কোনো চেয়ার বা টুলে ধাক্কা খেলুম আমি, সেটা জোর শব্দ করে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খুট করে সুইচের শব্দ হয়ে আলো জ্বলে উঠল।

সেই আলোতে সামনের দিকে তাকাতেই কেঁপে উঠল বুক।

একটু দূরে, একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা মতন মানুষ। কালো আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা চুল, সেইরকমই সাদা দাড়ি। চোখ দুটো এত কোটরে ঢোকা যে প্রায় দেখাই যায় না।

মানুষ, না অন্য কিছু?

আমি পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই সে খনখনে গলায় বলে উঠল, যাচ্ছিস কোথায়? দাঁড়া। নইলে গুলি করব!

এবার দেখি, সেই বৃদ্ধের হাতে একটা দো-নলা বন্দুক।

বন্দুকটা তুলে তাক করে বৃদ্ধটি আবার বললেন, চুরি করতে এসেছিস? অ্যাঁ? আমি কি মরে গেছি? এবার তোরা মরবি!

এবারে বাপ্পাও ভয় পেয়ে গেছে। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, না, না, আমরা

চোর নই, চোর নই। আমরা স্কুলে পড়ি।

আমি বললুম, আমরা পাশের সবুজ সঙ্ঘের মেম্বার।

বৃদ্ধ বন্দুকটা উঁচিয়ে রেখেই বললেন, পরের বাড়িতে না বলে কারা ঢোকে? তাদেরই তো চোর বলে!

বাপ্পা বলল, আমরা ক্রিকেট বল খুঁজতে এসেছি। আপনার বাড়িতে আমাদের অনেক বল হারিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বললেন, বল খুঁজতে আসো, সামনের গেট দিয়ে কেন আসো না?

বাপ্পা বলল, আপনার দারোয়ান ঢুকতে দেয় না।

বৃদ্ধ বললেন, আমি একা থাকি। যাকে তাকে ঢুকতে দেবেই বা কেন?

বাপ্পা বলল, তা হলে আমরা কী করব? দামি দামি বল—

বৃদ্ধ বললেন, তোমরা একটু দাঁড়াও, বেশিক্ষণ আমার চোখে চড়া আলো সহ্য হয় না।

তিনি সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলেন। আবার অন্ধকার। আমরা আবার শুনতে পেলুম সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ।

বৃদ্ধ আর একটা সুইচ টিপলেন। এবারে জ্বলে উঠল হালকা নীল আলো। তাতে বৃদ্ধকে আরও অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

হাতে এখনও বন্দুকটা ধরা, তিনি বললেন, কাছে এগিয়ে এসো।

বৃদ্ধের মতিগতি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বন্দুকের সামনে এগোতে বুক ঢিপ ঢিপ করবে না? কিন্তু উপায়ও তো নেই।

বৃদ্ধ বললেন, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু আমার হাতের টিপ খুব ভালো। একবার একটা চোরকে এক গুলিতে মেরে ফেলেছিলাম। তোমরা কোন সাহসে ঢুকলে?

বাপ্পা বলল, ঠাকুর্দা, আমরা তো চোর নই!

বৃদ্ধ এবার হি হি করে হেসে বললেন, ঠাকুর্দা? আমি আবার তোমাদের ঠাকুর্দা হলাম কবে থেকে? আমার নিজের নাতি-নাতনিরা কেউ আর আমার খোঁজ নিতে আসে না। আমি একদিন মরে যাব, তারপর এ বাড়িটাও শেষ হয়ে যাবে।

তারপর তিনি বাপ্পাকে বললেন, বল নেবে? ওইখান থেকে নিতে পারবে? দেখি তোমার কত সাহস?

তিনি পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখালেন।

বারান্দার নীল আলোই ঘরের মধ্যে খানিকটা পড়েছে। তাতে দেখা গেল, দরজার কাছেই চেন দিয়ে বাঁধা আছে একটা বিশাল কুকুর। সে-ই ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে।

সেই কুকুরটার মুখের সামনে পড়ে আছে আমাদের দুটো বল।

বৃদ্ধ বললেন, আমার কুকুরটাই তোমাদের বল নিয়ে খেলা করে। দেখ যদি ওর

কাছ থেকে বল নিতে পারো!

কুকুরের মুখের গ্রাস থেকে বল নেওয়া যায়? হাত বাড়ালেই তো ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেবে। আমরা ওর অচেনা।

কুকুরটা বাঁধা না থাকলে বোধহয় এতক্ষণ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আশ্চর্য, কুকুরটা কিন্তু ডাকছে না একবারও।

বাপ্পা কুকুরটার দিকে এগোতে যেতেই আমি ওর হাত টেনে ধরলুম।

বাপ্পা ঝট করে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর মুখ দিয়ে আঃ আঃ শব্দ করতে-করতে এগোতে লাগল একটু একটু।

কুকুরটা জ্বলজ্বল করে দেখছে। একেবারে কাছে গিয়ে বাপ্পা বসে পড়ল ওর সামনে। তারপর ওর মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে লাগল। কুকুরটা ডাকলও না, কামড়াবার চেষ্টাও করল না।

বৃদ্ধ বললেন, সাবাশ! সত্যিই তোমার সাহস আছে দেখছি।

বাপ্পা বলল, কুকুররা মানুষ চেনে। ও ঠিক বুঝতে পেরেছে, আমি চোর নই। আমাদের বাড়িতে আগে দুটো অ্যালসেশিয়ান ছিল। এই কুকুরটা নিশ্চয়ই আমার গায়ে সেই গন্ধ পেয়েছে।

বৃদ্ধ বললেন, আমার বাঘা আমারই মতন বুড়ো হয়ে গেছে। ওর বয়েস ঠিক আমার সমান। আমরা কে আগে মরবো জানি না।

বাপ্পা বল দুটো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বাব্বাঃ। সত্যি সাহস আছে বটে বাপ্পাটার!

বৃদ্ধ বললেন, এর পরে বল খুঁজতে হলে সামনের গেট দিয়ে আসবে। আমি দারোয়ানকে বলে রাখব।

বাপ্পা বলল, দাদু, তা হলে আমরা যাই?

বৃদ্ধ বললেন, যাবে? আগেকার দিনে চৌধুরি বাড়িতে কেউ এলে কিছু না কিছু খেতে দেওয়া হত। এখন তো কিছু নেই। কে-ই বা দেবে।

তিনি একটা ড্রয়ার খুলে কী সব ঘাঁটাঘাঁটি করতে-করতে একটা মাউথ অর্গান বার করে বাপ্পাকে বললেন, তুমি এটা নাও। দেখো তো বাজে কিনা!

বাপ্পা সেটা মুখে দিতেই প্যাঁ করে আওয়াজ হল।

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকেও তো একটা কিছু দিতে হয়।

এবার তিনি ড্রয়ার থেকে বার করলেন একটা পেন।

আমি বললুম, না, না, আমার লাগবে না।

বৃদ্ধ বললেন, তোমার লাগবে কি লাগবে না তা আমি জানি না। কিন্তু আমার তো কিছু দেওয়া উচিত।

পেনটা তিনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। সেই চৌধুরি বাড়ি ভেঙে এখন নতুন বাড়ি উঠেছে, সবুজ সঙ্ঘ ক্লাবটাও আর নেই।

আমি কিংবা বাপ্পা কেউই ক্রিকেট খেলোয়াড় হইনি। কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে আর ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সম্পর্ক থাকেনি।

বাপ্পা মাউথ অর্গানটা নিয়ে দিনকতক প্যাঁ পোঁ করতে-করতে ভালো বাজাতে শিখে গেল। তারপর তার খুব ঝোঁক হল গান-বাজনার দিকে। এখন বিখ্যাত গায়ক হিসেবে বাপ্পাদিত্য বর্মনের নাম সবাই জানে।

চৌধুরিবাবুর দেওয়া কলমটা আমার কাছে এখনও আছে। সেই কলমে আমি প্রথম কবিতা লিখি। তারপর সারা জীবন ধরে লিখেই চলেছি।

এক মূর্খ বিদ্বানের কাহিনি

একটা গভীর জঙ্গল, কিন্তু ভারি সুন্দর। বড় বড় গাছ, কিন্তু তলাটা পরিষ্কার। সেই সব গাছে নানারকম ফুল ফোটে, কত রকম ফল হয়।

বনের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে একটা নদী। তার জল টলটলে, পরিষ্কার। জলে স্রোত আছে, তাতে দেখা যায় অনেক রকম মাছ।

এই নদীর ধারে ধারে বেশ কয়েকটা কুটির। সেখানে থাকেন মুনি-ঋষিরা, তাঁদের বউ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। সাধু-সন্ন্যসীরা বিয়ে করেন না, কিন্তু মুনি-ঋষিদের তাতে কোনো বাধা নেই। তাঁরা লেখা পড়া করেন, তপস্যা করেন আর রাজা যখন ডাকেন, তখন রাজবাড়িতে যজ্ঞ করতে যান।

এই জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের মতো হিংস্র জানোয়ার নেই। আগে ছিল, আগে মাঝে মাঝে রাক্ষসরাও এসে মুনি-ঋষিদের ওপর অত্যাচার করত।

কিন্তু রাজা সৈন্য পাঠিয়ে সেই সব রাক্ষসদের একেবারে শেষ করে দিয়েছেন। রাজার সৈন্যরা এখনও দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় বলে তারা আর এদিকে আসতে পারে না।

রাজা এরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে মুনি-ঋষিরা শান্তিতে থাকতে পারেন। তাঁরা বিদ্যা চর্চা করেন। সকালবেলা আর সন্ধেবেলা শোনা যায় বেদ গান।

অনেককাল আগেকার কথা তো, তখন ছাপাখানা ছিল না। তাই বইও ছিল না। কাগজও আবিষ্কার হয়নি। তাই লেখাপড়া হত মুখে মুখে।

মুনি ঋষিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কঠিন কঠিন সংস্কৃত শ্লোকের মানে বুঝিয়ে দিতেন আর ছাত্র-ছাত্রীরা সেগুলো সব মুখস্ত করত। এখন আমরা বলি লেখা পড়া, তখন বলা হত পড়া শোনা। লেখার বদলে শুনতে হত বেশি। তার মানে তখন বিদ্যে অর্জন করা ছিল এখনকার চেয়েও কঠিন। প্রচুর মুখস্ত করতে হত যে! অবশ্য তখন সময় পাওয়া যেত বেশি।

তখন সিনেমা কিংবা টি ভি ছিল না, ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলা ছিল না। কিন্তু ছেলেরা নদীতে সাঁতার কাটত, গাছে চড়তা, দূরের পাহাড়ে বেড়াতে যেত। আর গান শিখত সবাই।

অনেক মুনি-ঋষির ছেলে যুদ্ধবিদ্যাও শিখত। অনেক ঋষি যুদ্ধবিদ্যা এত ভালো জানতেন যে রাজার ছেলেরা তাঁদের কাছে যুদ্ধ বিদ্যা শিখতে আসত।

এই যে নদীর ধারে মুনিদের আশ্রম, সেখানে পাশাপাশি দুটি বাড়ির দুজন মুনির

ছিল খুব বন্ধুত্ব। তাঁদের নাম ভরদ্বাজ আর রৈভ্য।

ভরদ্বাজ মুনির এক ছেলে, তার ডাক নাম বকু।

আর রৈভ্য মুনির দুটি ছেলে, তাদের ডাক নাম অবু আর পরু। বকু আর অবু প্রায় সমান বয়েসি, পরু একটু বড়।

বাচ্চা বয়েসে এই তিনজনের খুব ভাব ছিল। এক সঙ্গে ধুলো মেখে খেলা করত, এক সঙ্গে সাঁতার শিখত নদীতে।

কিন্তু একটু বড় হবার পর তাদের আর ভাব রইল না। পাশাপাশি বাড়ি, তবু তাদের ঝগড়া। অবু আর পরু কথাই বলতে চায় না, বকু নিজেই তাদের ডেকে ডেকে ঝগড়া করে।

পরু আর অবু দুজনেই শান্ত ধরনের। লক্ষ্মী ছেলে যাকে বলে। আর বকুটা হয়ে উঠেছে ডাকাবুকো। গায়ে বেশ জোরও আছে। সে ওই দুই ভাইকে দেখলেই ল্যাং মারে, চিমটি কাটে, বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি গালাগালও দেয়। বখাটে ছেলে যাকে বলে!

ভরদ্বাজ মুনির ছেলে বকু পড়াশুনোতেও মন দেয় না।

এ পাড়ার সব মুনি ঋষির ছেলেমেয়েরাই একজন বৃদ্ধ ঋষির কাছে পড়তে যায়।

তখনকার দিনে স্কুলকে বলা হত টোল। গুরুমশাই আর ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই বসত গাছতলায়। বৃষ্টি হলেই মুস্কিল। তাই বর্ষাকালটা টোল প্রায় বন্ধই থাকে, তখন সবাই চলে যায় মামার বাড়ি কিংবা মাসির বাড়ি বেড়াতে। কিংবা রাজধানীতে যায়। রাজধানীতে কত বড় বড় বাড়ি, চওড়া চওড়া রাস্তা, সেখানে কত মেলা হয়, যাত্রা হয়, ভেল্‌কির খেলা হয়। ভেল্‌কি মানে এখন আমরা যাকে বলি ম্যাজিক।

বর্ষাকালে প্রায় তিন মাস টোল বন্ধ থাকে বলে অন্য সময়ে পড়াশুনো করতে হয় খুব মন দিয়ে। ভোর থেকে সন্ধেবেলা পর্যন্ত।

বৃদ্ধ গুরুমশাই সব ছাত্র-ছাত্রীদের শ্লোক মুখস্ত করিয়ে দেবার পর এক একজনকে পড়া ধরতেন। সবচেয়ে ভালো ছাত্র অবু আর পরু।

আর সবচেয়ে খারাপ ছাত্র কে? বকু!

তাকে পড়া ধরলে সে সংস্কৃত শ্লোক বলতে এমন ভুল করে যে সব ছাত্ররা হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে।

বৃদ্ধ গুরুমশাই কিন্তু কখনও রাগ করেন না।

তিনি বলেন,—বৎস বকু, তুমি ভরদ্বাজ ঋষির ছেলে, বড় হচ্ছ, এবারে একটু পড়াশুনোয় মন দাও! এরপর যখন রাজার সভায় ডাক পড়বে, তখন তুমি যজ্ঞের মন্ত্র পড়বে কী করে?

পড়াশুনোয় মন দেবার বদলে বকু টোল থেকে পালাতে শুরু করল। কোনো কোনো দিন এসে একটু পরেই চলে যায়। কোনো কোনোদিন আসেই না।

ভরদ্বাজ মুনির কানে আসে এসব কথা।

কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বকতে পারেন না ছেলেকে। বকুর মা নেই তো, তাই ছেলের ওপর তাঁর বেশি মায়া।

ভরদ্বাজ মুনি শাসন করেন না বলেই বকু আরও অবাধ্য হয়ে উঠতে লাগল দিন দিন।

একদিন সে বনের ধারে একটা বুনো শুয়োর দেখে তাড়া করে গেল লাঠি নিয়ে।

শুয়োর মারা রাজার সৈন্যদের কাজ। মুনি-ঋষিদের ছেলেরা কোনো জীবজন্তুই মারে না। তারা মাংস টাংস খায় বটে, সে সব ব্যাধেরা শিকার করে এনে তাদের দেয়।

সে সময় সব কাজ ভাগ করা ছিল। একদল যুদ্ধ করবে, একদল ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবে, একদল মাছ ধরবে, একদল জামা-কাপড় বানাবে। এই রকম। কেউ অন্যের কাজ করে না, অন্যের কাজে মাথাও গলায় না।

আর ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিদের কাজ পড়াশুনো করা আর শিক্ষক হওয়া। সারা জীবন বিদ্যা-চর্চা করেই তারা কাটায়। এদের মধ্যে ভরদ্বাজ মুনির ছেলে এক মূর্তিমান ব্যতিক্রম। সে পড়াশুনো করে না, নানান রকম দুষ্টুমি করে বেড়ায়।

বকু শুয়োরটাকে না মেরে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। একেবারে এনে ফেলল গুরুমশাইয়ের গাছ তলার টোলে।

সেখানে ছাত্ররা মন দিয়ে পড়াশুনো করছে, এর মধ্যে একটা দাঁতাল শুয়োর ঢুকে পড়ায় সবাই দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল।

বৃদ্ধ গুরুমশাই পালাতেও পারেন না, চট করে উঠে দাঁড়াতেও পারেন না। অন্যরা দূরে সরে গেলেও তিনি বসে রইলেন একই জায়গায়। দিশেহারা হয়ে সেই বুনো শুয়োরটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল গুরুমশাইয়ের ওপর।

সেই শুয়োরের ধারাল দাঁতের খোঁচায় রক্তারক্তি হয়ে গেল গুরুমশাইয়ের শরীর।

বকু ভেবেছিল, বুনো শুয়োরটা অবু কিংবা পরুকে গুঁতিয়ে দেবে। বিশেষত পরু একটু মোটাসোটা বলে জোরে দৌড়তে পারবে না।

তার বদলে গুরুমশাইকে আহত হতে দেখে সে একটু ভয় পেয়ে গেল। পালিয়ে গেল গভীর বনের মধ্যে।

ছাত্ররা ফিরে এসে গুরুমশাইয়ের ওই অবস্থা দেখে যেমন দুঃখ পেল, তেমন রেগেও গেল।

কয়েকজন সেবা করতে লাগল গুরুকে, আর কয়েকজন খুঁজতে গেল বকুকে। এবার তারা আর বকুকে ছাড়বে না।

সন্ধের পরেও বকু বাড়ি ফিরে এল না।

সন্ধের সময় ভরদ্বাজ ঋষির বাড়িতে এলেন তাঁর বন্ধু রৈভ্য ঋষি।

ভরদ্বাজ ঋষির কুটিরে আর কেউ নেই। ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকেন। ছেলেটা বাড়ির কাজও কিছু করে না, সব কিছু কাজ তাঁকেই করতে হয়।

রৈভ্য ঋষি এসে বললেন,—ভরদ্বাজ, তোমার ছেলে ফিরেছে?

ভরদ্বাজ ঋষি আগে থেকেই চিন্তিত হয়ে ছিলেন। এই জঙ্গলে দিনের আলো শেষ হয়ে গেলে কেউ বাড়ির বাইরে থাকে না। বকুও রোজ সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসে।

ভরদ্বাজ বললেন,—না, বকু এখনও ফেরেনি। কোনোদিন তো সে এত দেরি করে না!

রৈভ্য জিজ্ঞেস করলেন,—আজ দুপুরে তোমার গুণধর ছেলে কী কাণ্ড করেছে, শুনেছ?

ভরদ্বাজ বললেন,—না তো! কী করেছে সে?

রৈভ্য বললেন,—ভরদ্বাজ, তুমি ছেলেকে শাসন করো না, সে যে উচ্ছন্নে গেছে একেবারে।

ভরদ্বাজ বললেন,—কেন, কেন, একথা বলছ কেন?

রৈভ্য বেশ রেগে গিয়ে বললেন,—কেন, বলছি? বন্ধু, তুমি কি পুত্র স্নেহে একেবারে অন্ধ হয়ে আছ? ঋষির ছেলে হয়েও সে মোটেই পড়াশুনো করে না, দস্যিপানা করে বেড়ায়, তুমি তা জানো না? তুমি কিছু শোনোনি?

ভরদ্বাজ বললেন,—ছেলেটা একটু চঞ্চল ঠিকই।

রৈভ্য বললেন,—শুধু চঞ্চল? সে একটা অসভ্য, বাঁদর হয়ে উঠেছে! সে তো নিজে আর টোলে যায় না। অন্য ছেলেদেরও পড়াশুনোয় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

ভরদ্বাজ বললেন,—মা-মরা ছেলে তো, তাই তাকে আমি বেশি শাসন করতে পারি না।

রৈভ্য বললেন,—শাসন না করে তুমিই তার বেশি ক্ষতি করছ। দিন দিন আরও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ সে যা কাণ্ড করেছে, তাতে, সে যদি তোমার ছেলে না হত, তাকে অভিশাপ দিতাম।

অভিশাপের কথা শুনে ভরদ্বাজ কেঁপে উঠলেন।

বড় বড় ঋষিরা অভিশাপ দিলে যে-কোনো মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন। কিংবা কারুকে যদি বলেন, তুই এই মুহূর্তে একটা ছাগল কিংবা সাপ হয়ে যা, তা হলে সে তাই-ই হয়ে যাবে।

ভরদ্বাজ ঋষি বললেন,—না, না, বন্ধু, তুমি আমার ছেলেকে অভিশাপ দিও না। ও যে আমার একমাত্র ছেলে!

রৈভ্য বললেন,—আমি না দিলেও আর ঋষিরা দিতে পারেন। ওদের গুরুমশাই নিতান্ত ভালোমানুষ বলেই ওকে আজ ভস্ম করে দেননি। শোনো ভরদ্বাজ, তোমার

ছেলেকে আর এখানে রাখা চলবে না।

ভরদ্বাজ বললেন,—সে কি! তা হলে সে কোথায় যাবে?

রৈভ্য বললেন,—যে ছেলে পড়াশুনো করে না, তার এই আশ্রমে স্থান নেই। ঋষির ছেলে যদি মূর্খ হয়, তা হলে সবাই ছি ছি করবে না? আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি, বকুকে নির্বাসন দিতে হবে। তাকে এখানে রাখলে অন্য ছেলেদেরও ক্ষতি হবে। কাল সকাল থেকে ওকে যেন আর এখানে না দেখি!

এই শেষ কথা বলে চলে গেলেন রৈভ্য ঋষি।

কুটিরের দাওয়ায় গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন ভরদ্বাজ ঋষি!

অন্য সব মুনি-ঋষিরা সবাই একমত হয়ে যদি তাঁর ছেলেকে শাস্তি দিতে চায়, তা হলে তো তিনি বাধা দিতে পারবেন না।

বকু চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এল অনেক রাতে।

তাঁকে দেখেই কেঁদে ফেললেন ভরদ্বাজ ঋষি।

বকু কাছে বসে পড়ে বলল,—কী হয়েছে বাবা? আমি শুয়োরটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম, সেটা যে গুরুমশাইয়ের গায়ের ওপর গিয়ে পড়বে, তা আমি জানব কী করে?

ভরদ্বাজ বললেন,—ওরে বকু, তুই আর এখানে থাকতে পারবি না। তা হলে তোকে কোনো ঋষি যে-কোনোদিন অভিশাপ দিয়ে শেষ করে দেবে!

বকু তেজের সঙ্গে বলল,—অভিশাপ দিলেই হল? কে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চায় দেখি তো!

ভরদ্বাজ বললেন,—তুই পড়াশুনো করিস না। মূর্খদের আশ্রমে স্থান নেই। খবর পেলে রাজামশাই নিজে এসে তোকে তাড়িয়ে দেবেন। তুই কাল সকাল হবার আগেই চলে যা এখান থেকে।

বকু বলল,—কোথায় যাব?

ভরদ্বাজ বললেন,—যে-দিকে তোর দু'চোখ যায়—

পরদিন সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল বকু।

এর আগে সে জঙ্গল ছেড়ে একা একা কোথাও যায়নি। একবার ভাবল, রাজধানীর দিকে যাবে। কিন্তু রাজধানী কোন্ দিকে সে জানে না।

যে-কোনো একদিকে হাঁটতে লাগল সে।

একসময় জঙ্গল পেরিয়ে সে পৌঁছল একটি গ্রামে।

এর মধ্যে দুপুর হয়ে গেছে, তার খিদে পেয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে গাছে অনেক ফল থাকে। ইচ্ছে মতন পেড়ে খাওয়া যায়, কেউ কিছু বলে না।

গ্রামে তো তা হয় না। একটি বাড়ির পাশে একটা আম গাছে পাকা পাকা আম

ঝুলছে দেখে সে যেই পাড়তে গেল, অমনি তাড়া করে এল সেই বাড়ির মালিক। একটা লাঠির ঘা কষিয়ে দিল তার পিঠে।

বকু অবাক হয়ে বলল,—আমায় মারছ কেন?

সে লোকটি বলল,—তুই আমার গাছের আম চুরি করছিস, তোকে মারব না?

চুরি কাকে বলে, তাই-ই জানে না বকু।

তাদের আশ্রমে কেউ চুরি করে না। এক কুটিরের লোক অন্য কুটিরে গিয়ে খাবার চাইলেই পায়।

তা ছাড়া রাজার লোক এসে অনেক খাবার দাবার, জিনিস-পত্র দিয়ে যায়। মুনি-ঋষিদের টাকা পয়সার হিসেবও রাখতে হয় না। কারণ, টাকা-পয়সার দরকারই হয় না।

বকু সেই লোকটিকে বলল,—আমার যে খিদে পেয়েছে, আমি কী খাব?

লোকটি ধমক দিয়ে বলল—তুই কী খাবি, তা আমি কী জানি? গায়ে জোর নেই? খেটে রোজগার কর!

সেই গ্রামের বাইরে এক জায়গায় একটা খাল কাটা হচ্ছে।

প্রায় একশো জন লোক মাটি কাটছে সেখানে। জমিদারের লোক ঘুরে ঘুরে কাজ দেখছে।

এক সময় মাটি কাটা বন্ধ হল। জমিদারের লোক তাদের খেতে দিল চিঁড়ে আর গুড়।

বকুকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জমিদারের লোক বলল,—কী রে ছোঁড়া, হাঁ করে দেখছিস কী? কাজ করবি? তা হলে খেতে পাবি।

চিঁড়ে আর গুড় দেখে লোভ হচ্ছিল বকুর। মাটি কাটার কাজ এমন কিছু শক্ত নয়।

কিন্তু রাজি হতে গিয়েও সে বলল,—না।

সে ঋষির ছেলে, মাটি কাটা তো তাকে মানায় না।

আবার হাঁটতে হাঁটতে সে পৌঁছল অন্য একটা জঙ্গলে। সেখানে গাছে কিছু ফল দেখে সে খেয়ে ফেলল। অচেনা ফল, কেমন যেন বিস্বাদ। পেটও ভরল না।

এরই মধ্যে একটা বাঘের ডাক শুনে সে মারল এক দৌড়।

এই ভাবে বেশ কয়েকমাস ধরে অনেক গ্রাম ও অনেক বন পার হয়ে গেল সে।

সে দেখল, গ্রামের লোকরা নানা রকম কাজ করে। সেই কাজের জন্য পয়সা পায়। বকুও ইচ্ছে করলেই কাজ পেতে পারে, কিন্তু সব সময় তার মনে হয়, সে একজন ঋষির সন্তান। যে কোনো কাজ সে করতে পারবে না।

কিছু লোক গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে।

বকুও মোটামুটি গান জানে। আশ্রমের সব ছেলেই শুনে শুনে গান শিখে যায়।

কিন্তু ঋষিরা তো ভিক্ষে করে না। বকু কিছুতেই ভুলতে পারে না তার বাবার কথা।

বাবার জন্য তার মন কেমন করে। কিন্তু আশ্রমে ফিরে যাবারও উপায় নেই।

ঘুরতে ঘুরতে সে চলে এল সমঙ্গা নামে একটা নদীর ধারে। এরও কাছেই রয়েছে জঙ্গল।

সেখানে হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা বালির স্তূপের মধ্যে একটি মানুষের মুখ। জীবন্ত মানুষ, জ্বল জ্বল করছে দু'চোখ। তবে মুখ ছাড়া তার সারা দেহ বালির মধ্যে ঢাকা।

সে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

চোখ দুটি তার দিকে চেয়েই রইল। কোনো উত্তর দিল না।

কোথা থেকে যেন অন্য একটা লোক এসে বলল,—এই, এই, কী করছ, ওঁকে বিরক্ত কোরো না।

বকু জিজ্ঞেস করল,—উনি ওরকম বালির মধ্যে রয়েছেন কেন?

লোকটি বলল,—উনি তপস্যা করছেন। কতদিন এভাবে থাকবেন তার ঠিক নেই।

বকু জিজ্ঞাসা করল,—তপস্যা করলে কী হয়?

লোকটি বলল,—উনি যে দেবতার জন্য তপস্যা করছেন, তিনি একদিন না, একদিন দেখা দেবেন। তখন তাঁর কাছে বর চাইলে যা ইচ্ছে পাওয়া যায়।

বকু জিজ্ঞেস করল,—তপস্যা কী করে করতে হয়? মন্ত্র লাগে?

লোকটি বলল,—না, মন্ত্রতন্ত্র লাগে না। শুধু এক মনে একজন দেবতার কথা চিন্তা করতে হয়। অন্য কিছু যেন আর মনে না আসে। এটা কিন্তু খুব শক্ত বুঝলে? অন্য কথা ভাবলেই তপস্যা নষ্ট হয়ে যায়। অনেকেই পারে না।

বকু সেখান থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়ে একটা গাছের নীচে তপস্যায় বসল। মনে মনে চিন্তা করতে লাগল দেবরাজ ইন্দ্রের কথা।

এমনিতেই তার জেদী, একগুঁয়ে স্বভাব। সে ঠিক করল, ইন্দ্রের দেখা না পেয়ে সে উঠবেই না। তাতে যদি তার জীবন যায় তো যাক!

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল।

কেউ সত্যি সত্যি খাঁটি ভাবে তপস্যা করত জানতে পারলে দেবতারা দেখা না দিয়ে পারেন না। সেকালে দেবতারা পৃথিবীতে নেমে আসতেন।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন,—বৎস, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি। তুমি কী বর চাও বলো—।

বকু একটুক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে রইল ইন্দ্রর দিকে। তাঁর সারা গা থেকে যেন আলো ফুটে বেরুচ্ছে। মাথার পেছনে ঘুরছে একটা চাকা। ঠিক যেমন দেখা যায় এখনকার ছবিতে।

বকু বলল,—প্রভু, আমাকে বর দিন, যাতে আমি বিদ্বান হতে পারি, পণ্ডিত হতে পারি।

ইন্দ্র অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন,—এটা আবার কী রকম চাওয়া? তুমি পড়াশুনো করোনি, গুরুমশাইয়ের টোলে যাওনি, বিদ্বান হবে কী করে? তুমি অন্য কিছু চাও। তুমি একটা বাড়ি আর অনেক ধনরত্ন নেবে?

বকু বলল,—না।

ইন্দ্র বললেন,—তুমি একশোটা গরু আর দুশো ঘোড়া নেবে?

বকু বলল,—না।

ইন্দ্র বললেন,—তা হলে কি তুমি অর্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাও?

বকু বলল,—তাও চাই না। আমি বিদ্বান আর পণ্ডিত হয়ে আমাদের আশ্রমে ফিরে যেতে চাই। সেখানে আমার বাবা রয়েছেন।

ইন্দ্র বললেন,—এরকম বর হয় না। তুমি অন্য কিছু ভাবো।

এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বকু কিন্তু জেদ ছাড়ল না। না খেয়ে দেয়ে তপস্যা করতে করতে সে রোগা হয়ে গেছে, চোখের নীচে পড়েছে কালি, তবু সে তপস্যা ছাড়বে না। আবার ইন্দ্রকে আসতেই হবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে সে হঠাৎ এক সকালে দেখল, একজন থুরথুরে বুড়ো নদীর ধারে বসে কী যেন করছে।

সে জলে নেমে স্নানও করছে না, উঠেও যাচ্ছে না। বসে বসে কী যেন বিড়বিড় করছে আর ডান হাতটা নাড়ছে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বকু কৌতূহল দমন করতে পারল না। কাছে এসে দেখল, বুড়োটি নদীর জলে একটু একটু বালি ছুঁড়ছে।

বকু তাকে জিজ্ঞেস করল,—আপনি কী করছেন?

বৃদ্ধটি বলল,—এই একটা কাজ করছি!

বকু বলল,—একটু একটু বালি ছুঁড়ছেন, এটা একটা কাজ নাকি?

বৃদ্ধটি বলল,—আসলে আমি একটা সেতু বানাচ্ছি। সেই সেতুর ওপর দিয়ে কত মানুষ চলাচল করবে। তাতে আমার খুব আনন্দ হবে।

বকু বলল,—বালি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেতু গড়া যায়?

বৃদ্ধটি বলল,—মনে মনে বলব, সেতু তৈরি হয়ে যাক, সেতু তৈরি হয়ে যাক, তাতেই হয়ে যাবে।

বকু হেসে বলল,—আপনি কি পাগল নাকি? মনে মনে বললে সেতু হয়? সেতু বানানো শিখতে হয়। বড় বড় পাথর আনতে হয়, অনেক কিছু লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের চেহারাটা বদলে গেল। তিনি হয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আলো ছড়িয়ে পড়ল সব দিকে।

ইন্দ্র বললেন,—তা হলে বাপু, এটা বুঝলে না কেন যে মনে মনে চাইলেই কেউ বিদ্বান কিংবা পণ্ডিত হতে পারে না। অনেক পুথি পড়তে হয়, গুরুমশাইদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়। তুমি তপস্যা ছেড়ে কোনো টোলে ভরতি হও, কিংবা অন্য কিছু বর চাও।

বকু বলল,—টোলে পড়াশুনো করতে আমার ভালো লাগে না, পুথি টুথি পড়তেও মন লাগে না। কিন্তু পণ্ডিত আর বিদ্বান আমাকে হতেই হবে, না হলে নিজেদের আশ্রমে ফিরে যেতে পারব না। আপনি দেবতাদের রাজা, আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন।

ইন্দ্র বললেন,—না, আমি মূর্খকে বিদ্বান বানাতে পারি না, এরকম বর দেবার সাধ্য আমার নেই।

বকু বলল,—এ বর আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আমি আরও কঠোর তপস্যা করব, আমার হাত, পা একটা একটা করে আগুনে বিসর্জন দেব। তারপর আমি নিজেও এখানে মরব!

এখন কেউ যদি কোনো দেবতার নামে তপস্যা করতে করতে মরেই যায়, তা হলে সেই দেবতার বেশ বদনাম হয়ে যায়। আর কেউ তার নামে তপস্যা করবে না।

ইন্দ্র বললেন,—এ যে দেখছি মহামুস্কিল! ঠিক আছে, তোমাকে আমি বর দিচ্ছি, বেদ, উপনিষদ আর সব শাস্ত্রের শ্লোক তোমার মুখস্ত হয়ে যাবে। তুমি ঋক বেদ বলার চেষ্টা করে দেখো।

বকু অমনি ঝর ঝর করে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত বলতে শুরু করল,—তাতে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

এসব শ্লোক সে কোনোদিন শোনেওনি, পড়েওনি!

আনন্দে প্রায় লাফাতে লাফাতে সে ফিরে গেল নিজেদের সেই আশ্রমে।

প্রথমেই রৈভ্য ঋষি তাকে দেখতে পেয়ে রাগ করে বললেন,—তুই আবার এসেছিস? তোর বাবাকে বলে দিয়েছি না, মূর্খদের এ আশ্রমে স্থান নেই।

বকু বলল,—কে মূর্খ? আসুন তো দেখি, এখানকার কোন্ ছেলে আমার থেকে বেশি শ্লোক জানে?

সে পরপর শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্ত বলে যেতে লাগল।

আরও অনেকে ছুটে এল তাকে দেখতে। সবাই তার মুখে এত শ্লোক শুনে অবাক।

দশ বছর বিদ্যা চর্চা করলেও যা শোনা যায় না, তা বকু শিখে গেল এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে?

যাই হোক, তাকে বিদ্বান বলে মেনে নিতেই হল।

বকুর ভালো নাম যবক্রীত। সে এখন থেকে হয়ে গেল যবক্রীত ঋষি।

তার বাবাও তাকে ফিরে পেয়ে খুব খুশি!

কিন্তু বকু তো আসলে বিদ্বান কিংবা পণ্ডিত হয়নি। সে ইন্দ্রের বরে অনেক শ্লোক মুখস্ত বলতে পারে, কিন্তু কোনোটারই মানে বোঝে না।

মানে না বুঝলে কী জ্ঞানী হওয়া যায়?

তাই সে ভেতরে ভেতরে মূর্খই রয়ে গেল।

রাজসভাতেও ডাক পড়ে যবক্রীত ঋষির। সে অনর্গল শ্লোক মুখস্ত বলে অন্য পণ্ডিতদের তাক লাগিয়ে দেয়।

কিন্তু মূর্খ বলে তার স্বভাবটা বদলালো না।

রৈভ্য ঋষির দুই ছেলেকে সে যখন তখন গালাগালি দেয়। অন্যদের কুটিরে ঢুকে পড়ে মেয়েদের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করে। অন্য ঋষিদের জিনিসপত্র কেড়ে নেয়।

রৈভ্য ঋষির মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, বকু কী করে এত বিদ্বান হল? সত্যিকারের বিদ্বান ও জ্ঞানী হলে কি মানুষ হিসেবে এত খারাপ হতে পারে? জ্ঞান তো মানুষের মনটাকে শুদ্ধ করে দেয়।

একদিন বকু রৈভ্য ঋষিকেও দারুণ অপমান করে বসল।

রৈভ্য ঋষি এমনই রেগে গেলেন যে তাকে তক্ষুনি অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছিলেন। কোনো রকমে রাগ সংযত করলেন, হাজার হোক বন্ধুর ছেলে তো?

তিনি মাথা থেকে খানিকটা চুল ছিঁড়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতেই তার থেকে উৎপন্ন হল এক অগ্নিময় পুরুষ। তার সারা গা আগুন দিয়ে ঘেরা।

সে হাত জোড় করে দাঁড়াতেই রৈভ্য ঋষি বললেন,—যাও, ওই যবক্রীতকে পরীক্ষা করো। পরীক্ষায় না পারলে ওকে উচিত শাস্তি দাও!

তখন সেই অগ্নিময় পুরুষ বকুকে খুঁজে বার করে বলল,—যবক্রীত ঋষি, আমি তোমাকে দুটি প্রশ্ন করছি। তুমি এর যে কোনো একটি বেছে নাও!

সে খুব কঠিন সংস্কৃত ভাষায় বলল দুটি শ্লোক।

এদিকে বকু তো কোনো শ্লোকেরই মানে বোঝে না। সেও অন্য দুটো শ্লোক বলে নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করতে চাইল।

অগ্নিময় পুরুষ বলল,—এ তো উত্তর হল না। আমি যা বলেছি, তুমি তার কোনো একটা বেছে নাও।

মানে বোঝার তো উপায় নেই, তাই বকু আন্দাজে বলল,—দুটোই খুব ভালো বলেছ। আমি খুশি হয়েছি। আমি দ্বিতীয়টা বেছে নিতে খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি।

আসলে শ্লোক দুটির মানে দু'রকম। প্রথমটায় বলা হয়েছে, আমি জলে ডুবে

মরতে চাই না। জলে ডুবে মরলে অপঘাত মৃত্যু হয়।

আর দ্বিতীয়টার মানে হল, মানুষের আগুনে পুড়েই মরা উচিত। তাতে অনন্ত স্বর্গবাস হয়।

অগ্নিময় পুরুষ বলল,—বাঃ, দ্বিতীয়টা তোমার পছন্দ? তা হলে তুমি আগুনে পুড়েই মরো।

এই বলে সেই অগ্নিময় পুরুষ তাড়া করে আসতেই ভয়ে দৌড় মারল বকু।

সে ভাবল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে এই অগ্নিময় পুরুষ কিছু করতে পারবে না।

নদীর দিকে গিয়ে দেখল, নদী একেবারে শুকিয়ে গেছে, এক ফোঁটাও জল নেই।

তারপর একটা পুকুরের কাছে গিয়ে দেখল, সেটাও শুকনো খটখটে।

তখন সে বাঁচাও, বাঁচাও বলে ছুটল বাড়ির দিকে।

অগ্নিময় পুরুষ খুব জোরে ধেয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এইভাবে জীবন শেষ হল এক মূর্খ বিদ্বানের।

হীরামতি রাক্ষসী

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা দাদু, তুমি যখন আমার মতো ছোট ছিলে, তখন রোজ টেলিভিশন দেখতে?

দাদু বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। কাগজ সরিয়ে হাসি মুখে বললেন,—না রে বুড়ি, আমাদের ছোটবেলায় তো টেলিভিশন ছিলই না। টেলিভিশন কাকে বলে তাই-ই জানতাম না।

তিন্নি অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে বলল,—ওমা, টেলিভিশন ছিল না? এত ভালো ভালো কার্টুন দেখতে পেতে না?

দাদু বললেন,—সিনেমা হলে গিয়ে টম অ্যান্ড জেরি কার্টুন দেখেছি বটে, তাও বা ক'দিন? বছরে মাত্র দু'একবার! আমাদের সময় ছিল রেডিও। তাতে গান শুনতাম।

তিন্নি বলল,—রেডিও মানে টু-ইন-ওয়ান? কী কী ক্যাসেট বাজাতে?

দাদু বললেন,—টু-ইন-ওয়ান না, শুধু রেডিও। তখন ক্যাসেট বলেও তো কিছু ছিল না। তোর দাদা যে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ওই কম্পিউটারও কখনও দেখিনি। তোর বাবা যে মোবাইল ফোন নিয়ে ঘোরে, গাড়ি থেকে ফোন করে, ওসব আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। আমাদের ছোটবেলায় এসব অনেক কিছুই ছিল না।

তিন্নি ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তোমাদের সময়ে এমন কিছু ছিল, যা এখন নেই? যা আমরা দেখিনি!

দাদু বললেন,—হ্যাঁ, সেরকম অনেক কিছু ছিল। তুই গ্রামোফোন কাকে বলে জানিস?

তিন্নি তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ভর্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না। সেটা কী?

দাদু বললেন,—গ্রামোফোন হচ্ছে একটা বড় চৌকো বাক্স। তার একদিকে একটা হ্যান্ডেল, সেটা ঘুরিয়ে দম দিতে হয়। তারপর বাক্সটা খুললেই দেখা যায়, ভেতরে গোল চাকার মতো একটা জিনিস ঘুরছে। সেটার ওপর একটা রেকর্ড বসিয়ে দিলে রেকর্ডটাও ঘোরে। ভেতরে আর একটা জিনিস থাকে, সেটার নাম ভুলে গেছি! সেটার ডগায় ছোট্ট একটা পিন লাগিয়ে দিয়ে রেকর্ডের সঙ্গে আটকে দিলেই গান বাজতে শুরু করে। কতরকম গান-বাজনা হাস্য কৌতুকের কমিক। আমরা ছোটরা তো গ্রামোফোন বলতে পারতাম না। আমরা বলতাম কলের গান। প্রথম প্রথম কী মনে হত জানিস? আমি ভাবতাম, ওই বাক্সটার মধ্যে কোনো লোক লুকিয়ে বসে

আছে, সে-ই গান গাইছে, বাজনা বাজাচ্ছে!

তিন্নি হাসতে হাসতে বলল,—ধ্যাৎ! টেলিভিশনেও তো কত গান বাজনা হয়। ওর মধ্যে কেউ লুকিয়ে থাকে নাকি? ওই সব গান তো আকাশ দিয়ে ভাসতে ভাসতে আসে।

দাদু বললেন,—তোরা এখন কম বয়েসেই অনেক কিছু জেনে যাস। আমরা বাপু অতশত জানতাম না।

তিন্নি বলল,—গ্রামোফোন মানে বুঝেছি। রেকর্ড প্লেয়ার। ক্যাসেটের বদলে বড় বড় রেকর্ড। আমার ছোটমামার আছে।

দাদু বললেন,—হ্যাঁ, ওই রেকর্ড প্লেয়ারেরই মতো অনেকটা। আগেকার নাম ছিল গ্রামোফোন। রেকর্ডের ওপর ছবি থাকত, একটা গ্রামোফোনের চোঙের সামনে অবাক হয়ে বসে আছে একটা কুকুর। তলায় লেখা থাকত, হিজ মাস্টার্স ভয়েস!

তিন্নি বলল,—জানি। ছবি দেখেছি। কুকুরটা তার মালিককে খুব ভালোবাসত। মালিক মরে গেছে, কিন্তু রেকর্ডে তার গলার আওয়াজ শুনে কুকুরটা ভাবত, এখনও বুঝি বেঁচে আছে।

ঠাকুর্দা বললেন,—বাপরে বাপ! তোরা কত্ত কিছু জানিস রে বুড়ি!

তিন্নি বলল,—দাদু, আমার নাম তো তিন্নি, তুমি আমায় বুড়ি বুড়ি করো কেন?

ঠাকুর্দা বললেন,—বেশ করি! আমি যখন তোর মতন ছোট ছিলাম, তখন ঠাকুমাও আমাকে আদর করে ডাকত, বুড়ো, এই বুড়ো শুনে যা!

তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—তোমার ঠাকুমাকে কেমন দেখতে ছিল?

দাদু বললেন,—এই তো, আমার ঠাকুমাকে তুই দেখিসনি। দেখবি কী করে? আমার ছোটবেলায় এমন অনেক মানুষ ছিল, যারা এখন আর নেই। তাদের তোরা কোনোদিন দেখবি না।

তিন্নি বলল,—ওরকম নয়। অন্য কিছুর কথা বলো। যা এখন নেই।

ঠাকুর্দা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে ভাবতে বসলেন। একটু পরে বললেন,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমাদের সময় হীরামতি রাক্ষুসী ছিল, তা তো তোরা দেখিসনি!

তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—হীরামতি রাক্ষুসী কী?

ঠাকুর্দা বললেন,—রাক্ষুসী কাকে বলে জানিস না? গল্পের বইতে পড়িসনি?

তিন্নি বলল,—হ্যাঁ পড়েছি। ঠাকুরমার ঝুলি। কিন্তু রাক্ষস-রাক্ষুসী তো শুধু গল্পের বইতেই থাকে। তাদের আবার দেখা যায় নাকি?

ঠাকুর্দা বললেন,—হ্যাঁ, দেখা যায়।

তিন্নি বলল,—মোটেই না। মা বলেছে, ওসব শুধু গল্প। তুমি ওই রাক্ষুসীটাকে নিজের চোখে দেখেছ?

ঠাকুর্দা বললেন,—হ্যাঁ দেখেছি, অনেকবার। ওরে বাবা, একদিন সে কি কাণ্ড হল।

তোর এই ঠাকুর্দাটা আর একটু হলে মরেই যেত! আমার সামনে এসে বোস। সবটা তোকে বলি!

তিন্নি বলল,—দাঁড়াও, আমার চকলেটটা নিয়ে আসি।

দৌড়ে গিয়ে একটা চকলেটের বড় টুকরো নিয়ে এসে সে মাটিতে বাবু হয়ে বসে পড়ল। তারপর চকলেটে কামড় দিয়ে চেয়ে রইল দাদুর দিকে।

দাদু বললেন,—তখন আমরা উত্তর কলকাতায় থাকি, বাগবাজারে। আমার বয়েস তোরই মতো প্রায়, কিংবা আর একটু ছোট। পাঁচ-সাড়ে পাঁচ বছর হবে। আমাদের ঘর তিনতলায়, সামনে একটা মস্ত বারান্দা। সামনেই বড় রাস্তা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত মানুষজন, গাড়ি-ঘোড়া দেখতে পেতাম। তখন অনেক ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছিল। তখনও স্কুলে ভরতি হইনি। বাবা-মায়ের সঙ্গে ছাড়া বাড়ি থেকে বেরুতে পারতাম না। ওই বারান্দা দিয়েই যা কিছু দেখা।

আমাদের বাড়ির নিয়ম ছিল ছোটদের ঠিক ন'টার মধ্যে শুয়ে পড়তে হবে খেয়ে দেয়ে। বাবা-মায়েরা তার পরেও অনেকক্ষণ জেগে থাকবেন, কিন্তু আমাদের জাগা নিষেধ। এক একদিন ঘুম আসত না, ছটফট করতাম, মা তখন ঘরের আলো নিভিয়ে আমাকে চাপড়াতে চাপড়াতে বলতেন, ঘুমিয়ে পড় শিগগির, এরপর হীরামতি রাক্ষুসী আসবে, ছোট ছেলেমেয়েদের দেখলেই ধরে নিয়ে যায়।

হীরামতি রাক্ষুসী নামটা শুনলেই গা-টা ছম-ছম করত।

এক একদিন ঘুমের মধ্যেই যেন ঝম ঝম শব্দ শুনতে পেতাম রাস্তায়। আর শোনা যেত একটা বিকট গলার চিৎকার।

একদিন প্রায় মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল। আমাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে মা-ও পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তায় শোনা যাচ্ছে সেই ঝম ঝম শব্দ। খুব কৌতূহল হল, পা টিপে টিপে চলে এলাম বারান্দায়। তারপর যা দেখলাম, তাতে বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তখন তো রাস্তায় ইলেকট্রিক আলো ছিল না। টিম টিম করে জ্বলত গ্যাসের আলো, একটু রাত হলেই গাড়ি ঘোড়াও চলত না, রাস্তা একেবারে ফাঁকা। রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে একটা রাক্ষুসী। প্রায় দুটো মানুষের সমান লম্বা, মুখখানা একটা বিরাট কালো হাঁড়ির মতন, ক্রিকেটের বলের মতন গোল গোল দুটো লাল চোখ, মুলোর মতো দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে, লকলক করছে জিভ! ওই টুকু দেখেই আমি ছুটে চলে গেলাম ঘরের মধ্যে, সারা শরীর তখনও কাঁপছে। শুনতে পেলাম, সে বিকট গলায় বলছে, হীরামতি রাঁক্ষুসী, পাড়ায় পাড়ায় ঘুঁরি। ছোঁট ছেঁলে মেঁয়ে পেলে কঁড়মুঁড়িয়ে খাঁই!

আরও দু'একদিন ওই হীরামতি রাক্ষসীর আওয়াজ আমি শুনেছি। কিন্তু আর দেখতে যাইনি।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা, রাক্ষুসীটা ছোট ছেলেমেয়েদের ধরবে

কেন? তোমরা ওকে মেরে ফেলতে পারো না?

মা বললেন,—রাক্ষুসীকে কি মানুষে মারতে পারে? এ পাড়ায় একটা রাক্ষুসী আছে, দিনের বেলা তাকে চেনা যায় না। অন্যদের মধ্যে মিশে থাকে। রাত্তিরেই ওদের তেজ বাড়ে। তখন নিজের মূর্তি ধরে। কত লম্বা-চওড়া হয়ে যায়। ওরা মানুষের মাংস ছাড়া কিছু খায় না। ওর সঙ্গে পাড়ার লোকদের একটা চুক্তি হয়েছে, যদি কোনো বাচ্চাকে রাত দশটার পর রাস্তায় কিংবা বারান্দায় দেখা যায়, তা হলেই ও ধরে নিয়ে তাকে খেয়ে ফেলবে। আর যদি বাচ্চারা তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে ও আর কিছু করবে না।

তারপর থেকে ঘুম না এলেও আমি মটকা মেরে বিছানায় শুয়ে থাকতাম।

তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—তুমি একদিন মরে যাচ্ছিলে কেন?

ঠাকুর্দা বললেন,—আগে শোন্ না সবটা! ওই বয়েসে আমি খুব দুরন্ত ছিলাম। মাথায় নানারকম দুষ্টু বুদ্ধি খেলত। কাচের গেলাস ভাঙতাম, জানলার পর্দা ধরে ঝুলতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলতাম। একদিন বাবার দামি হাতঘড়িটা নিয়ে খেলা করতে করতে জলের বালতির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল। বাবা আর মা দুজনেই তো রেগে একেবারে আগুন। ওরা আমাকে মারতেন না বটে, কিন্তু শাস্তি দিতেন নানা রকম। বিকেলে আমাকে কিছুই খেতে দেওয়া হল না। তার ওপর মা বললেন,—দাঁড়া, আজ তোকে হীরামতি রাক্ষুসীর হাতে ধরিয়ে দেব!

তাই শুনে আমি সন্ধে হতে না হতেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। এক সময় ঘুমও এসে গিয়েছিল। মা আমায় ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন,—চল, চল বারান্দায়!

রাস্তায় তখন সেই ঝম ঝম শব্দ আর হীরামতি রাক্ষুসীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমি কিছুতেই যাব না, মা জোর করে টেনে নিয়ে এলেন। তারপর বললেন,—ও হীরামতি, আমাদের এই অসভ্য ছেলেটাকে আজ নিয়ে যাও তো।

রাক্ষুসীটা আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। প্রায় দোতলার সমান লম্বা। ভালো করে দেখা গেল, তার মুখে আর দাঁতে রক্তমাখা। মায়ের কথা শুনেই সে আমার দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিল, অমনি হাতটা সড়াৎ করে উঠে এল তিনতলা পর্যন্ত! আমি কেঁদে চিৎকার করে বলতে লাগলাম, আর করব না, আর করব না, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!

এই রকম বলতে বলতেই একেবারে অজ্ঞান। আর কিছুতেই জ্ঞান ফেরে না। সেই রাতেই বাবা এক চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। জ্ঞান ফিরল পরদিন দুপুরে। চোখ মেলেই আমি চ্যাঁচাতে লাগলাম, আমায় ধরতে আসছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আর করব না। এই রকমই চলতে লাগল দিনের পর দিন। কখনও অজ্ঞান হয়ে যাই, কখনও চ্যাঁচাই, কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করে না, কোনো ওষুধেই কাজ হয়

না। অনেকেই ভাবল, এই ছেলেটা এবার মরে যাবে। মা কপাল চাপড়াতে বলতে লাগলেন, কেন আমি এরকম করলাম। কেন ভয় দেখালাম, ছি ছি ছি ছি।

কয়েকদিন পর ডাক্তারকাকা বাবাকে বললেন,—আমার ওষুধে তো কোনো কাজ হচ্ছে না। তুমি বরং খোকাকে একবার ভোলার কাছে নিয়ে যাও!

তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—ভোলা কে? কোনো সাধু বুঝি?

দাদু বললেন,—না। সে একজন পানওয়ালা। মোড়ের দোকানে পান সেজে বিক্রি করে। বাবা আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন তার কাছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভোলা, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে।

আমার বাবা উকিল ছিলেন, পাড়ার সবাই তাকে মান্যগণ্য করত। ভোলা হাতজোড় করে বলল,—উকিলবাবু, আমায় কী করতে হবে বলুন!

বাবা বললেন,—দোকান বন্ধ করে তোমার ঘরে চল। এখানে হবে না।

পানের দোকানের পেছনেই বস্তি। তার একখানা ঘরে ভোলা থাকে। দেয়ালের পাশে একটা খাট পাতা। আর বিশেষ কিছু নেই।

বাবা বললেন,—ভোলা, সেদিন আমার ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়েছে। কিছুতেই সে ভয় যাচ্ছে না। তুমি বুঝিয়ে দাও, হীরামতি রাক্ষুসী কে?

ভোলা আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—ও খোকাবাবু, তুমি খুব ভয় পেয়েছ? না, না, ভয়ের কিছু নেই। আমিই তো হীরামতি রাক্ষুসী সাজি। পাড়ার বাবুরা আমাকে চাঁদা করে পয়সা দেয়। আমার নামে ভয় পেয়ে যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তাই আমি রাক্ষুসী সেজে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াই।

শুনে আমার খুব রাগ হল। ছোট ছেলে বলে কি কিছুই বুঝি না? রাক্ষস-রাক্ষুসীরা দিনের বেলায় মানুষ সেজে থাকে ঠিকই। কিন্তু রাক্ষুসী তো মেয়ে? পানওয়ালা রাক্ষুসী হবে কী করে?

ভোলা তখন খাটের তলা থেকে একটা টিনের তৈরি মুখোস বার করল। সেই মুলোর মতো রক্তমাখা দাঁত, লাল লকলকে জিভ, গোল গোল সাদা চোখ। মুখোসটা পরে নিয়ে ভোলা বলল,—এই দ্যাখো খোকাবাবু।

তারপর সে খাটের তলা থেকে টিনের তৈরি রাক্ষুসীর পোশাক বার করে পরতে লাগল। টিনের তৈরি বলেই ওরকম ঝমঝম শব্দ হয়।

তিন্নি জিজ্ঞেস করল,—রাক্ষুসীটা লম্বা হয়ে যেত কী করে?

দাদু বললেন,—এই প্রশ্নটা আমার মনেও জেগেছিল। ভোলার ঘরে দুটো রণ-পা ছিল। রণ-পা কাকে বলে জানিস তো? দুটো বড় বড় বাঁশ, তার মাঝখানে হ্যান্ডেল লাগানো, ওই হ্যান্ডেলে পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালে মানুষকে তিনগুণ লম্বা মনে হয়। সেকালে অনেকে রণপায়ে চড়ে হাঁটা প্র্যাকটিস করত। ব্যস্, এই সব দেখে আমার ভয় কেটে গেল। বাবা বললেন,—ভোলা, আজ থেকে আর তোমাকে রাক্ষুসী সাজতে

হবে না। তোমাকে আমি এমনিই পয়সা দেব!

তিন্নি চোখ কুঁচকে বলল,—দাদু, তুমি আমায় ঠকালে।

দাদু বললেন,—কেন?

তিন্নি বলল,—সত্যিকারের হীরামতি রাক্ষুসী তোমাদের সময়েও ছিল না, আমাদের সময়েও নেই। তবে কেন তুমি প্রথমে বললে,—তোমাদের সময়ে ছিল?

দাদু বললেন,—সত্যিকারের না হলেও দেখে ভয় তো পেতাম! আমাদের কাছে এরকম আরও অনেক ভয়ের গল্প ছিল। সেদিক দিয়ে তোরা বেঁচে গেছিস। তোদের কালে আর ভয় পাবার মতো কিছু নেই।

তিন্নি বলল,—কে বলল, ভয় পাবার মতো কিছু নেই! অন্য গ্রহ থেকে সাংঘাতিক সব হিংস্র প্রাণী যখন তখন পৃথিবী অ্যাটাক করতে আসে। সুপারম্যান তাদের সঙ্গে ফাইট করে হারিয়ে না দিলে কী হত বলো তো? কিংবা গডজিলা! গডজিলা যদি বাড়ি-ঘর সব ভেঙে দেয়? তোমাদের হীরামতি রাক্ষুসীর তুলনায় গডজিলা কত বড়!

দাদু গালে হাত দিয়ে বললেন,—তাই তো! ঠিক বলেছিস। ভয় পাবার গল্পতেও তোরা একালে অনেক এগিয়ে আছিস!

হরিরামপুরের বাঘ

হরিরামপুরে আবার একটা বাঘ এসেছে।

আশপাশের গ্রাম থেকে দলে-দলে মানুষ নৌকোয় চেপে, সাইকেল ভ্যানে চেপে কিংবা পায়ে হেঁটে আসছে বাঘ দেখতে। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কেউ বাদ নেই।

মানুষ বাঘকে যেমন ভয় পায় তেমনই বাঘ সম্পর্কে কৌতূহলও খুব বেশি। সুন্দরবনের অনেক মানুষ সারা জীবনেও একটা বাঘ দেখেনি। অথচ সুন্দরবন বাঘের জন্য বিখ্যাত।

কথায় বলে, বাঘের দেখা যে পায়, সে আর ফেরে না। তার মানে এখানকার জঙ্গলে বাঘ এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে কিছুতেই দেখা যায় না। চলাফেরা করে নিঃশব্দে। বাঘ কিন্তু মানুষকে দেখে অনুসরণ করে। জঙ্গলের ধারে যারা মাছ ধরতে যায় কিংবা কাঠ কাটতে যায়, কিংবা মধু আনতে যায়, বাঘ চুপিচুপি তাদের পেছন-পেছন ঘোরে। তারপর তাদের মধ্যে কেউ যখন হঠাৎ বাঘ দেখতে পায়, তখন আর বাঁচবার উপায় নেই, বাঘ ঝাঁপিয়ে পরে ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে যায়। সুন্দরবনের বাঘ নাকি পৃথিবীর আর সব বাঘের চেয়ে বেশি চালাক।

হরিরামপুরের বিষ্ণুপদ জানার পরিবারের সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। পালাবে না তো কী করবে, ওদের গোয়াল ঘরেই তো ঢুকে বসে আছে বাঘটা। গরুদুটো ভাগ্যিস বাঁধা ছিল না, তাই তারাও পালাতে পেরেছে, শুধু একটা বাছুরকে ধরে ফেলেছে বাঘটা। এখন গোয়ালঘরে বসে আরাম করে খাচ্ছে।

বিষ্ণুপদর ছেলে মানিক অঝোরে কাঁদছে নদীর ধারে বসে। ওই বাছুরটা তার খুব প্রিয় ছিল। সে রোজ ওকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যেত। বাছুরটার নাম দিয়েছিল দুধলি।

মানিকের বয়েস পনেরো বছর। এমনিতে খুব সাহসী আর ডাকাবুকো ছেলে। কখনও কাঁদে না। বাঘটা যখন গোয়াল ঘরে এসে ঢোকে, তখন সে রাগের চোটে একটা কাস্তে নিয়ে বাঘটাকে তাড়া করতে গিয়েছিল।

তার দাদা আর বাবা অতিকষ্টে তাকে চেপে ধরে সামলেছে। কাস্তে দিয়ে বাঘ মারা যায়? আর একটু হলে মানিকই মারা পড়ত।

বাঘ এসে মানুষ কিংবা গরু-ছাগল ধরলে সেখানে আর থাকে না। অনেক দূরে চলে যায়। এ বাঘটা কিন্তু দিব্যি গোয়াল ঘরে বসে মটমট করে হাড় চিবুচ্ছে। দিন-দিন সাহস বাড়ছে খুব।

আগে বছরে বড়জোর এক-দুবার জঙ্গল থেকে ছিটকে বাঘ চলে আসত গ্রামে। এখন ঘন ঘন আসছে। এই তো গতমাসেও এসেছিল একটা!

বাঘের এমনি-এমনি সাহস বাড়েনি। তারা একটা গোপন কথা জেনে গেছে।

এ গ্রামের কাছাকাছি কোনো থানা নেই, দত্তের বাগান নামে জঙ্গলে আছে একটা বনবিভাগের অফিস। বাঘের উপদ্রব হলে সেখানেই খবর দিতে হয়।

বিষ্ণুপদ একটা নৌকো নিয়ে চলে গেল সেখানে। কয়েকজনকে বলে গেল, মানিককে ধরে রাখতে। যা গোঁয়ার ছেলে, আবার না বাঘের দিকে তেড়ে যায়!

বনবিভাগের লোকরা বিষ্ণুপদকে বলল,—বাঘ এসেছে তো আমরা কী করব? আমাদের হাত-পা বাঁধা! বাঘ যত ইচ্ছে মানুষকে কামড়াতে পারে কিন্তু মানুষ অত বাঘ মারতে পারবে না। সারা পৃথিবীতেই বাঘ মারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আগেকার দিনে বাঘ শিকারের কত গল্প লেখা হত। বিখ্যাত শিকারি জিম করবেট বাঘ মারার কত সব চমৎকার কাহিনি লিখে গেছেন। এখন আর তার উপায় নেই। এখন কেউ বাঘ মারতে গেলে তারই শাস্তি হবে!

তাহলে কি বাঘেরা সত্যিই জেনে গেছে যে, মানুষ আর তাদের মারবে না? তাই মনের আনন্দে তারা লোকালয়ে ঢুকে এসে গরু-ছাগল-মানুষ যা খুশি ধরে খেতে পারে!

বনবিভাগের কর্মীরা বিষ্ণুপদকে আরও বললে, দেখো বাপু, তোমরা যেন নিজেরা তীরবল্লম কিংবা বন্দুক দিয়ে বাঘটাকে মারতে যেও না। তাহলে পুলিশ এসে তোমাদের ধরে নিয়ে যাবে। বরং অনেকে মিলে টিনের ক্যানেস্তারা আর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শব্দ করো, তাতে যদি বাঘটা পালায়। কিংবা নিরাপদকে খবর দাও।

আগে তাই হত। বাঘ বেশি শব্দ সহ্য করতে পারে না। দল বেঁধে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে-জোরে টিনের ক্যানেস্তারা আর ঢাক-ঢোল পেটালে বাঘ অতিষ্ঠ হয়ে দৌড়ে চলে যেত জঙ্গলে। এখন আর টিনের ক্যানেস্তারা পাওয়াই যায় না। সবই তো প্লাস্টিক। ঢাক-ঢোলও কেউ বাড়িতে রাখে না। যাই হোক, থালা-গেলাস, ঘটি-বাটি যা পাওয়া যায়, সেসব এনে বাজালেও গ্রাহ্য করে না বাঘটা। বরং এমনভাবে হালুম-হালুম করে ডাকে, যেন সেই বাজনায় তাল দিচ্ছে।

মানুষ কেন বাঘ মারতে পারবে না? মানুষের মহা দোষ এই যে তাদের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। সারা পৃথিবী মানুষে গিস্‌গিস্ করছে। বাঘ তো তত বাড়ে না। তাই যেখানে যত খুশি মানুষ মারো। কিন্তু বাঘ-সিংহ, এমনকি কুমির-কচ্ছপ মারাও চলবে না।

শেষ পর্যন্ত নিরাপদকে ডাকতে হল।

অনেক ডাক্তারকে যেমন ধন্বন্তরি বলে, তাঁরা সব রোগ সারাতে পারেন, তেমনি নিরাপদ মণ্ডলের কাছে বাঘ জব্দ হবেই।

কিন্তু নিরাপদকে পাওয়াই মুশকিল। হয় সে ঘুমোয় অথবা দাবা খেলে। তার একটা ওষুধের দোকান আছে, সেখানেও যায় খুব কম।

যাই হোক, অতিকষ্টে ধরে আনা হল নিরাপদকে।

আগেকার দিনে গুণিনরা বাঘ তাড়াবার জন্য নানারকম মন্ত্র বলত, নিরাপদ অবশ্য মন্তর-টন্তর জানে না। তার আছে একটা বিদঘুটে চেহারার বন্দুক। একদল জাপানি একবার সুন্দরবন বেড়াতে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজনকে নিরাপদ দাবা খেলায় হারিয়ে দেয়, সেই জাপানি ভদ্রলোক নিরাপদকে এই বন্দুকটা উপহার দিয়ে যান। পরে অবশ্য সে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্সও করিয়ে নিয়েছে।

নিরাপদকে দেখেই সবাই ভিড় করে তার সঙ্গে যেতে চাইল।

নিরাপদ হাত তুলে বলল,—দাঁড়াও, দাঁড়াও, কেউ এখন আমার সঙ্গে যাবে না! বাঘ যদি কারুর টুটি চেপে ধরে তা হলে কিন্তু আমি দায়ী হব না! আমি খবর দিলে সবাই আসবে!

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বীরদর্পে গোয়াল ঘরটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল নিরাপদ মণ্ডল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে তীরের মতন ছুটে এল মানিক। সে বলল,—আমি যাবই যাব!

বাঘটা এইসময় একবার জোরে হালুম করতেই সব লোক দৌড় লাগাল নদীর দিকে।

নিরাপদর পাশে পাশে চলল শুধু মানিক।

বাঘটা গোয়ালঘরের দরজার দিকেই মুখ করে বসে আছে। কালো হাঁড়ির মতো মুখ, জ্বলজ্বল করছে হিংস্র দুটো চোখ। বিশাল চেহারা।

নিরাপদ একটুও ভয় না পেয়ে বলল,—কী রে, আবার এসেছিস?

বাঘটা এবারে ছোট্ট করে ডাকল, হালুম!

নিরাপদ এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল, তারপর বন্দুকটা তাক করে চালালো গুলি! ধড়াম করে বিকট শব্দ হল।

বাঘটা উঠেও দাঁড়াতে পারল না। মাথাটা ঝুলে গেল, তারপর পাশ ফিরে গড়িয়ে গেল!

মানিক বললে,—কী হল? মরে গেল?

নিরাপদ বলল,—পাগল নাকি? বাঘ মেরে আমি কি জেলে যাব! ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি, এখন নিশ্চিন্ত!

মানিক এগিয়ে গিয়ে দেখল, বাঘটা ভ-র-র ভ-র-র করে নাক ডাকছে।

মানিক রাগের চোটে এক চড় কষাল বাঘটার গালে।

নিরাপদ তার হাত চেপে ধরে বলল,—এই, এই, এখন মারতে নেই, ও কী করছিস!

বন্দুকের আওয়াজ শুনেই ছুটে এসেছে অন্য লোকজনেরা। নিরাপদ বললে,—আমাকে কিন্তু খাওয়াতে হবে ভালো করে, আর গুলির দাম দিতে হবে তিনশো টাকা!

বিষ্ণুপদ তবু ভয়ে ভয়ে বলল,—হঠাৎ জেগে উঠবে না তো?

নিরাপদ বলল,—নাঃ, অন্তত দশ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত! কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে! আমার এটা জাপানি বন্দুক আর জাপানি গুলি, একটুও নড়চড় হয় না। পুলিশের কাছেও এরকম বন্দুক আছে বটে, কিন্তু অনেক সময় ফসকে যায়।

আগেকার দিনে বাঘ শিকারিরা হাতে বন্দুক নিয়ে আর মরা বাঘের গায়ে একটা পা রেখে যে পোজে ছবি তোলাত, নিরাপদও সেইভাবে দাঁড়িয়ে বললে,—কী রে, তোদের কারুর কাছে একটা ক্যামেরাও নেই?

সুন্দরবনের বাঘের নাম শুনলেই যাদের বুক কাঁপে, তারা সবাই এসে ঘুমন্ত বাঘটার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

নিরাপদ বললে,—নাও, নাও, এবার এটাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে নৌকোয় তোল।

অত বড় বাঘ, দারুণ ভারি, প্রায় দশজন লোক লাগল তাকে তুলতে। নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল বনবিভাগের অফিসে। সেখানে বাঘটার গুলি-লাগা জায়গাটায় একটু মলম টলম লাগিয়ে তারপর তাকে নামিয়ে দেওয়া হল জঙ্গলের ধারে।

দিন দশেক পরেই হরিরামপুরে আর একটা বাঘ এসে হাজির! আবার গোয়াল ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকা। এবার সে গরু কিংবা বাছুর মারেনি, কোথা থেকে একটা ছাগল ধরে মুখে করে এনেছে।

আবার ডাকতে হল নিরাপদকে। আবার সেই ঘুমপাড়ানি গুলি। আবার তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া।

পরপর চারবার হল এরকম।

এ তো মহা জ্বালা! বাঘ এসে পড়লে বাড়িতে থাকা যায় না। এর মধ্যে আর মানুষ মারেনি। কিন্তু কখন মারবে তাও তো ঠিক নেই।

নিরাপদকে ডাকলে সহজে আসতে চায় না। এলেও তার জন্য পয়সা খরচ হয়। এত বাঘের উপদ্রবে তো টেকাই মুশকিল। অথচ বাঘকে মারাও যাবে না! বাঘ মনের আনন্দে গরু-ছাগল মেরে নিশ্চিন্তে বসে খাচ্ছে গোয়ালঘরে।

পঞ্চমবারে নিরাপদ বাঘটার কাছে গিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে বলল,—আজ্ঞেঃ, এ যে একই বাঘ দেখছি। এই দেখো মানিক, ওর একটা কান ছোট। একটা বাঘই আসছে ঘুরে ফিরে।

মানিক চেঁচিয়ে বলল,—বাঘটা হাসছে। বাঘটা হাসছে!

বাঘের হাসি কেউ কখনও দেখেনি। কিন্তু এখন সত্যিই মনে হল, বাঘটার মুখে

মুচকি হাসির চিহ্ন!

নিরাপদ বলল,—কী হে, হারামজাদা, খুব মজা পেয়েছিস। তাই না? অন্য বন্দুক এনে দেব খতম করে?

বাঘটা গ-র-র গ-র-র করে খানিকটা আওয়াজ করল।

নিরাপদ মানিককে বলল,—তোরা তো বাঘের ভাষা বুঝিস না। আমি বুঝি। কী বলছে জানিস? আমি তো মানুষ মারছি না, রাগ করছ কেন? তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিলে ভারি আরাম হয়। জঙ্গলে তো একটানা বেশিক্ষণ ঘুমোবার উপায় নেই, অন্য বাঘরা এসে জ্বালাতন করে। মারো গুলি, ভালো করে ঘুমিয়ে নিই!

নিরাপদ বাঘটার দিকে ফিরে বলল,—ইস্, তোকে আরাম দেবার জন্য আমি শুধু-শুধু গুলি খরচ করব। থাক তুই এখানে বসে, এবার আর কিছুই করব না।

বাঘ বলল,—তা হলে কিন্তু মানুষ খাব!

নিরাপদ বলল,—আস্পর্ধা দেখো! আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, এবারই শেষ বার। আর আমি আসতে পারব না।

নিরাপদ বন্দুক তুলতেই বাঘটা বলল,—এবার একটার বদলে দুটো গুলি মারো। তা হলে আরও বেশিক্ষণ ঘুমটা জমবে! আহা, ভাবতেই ভালো লাগছে!

বড়রা যখন ছোট ছিল

বাবা বসবার ঘরে সকালবেলা অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজ পড়েন। মা ভোর বেলাই চলে যান একটা স্কুলে পড়াতে।

মা ফিরে এলে তারপর বাবাব অফিস যাবার পালা। খবরের কাগজ পড়ার সময়েও বাবার একটা কাজ জন্টিকে পাহারা দেওয়া। জন্টি ওই সময় তার স্কুলের পড়া করে, অঙ্ক কষে। কিন্তু বাবা একটু অন্যমনস্ক হলেই সে টুক করে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় চলে যায়।

বারান্দায় সে অন্য কিছু করে না, রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তার কতরকম মানুষ দেখতে তার ভালো লাগে।

জন্টির ভালো নাম সব্যসাচী। সে এবার ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠবে। তার মনে মাঝে মাঝে এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে।

সে সব প্রশ্ন শুনে বাবা চমকে চমকে ওঠেন।

অঙ্ক কষতে কষতে জন্টি হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, বাবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও জলে হাবুডুবু খেয়েছেন?

বাবা খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, কী?

জন্টি আবার ওই একই প্রশ্ন করল।

বাবা বললেন, দূর বোকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন খুব বড় কবি। কবি কাকে বলে জানিস তো?

জন্টি বলল, তা জানি। অনেক কবিতা লিখেছেন। 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে' এটা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। কিন্তু তিনি কখনও জলে হাবুডুবু খাননি?

বাবা বললেন, আবার ওই কথা বলে। তিনি জলে হাবুডুবু খাবেন কেন?

জন্টি বলল, আমাদের ক্লাসের মিস যে বললেন, উনি খুব ভালো সাঁতার জানতেন? সাঁতার শিখতে গিয়ে আগে দু'একবার হাবুডুবু খাননি? একবারেই শিখে গেলেন?

বাবা একটু হেসে বললেন, না, একবারেই কেউ সাঁতার শিখতে পারে না। উনিও দু'একবার হাবুডুবু খেয়েছেন বোধহয়। ওঁদের বাড়ির পেছনে একটা পুকুর ছিল।

জন্টি খুব সন্তুষ্ট হয়ে বলল, ও আচ্ছা!

আসলে জন্টি সাঁতার শিখতে যাচ্ছে ক'দিন ধরে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের এক এক ব্যাচ করে সাঁতার শেখান শেয়াল রাজা। আসলে তাঁর নাম শ্যামলকান্তি

দে মজুমদার। কিন্তু বাচ্চারা তাঁর ওই নাম দিয়েছে।

শেয়ালরাজা বড্ড বকাবকি করেন।

ঠিক মতো হাত-পা ছুঁড়তে কেউ ভুল করলেই তিনি ধমকে উঠে বলেন, তুই শুধু হাবুডুবুই খাবি। তোকে আর সাঁতার শিখতে হবে না।

জন্টিকে তিনি দু'বার বকে দেন।

এখন জন্টি নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যখন হাবুডুবু খেয়েছেন, তখন তার আর কী দোষ! সেও ঠিকই সাঁতার শিখে যাবে।

এখন তার একথাও মনে হল, ওই শেয়ালরাজাও নিশ্চয়ই নিজে সাঁতার শেখার সময় কয়েকবার হাবুডুবু খেয়েছে!

আর একদিন সে জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি কখনও আছাড় খেয়েছ?

বাবা বললেন, কবে?

জন্টি বলল, কোনোদিন? একবারও!

বাবা বললেন, হ্যাঁ, এই গত মাসেই তো, ট্রামে উঠতে গিয়ে... আমার চশমা-টশমা ভেঙে গেল, তোর মনে নেই?

জন্টি বলল, আর ছোট বয়েসে?

বাবা বললেন, 'জলে না নামিলে কেউ শেখে না সাঁতার। চলিতে শেখে না কেউ না খেলে আছাড়!' বাচ্চা বয়েসে হাঁটতে শেখার আগে সবাই আছাড় খায়! মহাত্মা গান্ধী কিংবা কার্ল মার্কসও নিশ্চয়ই আছাড় খেয়েছেন। বড় হলে যাঁদের মুখে দাড়ি থাকে কিংবা যাঁদের মাথায় টাক পড়ে তারাও একটু একটু করেই হাঁটতে শেখে।

বাবা, তুমি কখনও গাছে চড়েছ?

হ্যাঁ, চড়েছি। আমার মামাবাড়ি ছিল গ্রামে, বাঁকুড়ায়, সেখানে গাছে চড়েছি। পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পেড়েছি।

গাছ থেকে পড়ে যাওনি?

হ্যাঁ, তাও পড়ে গিয়েছিলাম একবার। পা ফসকে গিয়েছিল, পায়ে হলুদ আর চুন মাখিয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল বেশ ক'টা দিন।

জন্টি এবার চোখ বড় বড় করে বলল, বাবা!

বাবা বললেন, কী রে জন্টি?

তবে কেন মা আমাকে খুব বকল সেদিন?

মা বকেছে? কোন্ দিন? কবে?

এই শনিবারে। আমরা যে বারুইপুরে মিনি মাসিদের বাড়ি গেলাম, আমি আর বিল্টু একটা পেয়ারা গাছে উঠেছিলাম।

পড়ে গিয়েছিলি নাকি? অ্যাঁ?

একটুখানি। আমার পা মচকায়নি, শুধু প্যান্টে কাদা লেগেছিল। তবু কেন মা

বকল? তোমার মা বকেছিল?

আমার মা, না, মা জানতেই পারেনি। তবে জন্টি, আমি যখন গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, তখন আমি তোর থেকে বয়েসে বড়।

তুমি বড় গাছে চড়েছিলে। আমি তো একটা ছোট গাছে, পড়ে গেলেও লাগে না।

বাবা হেসে উঠলেন।

জন্টি ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, মা কখনও গাছে চড়েনি?

বাবা বললেন, যে-সব মেয়েরা গাছে চড়ে, তাদের কী বলে জানিস? গেছো মেয়ে। তোর মা গেছো মেয়ে ছিল কিনা, তা তো জানি না, তখন দেখিনি। তুই জিজ্ঞেস করিস।

মা যদি বলে, মাও গাছে চড়ত, তা হলে কি আমায় যে বকেছে, সেই বকুনি ফিরিয়ে নেবে?

বকুনি কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যায়? তবে, যদি তোকে একটু আদর করে, কিংবা একটা চকলেট কিনে দেয়... ও হ্যাঁ জন্টি, একটা মজার কথা মনে পড়েছে। তোর দিদিমার কাছে শুনেছি, তোর মার যখন সাড়ে তিন বছর বয়েস, তখনও হামাগুড়ি দিত আর কথা বলতে পারত না।

হামাগুড়ি দিত?

হ্যাঁ, সাধারণত বাচ্চারা দেড় দু'বছরের মধ্যেই কথা বলতে শুরু করে আর উঠে দাঁড়ায়। তোর মা তার অনেক পরেও হামাগুড়ি দিচ্ছে দেখে সবাই খুব ভয় পেয়েছিল। ভেবেছিল, ও মেয়ে বুঝি বোবা হবে আর হাঁটতে চলতে পারবে না।

তারপর কী হল?

তারপর একসময় ঠিক হয়ে গেল। কারুর কারুর দেরি হয়। ওই যে প্রথম এক দেড় বছর কথা বলেনি, তাই এখন পুষিয়ে নিচ্ছে। কত বেশি কথা বলতে হয় স্কুলে গিয়ে।

জন্টি খিল খিল করে হেসে উঠল।

সে যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে, তার শাড়ি পরা, চশমা-চোখে মা হামাগুড়ি দিচ্ছে!

দু'দিন পরে সিমলা থেকে এলেন ছোটো দাদু, মানে বাবার ছোট কাকা।

ইনি একসময় মিলিটারিতে ছিলেন, এখন রিটায়ার করে সিমলাতেই থাকেন। কিন্তু এখনও কথা বলেন মিলিটারি মেজাজে।

মা আগেই বলে দিয়েছেন, জন্টি সোনা, তোমার ছোটো দাদু যে ক'দিন থাকবেন, একটুও দুষ্টুমি করবে না, হুটোপাটি করবে না। উনি গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না।

বাবা বলেছেন, আর খাওয়ার সময় প্লেটের বাইরে যেন ভাত না পড়ে। উনি তা দেখলে খুব চটে যান।

মা বললেন, সেই একবার মনে আছে, আমি তখন নতুন বউ হয়ে তোমাদের বাড়িতে এসেছি, উনি একজন ফেরিওয়ালাকে এমন ধমক দিলেন, ঠিক যেন মেঘ ডাকল, আর তাই শুনে ভয়ে আমার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল।

বাবা বললেন, ছোট কাকা তোমাকে নিশ্চয়ই বকেননি।

মা বললেন, আমাকে তো বাঁচিয়ে দিলেন তোমার মা। উনি বললেন, কাপটা উনি ভেঙেছেন। তাই ছোট কাকা আর কিছু বলতে পারলেন না।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, ছোটকাকা একমাত্র ভয় পেতেন নিজের মাকে। কোথাও কারুকে কিছু বকাবকি করছেন হয় তো, তখন সেখানে ওঁর মা এসে পড়লেই একেবারে চুপ!

ছোট দাদুর নাম রণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরি। তাঁর চেহারা দেখলেই ভয় ভয় লাগে। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। ফরসা টকটকে রং। আর নাকের নীচে ঠিক একটা ঝাঁটার মতো গোঁফ।

তিনি বাড়ির মধ্যেও জুতো মোজা পড়ে থাকেন। আর সকালে দাঁত মাজার পর মুখ ধুতে গিয়ে গলা দিয়ে এমন আওয়াজ করেন, যেন ঠিক মনে হয় মেঘ ডাকছে।

জন্টি তাঁর ধারে কাছে যায় না।

তিনি শুধু জন্টিকে দেখে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই, তোর নাম কী রে?

জন্টি বলেছিল, সব্যসাচী।

রণেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ওভাবে নাম বলতে হয় না। বলতে হয়, শ্রীসব্যসাচী রায়চৌধুরি। পদবি ছাড়া নাম হয় নাকি? সব্যসাচী মানে জানিস?

হ্যাঁ, জানি, অর্জুন।

অর্জুন কি নামের মানে হল? অর্জুনের আর এক নাম সব্যসাচী। কিন্তু কেন অর্জুনের এই নাম হল?

জন্টি চুপ। সব্যসাচী নামের মানে সে জানত। এখন ভুলে গেছে। এই রে, তা হলে কি ছোট দাদু রেগে যাবেন?

রণেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, তুই বাঁ হাতে ঢিল ছুঁড়তে পারিস? জন্টি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

রণেন্দ্রনাথ বললেন, আমি পারি। আমি এই বাঁ হাত দিয়ে বোমা ছুঁড়েছি। আর ডান হাত দিয়ে রাইফেল চালিয়েছি। আমারই নাম হওয়া উচিত ছিল সব্যসাচী। তার মানে যে দু'হাত দিয়ে যুদ্ধ করতে পারে। বুঝলি তো?

হ্যাঁ।

তুই এখন থেকে বাঁ হাতে ঢিল ছোঁড়া প্র্যাকটিস কর।

ব্যাস ওই পর্যন্ত। ছোট দাদুর সঙ্গে তার আর কোনো কথা হয়নি।

ছোট দাদুকে দেখলে সে চট করে চলে যায় অন্যদিকে। এক সঙ্গে খেতে বসে না। সে খেয়ে নেয় আগে, আর আগেকার মতো দেরিও করে না।

স্কুল থেকে ফিরেই সে চলে যায় ছাদে।

বাঁ হাত দিয়ে ঢিল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করে। মোটেই পারে না। তাদের বাড়ির কাছেই একটা নারকেল গাছ আছে। সেটার দিকে টিপ করে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটা বেঁকে চলে যায় অন্যদিকে। আর একটু হলে পাশের বাড়ির জানলার কাচে লেগে যেত!

যাক গে, বাঁ হাত দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে না পারলেও ক্ষতি নেই। জন্টি তো বড় হয়ে মিলিটারি হতে চায় না! তার নাম সব্যসাচী হলেও সে যুদ্ধ করবে না। সে হতে চায় অ্যাসট্রোনাট। সে চাঁদে যাবে। কিংবা আরও দূরে।

তবে রণেন্দ্রনাথ বোধহয় আগের চেয়ে ঠান্ডা হয়ে গেছেন। কই, সেরকম বকাবকি তো কারুকে করলেন না একদিনও।

বরং, খাবার টেবিলে বসে তিনি অনেকক্ষণ গল্প করেন জন্টির বাবা আর মায়ের সঙ্গে। এক এক সময় হেসে ওঠেন খুব জোরে।

পাশের ঘর থেকে জন্টি শুনতে পায়।

তখন সে ভাবে, যে মানুষ অমনভাবে হাসতে পারে, সে কি রাগী হয়? কিন্তু মা-বাবা আগে থেকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছেন যে জন্টি ওঁর কাছে যেতেই সাহস পায় না।

একদিনই শুধু একটা কাণ্ড হল।

বাবা বাজারে যাবার সময় পান না বলে বাড়িতেই ফেরিওয়ালারা আসে। একজন আসে তরকারির ঝুড়ি নিয়ে। একজন আনে মাছ।

রণেন্দ্রনাথ সকালবেলা বেরিয়ে যান, ফেরেন রাত্তির বেলা। কলকাতায় তাঁর চেনাশুনো অনেক লোক আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করেন। ফোর্ট উইলিয়ামেও যান।

সেদিন তিনি বাড়িতেই ছিলেন।

সকালবেলা মাছওয়ালা এসেছে, রণেন্দ্রনাথ তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, দেখি, দেখি, কী মাছ আছে? সিমলায় ভালো মাছ পাওয়া যায় না, আজ আমি মাছ কিনব!

চিংড়ি মাছ, পার্সে মাছ আর ট্যাংরা মাছ আছে।

তিনি বললেন, বাঃ চিংড়িগুলো তো খুব টাটকা। কত দাম?

দাম শুনে তিনি আর দরাদরি করলেন না, বললেন, দাও এক কিলো!

তারপর বললেন, পার্সে আর ট্যাংরাও দিয়ে দাও!

মা বললেন, এত মাছ কী হবে?

রণেন্দ্রনাথ বললেন, হোক না একদিন, বেশি করে মাছ খাওয়া যাবে। ট্যাংরা মাছ

কতকাল খাইনি।

সব মাছ-টাছ ওজন করা হয়ে যাবার পর তিনি মাছওয়ালাকে বললেন, এবার দাঁড়ি-পাল্লাটা আমার হাতে দাও। মাছগুলো আবার চাপাও।

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি ওজন করা শুরু করলেন।

দেখা গেল, সব মাছই ওজনে কম দিয়েছে। এক কিলোর জায়গায় কোনোটা আটশো গ্রাম, কোনোটা সাড়ে সাতশো!

মাছওয়ালার দিকে তিনি কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ব্যাটা, তোর সঙ্গে আমি দরাদরি করেছি? তবু তুই ওজনে কম দিলি কেন? সব লোককেই তুই ঠকাস! এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছিস?

মাছওয়ালার মুখখানা কাঁচুমাচু হয়ে গেছে! কোনো উত্তর দিল না।

রণেন্দ্রনাথ মেঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তোর বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই। তোকে আমি গুলি করে মারব! গীতা, আমার রিভলবারটা নিয়ে এসো তো!

মাছওয়ালা এবার রণেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে বলল, বাবু, এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন। আর কোনোদিন করব না। আমায় প্রাণে মারবেন না।

রণেন্দ্রনাথ বললেন, প্রাণে মারব না? ঠিক আছে, উঠে দাঁড়া। কান ধর। এবার বল, আর কোনোদিন মানুষকে ঠকাব না। সাতবার বলবি!

মাছওয়ালা নিজের দু'কান ধরে সেই কথা বলতে বলতে এক সময় বসল।

রণেন্দ্রনাথ বললেন, সাতবার হয়নি। ছ'বার বলেছিস। এখানেও ঠকাবার চেষ্টা করছিস? তা হলে তো তোকে আরও শাস্তি দিতে হবে।

মাছওয়ালা কেঁদে ফেলে বলল, ভুল হয়ে গেছে। এবারে আমি গোড়া থেকে আবার সাতবার বলছি!

তা দেখে জন্টি আর হাসি চাপতে পারছিল না। অত বড় একটা লোককে সে কখনও নিজের কান ধরে দাঁড়াতে দেখেনি!

আজ জন্টিকেও খেতে বসতে হল বড়দের সঙ্গে। তার স্কুল ছুটি।

খেতে বসে মাছওয়ালার ব্যাপারটা নিয়ে হাসতে লাগল সবাই।

রণেন্দ্রনাথ বললেন, দেখো তোমরা, ও ব্যাটা আর কোনোদিন তোমাদের ঠকাতে সাহস করবে না। এ বাড়িতে অন্তত না।

জন্টির ভয় ভেঙে গেছে।

সে হঠাৎ ফস করে জিজ্ঞেস করল, ছোট দাদু, তুমি ছোট বয়সে বাঁ হাত দিয়ে বোমা ছুঁড়তে?

সবাই চমকে উঠলেন।

বাবা বললেন, কী বাজে কথা বলছিস জন্টি!

জন্টি বলল, বোমা না। বোমা না। ঢিল। ঢিল। ছোটবেলা বাঁ হাত দিয়ে ঢিল

ছুঁড়তে?

রণেন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক বলেছিস! ছোটবেলা থেকেই আমি বাঁ হাতে অনেক কিছু প্র্যাকটিস করেছি। দুটো হাত নিয়ে জন্মেছি। দুটো হাত কাজে লাগাতে হবে না? বাঁ হাত দিয়েও ঢিল ছুঁড়েছি। একবার কী হলো, মাঠে দাঁড়িয়ে একবার ডান হাতে আর একবার বাঁ হাতে ঢিল ছুঁড়ছি। পাশের রাস্তা দিয়ে একজন পোস্টম্যান যাচ্ছিল, দেখতে পাইনি, একটা ঢিল তার কপালে লাগল, সে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড।

আমি পালিয়ে গিয়েও রক্ষা পেলাম না।

পোস্টম্যান আমাকে চিনে ফেলেছিল। বাবার কাছে নালিশ করে দিল। আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। তিনি পোস্টম্যানটির কপালে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন আর আমাকে ধরে এনে প্রথমে মারলেন একখানা চড়, তারপর কান ধরে ওঠ বোস করালেন একশো বার!

বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট দাদুও হেসে ফেললেন বলতে বলতে। কিন্তু জন্টির হাসিটাই সবচেয়ে বেশি।

সে যেন দেখতে পাচ্ছে, এই মস্তবড় বীরপুরুষ, মুখে ঝাঁটার মতো গোঁফ, কান ধরে ওঠ বোস করছে!

তা হলে আর এঁকে ভয় পাবার দরকার কী?

ছোট দাদু চলে যাবার কয়েকদিন পর জন্টি সকালবেলা ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছেই। তার উঠতে ইচ্ছে করছে না। অন্যদিন মা স্কুলে যাবার সময়ই সে উঠে পড়ে।

বাবা এসে দু'বার ডেকে গেলেন। তবু জন্টি উঠছে না। তারপর বাবা হাত ধরে টেনে তুললেন জন্টিকে।

জন্টি উঠে পড়ার পরেও বাবা জন্টির বিছানাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তারপর জন্টির কপালে হাত দিয়ে বললেন, তোর জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে। তা হলে আজ আর স্কুলে যেতে হবে না!

মা ফেরার পর বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্টিকে দু'একদিনের মধ্যে খুব তেল-টেল মাখিয়ে চান করিয়েছিলে?

মা বললেন, না তো।

বাবা বললেন, তা হলে ওর বিছানায় হলদে হলদে দাগ হয়েছে কেন?

তা শুনেই মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেল। তিনি দৌড়ে গিয়ে দেখলেন জন্টির বিছানা।

বাবার বন্ধু নীতিশকাকু একজন ডাক্তার। তিনি এসে দেখেটেখে বললেন, এখন বেশ কিছুদিন ওকে শুইয়ে রাখতে হবে। দৌড়োদৌড়ি করা একেবারে বারণ। আর কী কী ওকে খাওয়াবে, লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

জন্টির এখন অসুখ। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পারে। কিন্তু খেলাধুলো করতে পারবে না।

রাত্তিরবেলা মা যখন বিছানার পাশে বসে জন্টিকে দুধ আর পাউরুটি খাওয়াচ্ছেন, জন্টি জিজ্ঞেস করল, মা, তোমার কখনও জ্বর হয়েছে ছোটবেলায়।

মা বললেন, হবে না কেন? জ্বর সবারই হয়।

জ্বর হলে তুমি বিছানায় শুয়ে থাকতে?

থাকতেই হত। একবার আমায় ম্যালেরিয়ায় ধরেছিল। প্রায়ই জ্বর হয়, আর সে কি কাঁপুনি। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারতাম না।

তখন তোমার বিছানায় কি হলদে হলদে রং হয়ে গিয়েছিল?

না। ম্যালেরিয়ায় তো এরকম হয় না। তোরটা অন্য অসুখ। সেরে যাবে, সোনা।

জন্টি বাবাকেও একথা জিজ্ঞেস করেছিল।

বাবাও ছোটবেলায় অনেকবার জ্বরে ভুগেছেন। কিন্তু তাঁর বিছানা হলদে হয়ে যায়নি।

ছোটবেলা বাবার যা হয়নি, মায়ের হয়নি, তা কেন জন্টির হল? সে এর উত্তর খুঁজে পায় না।

তার মনে হয়, আস্তে আস্তে তার পুরো শরীরটাই হলদে হয়ে যাবে। সে হবে হলদে মানুষ। বিছানা হলুদ, গায়ের জামা হলুদ। কেউ তাকে ঘেন্নায় ছোঁবে না।

সে কি আর কখনও স্কুলে যেতে পারবে?

ক্লাসের ছেলেরা বলবে, এ ছেলেটা হলদে, এ আমাদের মধ্যে বসবে না। লাস্ট বেঞ্চে একলা বসে থাকুক!

কেউ তাকে খেলায় নেবে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে জন্টির এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে তার আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না।

রোগা হয়ে একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেল।

নীতিশকাকু রোজ দেখতে আসেন।

চিন্তিত মুখে বলেন, শুধু ওষুধ দিয়ে তো এ রোগ সারানো যায় না। ছেলেটা যে কিছু খাচ্ছে না। সেটাই তো চিন্তার কথা।

বাবা বললেন, জোর করে খাওয়াতে গেলে বমি করে ফেলে দেয়।

মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

মায়ের কান্না শুনেই জন্টি ভাবল, সে এবারে মরে যাবে। বস্তির একটা ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছিল, তার মা সবসময় কাঁদে।

পরদিন জন্টির বাবা বললেন, জন্টি, তোর যদি দুধ-পাউরুটি ভালো না লাগে, অন্য কী খেতে ইচ্ছে করে বল? চাইনিজ খাবি?

জন্টি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

বাবা বললেন, কিছু না খেলে কি মানুষ বাঁচে? আজ ভালো জায়গা থেকে চিকেন স্যান্ডুইচ এনেছি। একটা খেয়ে দেখ!

এবারে জন্টি মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি তো আর বাঁচব না।

বাবা বললেন, দূর, ও আবার কী কথা? অসুখ সবারই হয়। আবার সেরে যায়।

তোমাদের তো এ অসুখ হয়নি।

অসুখ কত রকমের হয়। আমার তো স্মল পক্স হয়েছিল, সেটা খুব বাজে অসুখ, কোনোক্রমে বেঁচে গেছি। তোর সে অসুখ কখনও হবে না। সে অসুখটা উঠে গেছে পৃথিবী থেকে।

হলদে অসুখ তো আর কারুর হয় না।

কেন হবে না! শোন তবে। এই অসুখটার নাম জন্ডিস। বাংলায় বলে ন্যাবা। কত লোকের হয়, আবার সেরে যায়।

তুমি এই অসুখ আর কারুর দেখেছ?

হ্যাঁ দেখেছি। তবে শোন একটা কথা। আজকেই কাগজে পড়লাম। তোর নাম জন্টি রেখেছিলাম কেন জানিস? সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট টিমে জন্টি রোডস নামে একজন খেলোয়াড় আছে। তার খেলা প্রথম থেকেই আমার খুব ভালো লাগে। তাই তোকে আমি জন্টি বলে ডাকি। সেই যে জন্টি রোডস্, তারও একবার ছোটবেলায় জন্ডিস হয়েছিল। বিছানা হলদে হয়ে যেত। তারপর তো সে সেরে উঠেছে।

সে তখন কত বড় ছিল?

এই তোরই মতন হবে। দশ-এগারো বছর। এখন দ্যাখ, সে কী দারুণ ছোটাছুটি করতে পারে। ফিল্ডিং-এ সারা পৃথিবীতে এক নম্বর। খাবি স্যান্ডুইচ?

জন্টি বলল, সে তখন আমার সমান ছিল?

হ্যাঁ।

জন্টি আস্তে আস্তে উঠে বসল।

স্যান্ডুইচ-এর প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দাও একটা!

বাবা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

বিপিনবাবুর চশমা

পলাশপুর রেল স্টেশনে রাত্তির দুটো দশ মিনিটে একটা ট্রেন থামে। অত রাতের ট্রেন বলেই তাতে পলাশপুর থেকে কোনো যাত্রী ওঠে না। কোনো কোনো দিন ট্রেনটা দু'তিন ঘণ্টা লেট করে, আসতে আসতে ভোর হয়ে যায়। কে সারারাত স্টেশনে বসে থাকতে চায়?

হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে রতনকে কলকাতায় যেতেই হবে। তাই সে ওই ট্রেনের টিকিট কিনেছে। বেশি রাত হয়ে গেলে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায় না, তাই সে রাত বারোটার মধ্যে স্টেশনে চলে এল। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে আর কেউ নেই, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়, ইচ্ছে করলে বইও পড়া যায়।

এই সময় স্টেশনটাকে ঘুমন্ত মনে হয়। কুলি কিংবা পান-বিড়িওয়ালারাও ঘুমোয়। রতন একখানা বই খুলে পড়ছে। এই সময় দরজা ঠেলে একজন মাঝবয়েসি লোক ঢুকল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথায় অল্প টাক।

লোকটিকে একটু যেন চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না রতন। সে আবার বই পড়তে লাগল।

একটু পরে লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে রতনের কাছে এসে বসে পড়ে বলল, আমি কি আপনার কাছে একটু বসতে পারি?

রতন একটা চামড়ার ব্যাগ এনেছে, সেটা তার পায়ের কাছে রাখা। ব্যাগটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, হ্যাঁ, বসুন না!

যদিও মনে মনে সে একটু অবাক হল। এত বড় ঘর, অনেকগুলি চেয়ার থাকতেও লোকটি তার কাছে এসে বসতে চায় কেন?

এই লোকটি একজন জজসাহেব শুনে রতনের খানিকটা সম্ভ্রম হল। জজদের কত ক্ষমতা। ইচ্ছে করলেই মানুষকে জেলে ভরে দিতে, এমনকি ফাঁসিও দিতে পারে।

যেন রতনের মনের কথাটা বুঝতে পেরেই বিপিন চৌধুরি বললেন, জজের চাকরি বড় বিপদের চাকরি। সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি রিটায়ার করেছি। কিন্তু তবু বিপদ আমাকে ছাড়ছে না।

রতন কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিপিন চৌধুরি বলল, এ চাকরিতে মানুষকে কত রকম শাস্তি দিতে হয়। অনেক সময় নির্দোষ লোকও শাস্তি পায়, তা অস্বীকার করছি না। উকিলরা এমনভাবে মামলা

সাজায় যে মাথা গুলিয়ে যায়। একবার কী হয়েছিল জানো?

বিপিনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খাবে?

রতন দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, আমি খাই না।

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও তার খারাপ লাগে। কিন্তু এখন গল্প শোনার লোভে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইল।

বিপিনবাবু বলল, একবার নকুল বিশ্বাস নামে একজন লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। লোকটির খুব শক্তপোক্ত চেহারা। লম্বা। চোখ দুটো দেখলেই ভয় করে। ওর নামে খুনের মামলা। রাগের মাথায় এক বন্ধুকে খুন করে ফেলেছে। তাও খুব বীভৎসভাবে। একটা পাথর দিয়ে ঠুকে মাথাটা একেবারে ছাতু করে দিয়েছে।

লোকটি অবশ্য অস্বীকার করেছে নিজের দোষ। বারবার বলেছে যে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। মেরেছে অন্য এক বন্ধু, ওর নামে দোষ চাপিয়েছে। এমন কথা তো অনেকেই বলে। সাত জন লোক সাক্ষী দিল নকুলের বিরুদ্ধে। ওর বাড়িতে একটা রক্তমাখা জামাও পাওয়া গেছে। নকুলকে ফাঁসির হুকুম দিতেই হল। তখন নকুল রাগের চোটে কাঠগড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগল। আমার দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, জজসাহেব, তুমি আমাকে বিনা দোষে ফাঁসিতে পাঠাচ্ছ? তোমায় আমি ছাড়ব না। একদিন না একদিন আমি ঠিক এসে তোমায় গলা টিপে মারব। আমার হাতেই তুমি মরবে!

রতন জিজ্ঞেস করল, লোকটির কি সত্যি ফাঁসি হয়েছিল? অনেক ফাঁসির আসামী তো ছাড়াও পেয়ে যায়।

বিপিনবাবু বলল, নকুল ছাড়া পায়নি। আপিল করেছিল, সুবিধে হয়নি। এক বছর বাদে নকুলের ফাঁসি হয়ে গেল। কেউ তার ডেডবডি নিতে আসেনি, তাই জেলের লোকরাই পুড়িয়ে ফেলে। নকুল কিন্তু আমার পিছু ছাড়েনি। আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জায়গায় চলে এসেছি, তাও—

রতন বলল, তার মানে? সে মরে গেছে, তবু কী করে?

বিপিনবাবু বলল, তার আত্মা অন্য মানুষের রূপ ধরে আসে। দু'বার আমার গলা টিপে ধরেছে।

রতন এবার হেসে উঠে বলল, ভূতের গল্প? আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন?

বিপিনবাবু বিমর্ষভাবে বলল, আগে করতাম না। এখন তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই। তিনবার সে আমায় আক্রমণ করেছে। অন্য লোকজন এসে পড়ায় বেঁচে গেছি। রাত্তিরে আমি একা একা কোথাও যাই না। নেহাত আমার মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে—

রতন বলল, এখানে ভূত আসবে না। আপনার চিন্তার কিছু নেই।

বিপিনবাবু হাত দিয়ে পাশে কী যেন খুঁজতে লাগল। আপনমনে বলল, চশমাটা

কোথায় গেল? চশমাটা কোথায় রাখলাম?

রতন বলল, ওই তো পাশের চেয়ারে রেখেছেন।

বিপিনবাবু এবার চশমাটা পেয়ে চোখে লাগিয়ে বলল, চশমা ছাড়া কিচ্ছু দেখতে পাই না। একবার নকুল এসে গলা টিপে ধরার পর চোখ দুটো বেশি খারাপ হয়ে গেছে।

এই সময় আর একজন লোক ঢুকল। রোগা-পাতলা চেহারা। সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই। বসল গিয়ে একটু দূরের চেয়ারে।

বিপিনবাবু ফিসফিস করে বলল, সাবধান! এ হতে পারে।

রতন জিজ্ঞেস করল, আপনার সেই নকুলের বয়েস কত ছিল?

বিপিনবাবু বলল, বেয়াল্লিশ।

রতন বলল, এর তো অনেক কম বয়েস। তিরিশের বেশি না।

বিপিনবাবু বলল, তাতে কী! নকুলের আত্মা ওর শরীরে ঢুকে পড়তে পারে।

রতন অবিশ্বাসের হাসি দিয়ে নতুন লোকটির দিকে আড়চোখে তাকাল। নিতান্তই নিরীহ চেহারা। তবে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী বলে মনে হয় না।

লোকটি ওদের উদ্দেশে বলল, ট্রেন বোধহয় লেট হবে। আপনারা ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

রতনের অবশ্য ঘুমোবার একটুও ইচ্ছে নেই। সে আবার বই খুলল।

নতুন লোকটি একটু পরে বাথরুমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সেদিকে কয়েক পা গিয়ে ঝপ করে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

মৃগী রুগীদের এরকম হয়। রতন লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল? কী হল আপনার?

উত্তর না দিয়ে সে তখনও একরকম শব্দই করে যেতে লাগল।

রতন বলল, মুখে-চোখে জল দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির যেন জ্ঞান ফিরে এল। কটমট করছে চোখ দুটো। বিপিন চৌধুরির দিকে তাকিয়ে বলল, তুই সেই জজসাহেবটা না? আজ তোকে শেষ করবোই আমি। নকুল বিশ্বাস কথার খেলাপ করে না।

রতন কিছু বোঝার আগেই সে লাফিয়ে উঠে বিপিন চৌধুরির গলা টিপে ধরল।

বিপিন চৌধুরি আর্তকণ্ঠে বলতে লাগল, বাঁচাও! ও ভাই বাঁচাও আমাকে। এ মেরে ফেলবে!

রতনের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগল। সত্যি সত্যি এরকম হয়! এই নিরীহ চেহারার লোকটার শরীরে নকুল বিশ্বাস নামে একজন খুনীর আত্মা ভর করেছে?

রতন পেছন দিক থেকে লোকটাকে টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

অমনি লোকটি বিপিন চৌধুরিকে ছেড়ে দিয়ে উল্টো দিকে ফিরে আচমকা এক ধাক্কা মারল রতনকে।

তাল সামলাতে না পেরে রতন পড়ে গেল মাটিতে। সেই লোকটি রতনের বুকে চড়ে গলা টিপে ধরল।

বিপিন চৌধুরি এই ফাঁকে দৌড়ে পালাল ঘর থেকে।

বুকের ভেতরটা আঁকুপাকু করছে রতনের। এবার সে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। ভূতের সঙ্গে কী করে লড়াই করবে? সে কাতর গলায় বলল, আমায় কেন মারছ? আমি তো কোনো দোষ করিনি।

লোকটি অমনি হাত আলগা করে বলল, তাই তো! তোমায় কেন মারব? সে ব্যাটা পালাল কোথায়?

লোকটি রতনকে ছেড়ে দিয়ে তীরের মতো ছুটে গেল বিপিন চৌধুরিকে ধরতে।

মুক্তি পেয়ে রতন হাঁপাতে লাগল। বাপরে বাপ, খুব জোর বাঁচা গেছে! এ কী সব ভুতুড়ে কাণ্ড!

দারুণ তেষ্টা পেয়ে গেছে। চামড়ার ব্যাগটায় জলের বোতল আছে। সেই ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াতেই আবার সে চমকে উঠল। ব্যাগটা নেই সেখানে। ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। তারপর প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, মানিব্যাগও নেই।

তার মানে সবটাই সাজানো, সবটাই অভিনয়। ভূত-টুত কিছু নয়। বিপিন চৌধুরি নামের লোকটা কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে পালিয়েছে. আর ধস্তাধস্তির সময় অন্য লোকটা পকেট থেকে তুলে নিয়েছে মানিব্যাগ।

মানিব্যাগে বেশি টাকা ছিল না। কালো ব্যাগটায় ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। শিগগিরই তার দাদার মেয়ের বিয়ে। বাবা সেইজন্য টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলিয়ে রতনের হাত দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন। বিপিন চৌধুরি ব্যাঙ্কে ঘোরাঘুরি করে দেখে কে কত টাকা তোলে। রতন যে আজ এই ট্রেনে কলকাতায় যাবে, তাও কোনো রকমে জেনেছে।

এখন কী হবে? এখন তো আর ওদের ধরা অসম্ভব। নিশ্চয়ই মিলিয়ে গেছে বাইরের অন্ধকারে। পুলিশকে একটা খবর দিতে হবে। তাতেও কি লাভ আছে কিছু?

রতনের মনটা খুব ভেঙে গেল।

হঠাৎ নজরে পড়ল, মাটিতে বিপিন চৌধুরীর চশমাটা পড়ে আছে। যদি সেটা পুলিশের কোনো কাজে লাগে, সেই ভেবে তুলে নিল চশমাটা। তারপর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

ট্রেন আসার আর দেরি নেই। তাই স্টেশন জেগে উঠেছে. রতন দেখল, এক জায়গায় একটা ছোটখাটো ভিড়। লোকেরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে যেন কিছু একটা রয়েছে।

সে দৌড়ে গেল সেদিকে। আবার চমকে উঠল।

মাটিতে পড়ে আছে বিপিন চৌধুরি নামের সেই লোকটি। পাশেই তার চামড়ার কালো ব্যাগটা। একজন বলল, এই লোকটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, একটা পাথরে পা লেগে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথায় চোট লেগেছে খুব। দু'জন লোক তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে।

রতন বুঝল, চশমার ব্যাপারে লোকটা সত্যি কথাই বলেছিল। চোখে ভালো দেখতে পায় না, তাই হোঁচট খেয়েছে।

একটু পরেই লোকটির জ্ঞান ফিরে এল, চোখ মেলে তাকাল।

ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে গিয়ে রতন চশমাটা দোলাতে দোলাতে বলল, এই যে নকল জজসাহেব, তোমার সত্যিকারের নামটা কী বল তো?

লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমার নাম নকুল বিশ্বাস। আমাকে আর যাই শাস্তি দাও, ফাঁসি দিও না!

রেশমি

সকালবেলা কাকাবাবু কফিতে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাজ পড়ছেন, দরজার কাছে খট করে একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালেন।

দরজাটার এক পাল্লা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। গাঢ় হলুদ রঙের ফ্রক পরা, মাথায় একটা হলুদ রঙের রিবন বাঁধা। বয়েস হবে ছয় কিংবা সাত। টানা টানা চোখ, চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রং। এ বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই, পাড়া-প্রতিবেশীর কোনো মেয়ে এমন সকালবেলায় ওপরে উঠে আসে না। মেয়েটির মধ্যে কেমন যেন একটা পাখি পাখি ভাব আছে। যেন ফুড়ুৎ করে কোথা থেকে উড়ে এসেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে, দোয়েল পাখির মতো মিষ্টি সুরে বলল, আমার নাম রেশমি। তুমি বুঝি কাকাবাবু?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। সবাই আমাকে কাকাবাবু বলে ডাকে। তবে, তোমার নাম যেমন রেশমি, তেমনি আমারও একটা নাম আছে। আমার নাম রাজা। তুমি কোথা থেকে এলে রেশমি। তুমি কি পরীর মতো আকাশ থেকে নেমে এসেছ?

রেশমি বলল, না তো! আমরা থাকি ডালিম তলায়। বাবামায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। আমি কখনও পরী দেখিনি। তুমি দেখেছ বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, না আমিও দেখিনি। রোজই ভাবি একটা পরীর দেখা পাব। তোমাকে দেখে মনে হল, তুমিই বুঝি সেই পরী।

রেশমি ফিক করে হেসে বলল, যাঃ পরীদের নাম বুঝি রেশমি হয়? পরীরা বুঝি স্কুলে যায়? আমি শিশুভবন-এ পড়ি।

কাকাবাবু চিন্তার ভান করে বললেন, তাই তো! পরীদের কী নাম হয় তাও তো আমি জানি না। পরীরা স্কুলে পড়ে কি না তাও জানা নেই। তুমি আজ স্কুলে যাওনি?

রেশমি বলল, আমাদের আজ ছুটি। আমি সন্তু দাদাকে খুঁজতে এসেছি। সন্তু দাদা কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, সন্তু এই সময় রোজ সাঁতার কাটতে যায়। এখন তো ওর দেখা পাবে না!

রেশমি কয়েক পলক কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার একটু হেসে বলল, তুমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলে, তাই না?

কাকাবাবুও হাসলেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে অনায়াসে প্রথম থেকেই তুমি তুমি করে কথা বলে। আগেকার দিনে ছোটরা বড়দের সব সময় ভয় আর ভক্তি করে আপনি আপনি বলত। কাকাবাবু তাঁর বাবাকে বলতেন আপনি। এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবামায়ের অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এটাই ভালো। রেশমির মুখে তুমি তুমিই বেশ মিষ্টি শোনাল।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু আর দুরন্ত ছিলাম। আমার মা আমাকে বলতেন, দস্যি ছেলে। কিন্তু তুমি তা কী করে জানলে?

রেশমি বলল, এ যে তোমার একটা পা খোঁড়া! গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলে?

কাকাবাবু বললেন, না গো রেশমি, আমার পা ভেঙেছে অনেক বড় বয়েসে। ছোটবেলায় অনেক দুরন্তপনা করেছি। একবার সত্যিই আমগাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন পা ভাঙেনি। পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি, ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছি। তাতেই একবার পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে একটা পা চেপ্টে যায়!

রেশমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, মোটেই না, মোটেই না! বড়রা মোটেই দুরন্ত হয় না, দস্যি হয় না। তাহলে তারা ছোটদের দুরন্তপনা করতে বারণ করে কেন? আমি দেখেছি, আমার বাবা-মা সব সময় সাবধানে থাকে। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে একটুখানি ওঠে, বেশি উঁচুতে যায় না। দার্জিলিঙে গিয়ে আমার বাবা আর মা তো ঘোড়ায় চড়েনি, আমি চড়েছি। আমার একবার পা মচকে গিয়েছিল। বাবামায়েদের তো পা মচকায় না। তোমার ওইটা ছোটবেলাতেই হয়েছিল।

কাকাবাবু ভাবলেন, রেশমির নিজের বাবামায়ের সম্পর্কে যা ধারণা, সেটা ভাঙা উচিত না।

তিনি বললেন, ঠিক বলেছ। তোমার কাছে ধরা পড়ে গেছি। আমার চেহারাটা তখন বড়দের মতো হলেও মনটা ছিল ছোটদের মতো। সেই সময় পা ভেঙেছে।

রেশমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, তার মানে? বড়দের মতন চেহারা মানে আমার বাবা কিংবা নিপুদার মতন? কিন্তু ওদের মন তো ছোটদের মতো নয়। তা হলে কেন আমার সঙ্গে খেলা করে না?

কাকাবাবু আবার কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, বড়দের মতো চেহারা হয়ে গেলেও তখন আমি সত্যি সত্যি বড় হইনি। তাহলে আসল ব্যাপারটা বলি। আমার বয়েস যখন প্রায় তোমার মতো, তখন একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। একদিন দেখি আমাদের গ্রামের পুকুর ধারে একজন বুড়ো লোক শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। মনে হয় কোনো সন্ন্যাসী কিংবা ফকির হবে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই বুড়ো লোকটি বলল, ওরে খোকা, আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে। থোড়া পানি পিলায় গা? আমি তখন...

গল্পে বাধা দিয়ে রেশমি বলল, পুকুরে বুঝি জল ছিল না? লোকটা সেই জল খায়নি কেন?

কাকাবাবু বললেন, আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞেস করলাম। লোকটি রাগ করে বলল, আমি কি জন্তু যে পুকুরে গিয়ে চুমুক দিয়ে জল খাব? কোনো মানুষ না দিলে আমি জল খাই না। তেষ্টায় মরে গেলেও খাই না। তাই শুনে আমি দৌড়ে বাড়ি থেকে এক গেলাস জল নিয়ে এলাম। বুড়োটি ঢক ঢক করে সব জল খেয়ে নিয়ে বলল, এইটুকুতে কী হবে? আমার এক ঘটি জল লাগে। আমি তখন আবার দৌড়ে গিয়ে এক ঘটি জল আর দুটো রুটি আর খানিকটা গুড় নিয়ে এলাম। মা বলেছিল, কেউ জল চাইলে শুধু জল দিতে নেই। একটু খাবার আর মিষ্টি দিতে হয়। লোকটি ঘটির জল সব শেষ করল, রুটি আর গুড় ছুঁড়ে ফেলে দিল। রাগ করে বলল, আমি ভাত-রুটি কিছু খাই না। মানুষের রান্না কোনো জিনিস খাই না। শুধু ফল খাই।

রেশমি জিজ্ঞেস করল, বুড়োটা খুব রাগী বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখলে ভয় ভয় করে। আমি তখন ফল কোথায় পাব? আমাদের ঠাকুর ঘরে পুজোর জন্য তিনটে কলা ছিল। তখনও পুজো হয়নি। কারুকে কিছু না বলে সেই কলা তিনটে নিয়ে এসে দিলাম সেই লোকটিকে। সে কপাকপ তিনটে কলা শেষ করে বলল, আঃ! শরীরটা জুড়োল। তুই তো বেশ ভালো ছেলে। তোকেও তো কিছু দিতে হয়। কী নিবি?

রেশমি বলল, তুমি কী চাইলে? আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ?

কাকাবাবু বললেন, না। কী চাইব তা ভাবছি, তখন বুড়োটি নিজেই বলল, তোকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। তুই এই মন্ত্রবলে যখন ইচ্ছে বড় হয়ে যেতে পারবি। তোর বাবার মতন বড়!

রেশমি বলল, সত্যি?

কাকাবাবু বললেন, আমি সেই দিনই মন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখলাম। কী আশ্চর্য কাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারাটা হয়ে গেল অনেক লম্বা আর চওড়া। আমি কী করে যেন চলে এলাম একটা পাহাড়ে। সেখানে শুধু বড় বড় পাথর, একটাও গাছ নেই। কোনোখানে একটাও মানুষ নেই। অত বড় চেহারা হলে কী হবে, আমার মনটা তো ছোটদের মতন, তাই খুব ভয় ভয় করতে লাগল। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম।

রেশমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বড়রা বুঝি কাঁদে?

কাকাবাবু বললেন, আসলে তো আমি তখনও ছোট। একটু পরে দেখি যে আমার কাছে একটা হায়েনা এসে দাঁড়িয়েছে। হায়েনা কী জানো তো, একটা হিংস্র জন্তু।

রেশমি বলল, জানি, ছবি দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, হায়েনারা ছোট ছেলেমেয়েদের চুরি করে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু আমি উঠে দাঁড়াতেই সে ভয়ে মারল চোঁ চাঁ দৌড়। আমাকে দেখে সে ভয়

পেয়েছে।

রেশমি বলল, তারপর?

কাকাবাবু বললেন, তারপর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখি যে এক জায়গায় রয়েছে একটা অন্ধকার গুহা। সেই গুহার মুখে উঁকি মারতেই হুংকার দিতে দিতে বেরিয়ে এল একটা দৈত্য। তার আবার মাত্র একটা চোখ। শুধু কপালে সেই চোখটা আগুনের মতো জ্বলছে। মাথার চুল সাপের মতো। গদার মতো দু'খানা হাত। তাকে দেখে ভয় না পেয়ে আমি লড়াই করতে গেলাম, কারণ তখন তো আমার চেহারাও ওর সমান। কিন্তু সেই দৈত্যের এমনই গায়ের জোর যে আমাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল নীচে। আমি গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লাম এক খাদে। প্রাণে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু একটা পা জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেল। এই হলো আমার পা ভাঙার ইতিহাস।

রেশমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ইতিহাস মানে কি গল্প?

কাকাবাবু বললেন, না, না, ইতিহাস মানে আগে যা যা ঘটেছে। গল্প তো বানানো হয়।

রেশমি বলল, তাহলে এটাও ইতিহাস নয়। গল্প। তুমি এই মাত্র বানালে। কারণ একচক্ষু দৈত্য বলে কিছু নেই। দৈত্যরাও আসলে গল্পের মধ্যে থাকে। পৃথিবীতে কোথাও থাকে না আমি জানি।

কাকাবাবু বললেন, দৈত্য মানে আমি বোঝাতে চাইছি একটা ভীষণ ডাকাত, তার এক চোখ কানা—

রেশমি সে-সব কথা আর না শুনে কাছে চলে এসে আবদার করা গলায় বলল, কাকাবাবু, আমাকে সেই মন্ত্রটা শিখিয়ে দেবে? আমি আমার মায়ের মতো বড় হয়ে যাব। মাকে খুব চমকে দেব!

কাকাবাবু বললেন, না রেশমি, বড় হওয়া মোটেই ভালো নয়। বড়দের জগৎটা কী রকম যেন একঘেয়ে। বড্ড কাজ করতে হয়। যতদিন সম্ভব ছোট থাকাই ভালো। তুমি এখন কী সুন্দর ফুলের মতন সুন্দর!

রেশমি বলল, একবারটি শুধু বড় হব। মাকে চমকে দিয়ে আবার ছোট হয়ে যাব। দাও না, শিখিয়ে দাও না। পাঁচ মিনিটের জন্য।

কাকাবাবু বললেন, রেশমি, সেই মন্ত্রটা যে আমি ভুলে গেছি! আমার কী বিপদ দেখ না, সেই যে এক লাফে বড় হয়ে গেছি, আর ফিরতে পারিনি ছোটবেলায়। আমার খুব দুঃখ হয় সেইজন্য। আমার খুব তোমার মতো ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

রেশমি বলল, জানতাম, জানতাম, তুমি শেখাতে পারবে না। ওই রকম মন্ত্রও কিছু নেই। মন্ত্র দিয়ে কেউ ছোট থেকে বড় হতে পারে না। কেউ পারে না!

এবার কাকাবাবুর অবাক হবার পালা। এখনকার ছোটরাও এত কিছু জানে! দৈত্যের গল্প শুনে ভয় পায় না, বিশ্বাস করে না। মন্ত্র-টন্ত্র যে সব বানানো ব্যাপার তাও বুঝে গেছে!

কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে দেখলেন কফি ঠান্ডা হয়ে গেছে। মুখটা তুলতেই দেখলেন, রেশমি নেই। মেয়েটা চলে গেল নীচে? এত তাড়াতাড়ি? নাকি সত্যিই ও একটা পরী? পরীদের তো কিছুই অজানা থাকে না।

কাকাবাবু একবার ভাবলেন, নীচে গিয়ে দেখে আসবেন, সত্যিই রেশমি নামে কোনো মেয়ে তার বাবামায়ের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে কি না। আবার ভাবলেন, থাক, দেখার দরকার নেই। পরী হতেও তো পারে। ওই বয়েসের সব মেয়েই পরীর মতন!

মরুভূমির হরিণ

মনে হয় যেন এক রূপকথার দেশে চলে এসেছি হঠাৎ। রাস্তা দিয়ে হাতি চলেছে দুলকি চালে, তার পিঠে মানুষ। হাতির হাওদা জরির চাদর দিয়ে সাজানো। এরকম একটা নয়, মাঝে মাঝেই দেখা যায় হাতি। আর উট। কোনো উট এমনি যাচ্ছে, কোনোটার পিঠে মানুষ, আর কোনোটা গাড়ি টানছে। আমাদের গরুর গাড়ির মতো, এদেশে সব উটের গাড়ি। হঠাৎ হঠাৎ কপাকপ শব্দে ছুটে ঘোড়া। এক সঙ্গে সাত-আটটি ছেলে ঘোড়া ছুটিয়ে উঠে গেল পাশের পাহাড়ে। ছোট-ছোট পাহাড়গুলোর চূড়ায় দুর্গ কিংবা মন্দির।

রাস্তায় অনেক মানুষের মাথায় ঢাউস ঢাউস পাগড়ি। সবুজ কিংবা হলুদ রঙের। পথ-চলতি সাধারণ অনেক মেয়েও এমন ঝলমলে, রঙিন জরিদার শাড়ি পরে আছে যে মনে হয়, এই মাত্র কোনো ছবির বইয়ের পাতা থেকে উঠে এল। এখানে সব কিছুই যেন অন্যরকম।

রাজস্থান। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'রাজকাহিনী' বইয়ের গল্পগুলো। এখনও এখানে জলজ্যান্ত রাজা-রাজড়া ঘুরে বেড়ায়। মটর গাড়ি আর বাসের পাশ দিয়ে চলে হাতি আর উট। এমন শহরও তো আমরা আগে দেখিনি, যেখানে সব বাড়িগুলোর রং এক রকম! জয়পুর শহরটার আর এক নাম 'পিঙ্ক সিটি' বা 'গোলাপি-নগর'। মূল শহরটার চওড়া রাস্তার দু'পাশের সব বাড়ির রং গোলাপি। হঠাৎ মনে হয় যেন বিরাট লম্বা লম্বা দু'খানা মাত্র বাড়ি রাস্তার দু'পাশে। আমরা আগে ঠিক করে রেখেছি, জয়পুর থেকে যাব জয়সলমীরের দিকে। জয়সলমীরের দুর্গ নিয়ে সত্যজিৎ রায় 'সোনার কেল্লা' নামে বই লিখেছেন আর সিনেমা তুলেছেন। আমরা অবশ্য যাচ্ছি মরুভূমি দেখতে। আমাদের এই দেশে পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র অনেক জায়গাতেই দেখা যায়, কিন্তু খাঁটি মরুভূমি দেখতে গেলে যেতে হবে রাজস্থানে। যোধপুর থেকে মরুভূমি শুরু। যোধপুরও খুব সুন্দর শহর, মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী ছিল এক সময়। এখান থেকে একটা গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিকেলের দিকে। তিনশো কিলোমিটারের বেশি পথ, জয়সলমীর পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। কিন্তু এদিককার রাস্তা এত ভালো যে রাত্তিরেও গাড়ি চালাবার কোনো অসুবিধে নেই।

দশ-পনেরো কিলোমিটার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল মরুভূমি। আমরা কলকাতা কিংবা সিনেমায় যে মরুভূমি দেখি, তাতে শুধু ধূ ধূ করা বালুকাময় প্রান্তর, মাঝে

মাঝে ছোট ছোট বালির পাহাড়, অর্থাৎ স্যান্ড ডিউন। এ মরুভূমি কিন্তু সেরকম নয়, তেমন শুধু বালির মরুভূমি দেখা যাবে জয়সলমীর পার হয়ে। এখানে রাস্তার দু'ধারে দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো রুক্ষ প্রান্তর, পাথুরে ভূমি, মাঝে মাঝে কিছু বালিও রয়েছে, আর রয়েছে কিছু কিছু কাঁটা গাছ, কোথাও কোথাও লম্বা লম্বা ঘাস।

আমি এর আগে দু'জায়গায় মরুভূমি দেখেছি। ইজিপ্টে আর আমেরিকার অ্যারিজোনা রাজ্যে। কায়রো শহর থেকে আমি উটের পিঠে চেপে পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম। সে মরুভূমি একেবারে বালিতে ভরা, পাথর-টাথর কিছু নেই। অ্যারিজোনার মরুভূমির সঙ্গে বরং এখানকার মরুভূমির মিল আছে। সেখানেও বালির চেয়ে পাথরই বেশি, সেখানে রয়েছে ক্যাকটাস। আমরা এখানকার কাঁটা গাছের বদলে সাধারণত যে ফণীমনসা গাছ দেখি সেগুলি বড় জোর চার পাঁচ ফুট উঁচু হয়, আর অ্যারিজোনার ফণীমনসাগুলো দেড়তলা-দোতলা বাড়ির মতো লম্বা, দূর থেকে মনে হয় যেন সার সার দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে।

রাজস্থানে ময়ূর দেখা যায় অজস্র। এখানেও রাস্তার দু'ধারে যখন তখন ময়ূর চোখে পড়ে। আমরা আমাদের বাড়ির পাশে যেমন এক সঙ্গে পাঁচ-ছটা শালিক পাখিকে জটলা করতে দেখি, এখানেও মাঝে মাঝে ঠিক শালিক পাখির জটলার মতোই পাঁচ-ছটা ময়ূর দেখা যায় এক সঙ্গে। কিন্তু শালিকের চেয়ে ময়ূর কত সুন্দর। একবার একটা ময়ূর তার দীর্ঘ পুচ্ছ নিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল।

উট তো আছেই। কাছাকাছি কোনো মানুষ নেই, তবু উট ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিরাফের মতো লম্বা গলা তুলে কাঁটা গাছের উঁচু ডালের পাতা খাচ্ছে। আর চোখে পড়ছে গাধা। মাঝে মাঝে গাধার পাল। গুজরাটে কচ্ছের রানে বুনো গাধা দেখা যায়। সেই জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। এগুলোও বুনো গাধা কিনা কে জানে! আফ্রিকার কেনিয়ায় আমি বাড়ির পাশে বুনো জেব্রা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, গাধাগুলোকে দেখে সেই কথা মনে পড়ে।

আমাদের দলে একটি বাচ্চা ছেলে আছে, ন'-দশ বছর বয়স, তার নাম ছোটু। সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওটা কী? ওটা কী?

আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে একটা প্রাণী দারুণ জোরে ছুটে রাস্তা পার হয়ে গেল। সেটা একটা শেয়াল। চট করে চিনতে পারা যায় না। বাংলাদেশে আমরা যে শেয়াল দেখি, সেগুলো বেশ বড়, অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতন। এই শেয়াল বেশ ছোট, একটা রোগা-লম্বা বেড়ালের মতো, মুখ ছুঁচলো, মোটা ল্যাজ। মরুভূমির শেয়াল, ডেজার্ট ফক্স! আমি এই শেয়াল আগে কখনও দেখিনি। শুনেছি এরা অসম্ভব ধূর্ত হয়, এদের বন্দি করা খুব শক্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি রোমেলকে বলা হত ডেজার্ট ফক্স।

চার পাঁচটা শেয়াল দেখলাম। আর দেখলাম খরগোশ। তখন বুঝলাম, শেয়ালের

খাদ্যও এখানে রয়েছে। শেয়ালগুলো খরগোশ মেরে খায়। আর দেখলাম বেজি। শেয়ালগুলো ছোট ছোট হলেও বেজিগুলো আবার বেশ বড় বড়, মোটকা সোটকা। মরুভূমিতে অনেক রকম পোকামাকড় থাকে, সাপও থাকে। তাই বেজিও রয়েছে।

ছোটু গুনছিল সে ক'টা শেয়াল আর বেজি দেখল। ময়ূর গুনে লাভ নেই। তা তো অজস্র। সন্ধে প্রায় নেমে এসেছে। পশ্চিমের আকাশটাকে দোল খেলার রঙে রাঙিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এমন সময় আমরা দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। অস্ত-সূর্যের পটভূমিকায় দুটি হরিণ। সত্যি সত্যি হরিণ! মরুভূমিতে হরিণ থাকে, তা আমার জানা ছিল না। হরিণদের তো জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবার কথা। এই হরিণদুটো বেশ রোগা, করুণ চেহারা। চোখ দুটো ছলছলে. গায়ের রং ছাই-ছাই হলুদ। হরিণের দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যেই সব সময় একটা ব্যাকুলতা থাকে। আমরা গাড়ি থামিয়ে ভালো করে দেখতে যেতেই হরিণদুটো তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে লাগল দিগন্তের দিকে। যতক্ষণ না তারা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ আমরা চেয়ে রইলাম সেদিকে। ছোটু ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, যদি হরিণ থাকে, তা হলে কি বাঘও থাকবে?

আমি বললাম, না। বাঘ হচ্ছে গভীর জঙ্গলের প্রাণী। ফাঁকা জায়গায় থাকে না। মরুভূমিতে বাঘ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সিংহ থাকে। সিংহ আবার গভীর জঙ্গলের বদলে ফাঁকা জায়গাতেই থাকতে ভালোবাসে। সিংহের গায়ের রং সোনালি বালির মতো। কেনিয়ার সেরিংগেটি ফরেস্ট দেখতে গিয়ে আমি সিংহের পাল দেখতে পেয়েছি ফাঁকা জায়গায় কিংবা ঘাসবনের পাশে।

এখন সিংহকে আফ্রিকার প্রাণী বলে মনে করা হলেও পণ্ডিতেরা বলেন এক সময়ে পশ্চিম ভারতে আর মধ্য এশিয়ায় প্রচুর সিংহ ছিল। আমরা তো পশ্চিম ভারত দিয়েই চলেছি, এখানেও সিংহ ঘুরে বেড়াত আদিকালে। এখন গুজরাটের সংরক্ষিত গির অরণ্যে কিছু সিংহ রাখা আছে, তাছাড়া আর কোথাও সিংহ দেখতে পাওয়া যায় না।

দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যাওয়া হরিণ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, আদিকালের সিংহগুলো নিশ্চয়ই এখানে হরিণ মেরে মেরে খেত। সেইসব প্রচণ্ড শক্তিমান ও নিষ্ঠুর সিংহগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু হরিণ তো আজও টিকে আছে।

দুর্বলেরও তাহলে এক রকমের শক্তি থাকে!

সাবধান, সাপ!

আমাদের মামা বাড়ির পুকুরটা এত বিরাট যে ছেলেবেলায় আমাদের মনে হত সমুদ্রও বুঝি এই রকমই। পুকুর তো নয় দীঘি। ওপারের জমাট গাছপালাগুলো ঝাপসা ঝাপসা দেখায়। একদিকে আমাদের বাড়ি। আর একদিকে বাগদিপাড়া, তার উল্টোদিকে ডোম পাড়া। পুকুরের চতুর্থ দিকটায় আমাদের যাওয়া নিষেধ ছিল। ওদিকটায় গভীর জঙ্গল, তারই মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা খুব পুরোনো কবরখানা। ওখানে গেলে অনেকে নাকি দিনে-দুপুরেও ভয় পেয়েছে। একদিন সন্ধেবেলা একটা ধপধপে সাদা কঙ্কাল নাকি ওই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দীঘির ধারে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের মামাবাড়ির কুকুর ভুলো সেদিকে তাড়া করে গেলো। তারপর সেই কঙ্কালটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভুলো খুব সাহসী আর দুর্দান্ত কুকুর হলেও কিন্তু পুকুরের ওপারের ওই জঙ্গলে ঢুকত না। ওখানে অনেক শেয়াল। সন্ধে হলেই আমরা শেয়ালের গান শুনতুম। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে শুনতে পেতুম, শেয়ালগুলো যেন ডাক ছেড়ে কাঁদছে। মা বলতেন, ঘুমো ঘুমো। দীঘির জঙ্গলের কঙ্কাল কোনো শেয়ালের ঘাড় মটকাচ্ছে।

আমার এগারো বছর বয়েসে আমি একটা রূপকথার গল্প পড়লুম। রাজকুমারকে বলা হয়েছিল পাহাড়ের ওপরের ফাঁকা দুর্গটির যেখানে খুশি সে যেতে পারে, শুধু যেন দক্ষিণের দিকের ঘরের দরজা না খোলে। কিন্তু তবু একদিন রাজকুমার চুপি-চুপি দক্ষিণের দিকে গিয়ে সেই দরজা খুলল। তারপর রাজকুমার অনেক বিপদে পড়ল। শেষ পর্যন্ত আবার উদ্ধারও পেয়ে গেল।

সেই গল্প পড়ে আমার মনে হল, রাজকুমার নিষেধ শুনেও দক্ষিণ দিকে গিয়েছিলেন, তাহলে আমিই বা পুকুরধারের ওই জঙ্গলে যাব না কেন? জঙ্গলটাও তো দক্ষিণ দিকে।

বেস্পতিবার ঘোর দুপুরবেলা আমি চুপি চুপি রওনা হলুম সেই পুকুরের দিকে। বাড়ির সবাই এখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ বা বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। আমি পড়ার টেবিলে বই খুলে রেখে চলে এসেছি।

একটু এগোতেই বাগদিপাড়ার শিবু এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ গো নীলুদা?

আমি বললুম, দক্ষিণ দিকের ওই জঙ্গলে। শিবু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে

চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, ওখানে যে ভূত আছে। পরশু দিনকেও বেরিয়েছিল। আমি বললুম ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি। রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবে আমার কী?

শিবু বলল, কই তোমার বুকে রামলক্ষ্মণ, দেখি?

আমি বললুম, যাকে তাকে দেখাতে নেই। শিবু বলল, আমারও বুকের মধ্যে মহাদেব আছেন। মহাদেব তো সব ভূতের রাজা। আমি যাব তোমার সঙ্গে?

আমি বললুম, চল্।

শিবু বলল, দাঁড়াও, নীলুদা, আমি একটা মাছ-ধরা বল্লম নিয়ে আসি।

আমি বললুম, দূর বোকা। ভূতকে কি বল্লম দিয়ে মারা যায় নাকি?

শিবু বলল, শেয়ালও তো আছে। যদি শেয়াল এসে পড়ে, তা হলে বল্লম দিয়ে ভয় দেখাব।

আমি বললুম, তা হলে দুটো নিয়ে আয়।

শিবু দৌড়ে দুটো বল্লম নিয়ে এল।

সে দুটো কাঁধে নিয়ে আমরা চললুম জঙ্গলের দিকে। একেবারে কোণে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। সেখানে অনেক মুরগির পালক ছড়ানো।

শিবু বলল দু'দিন আগেই শেয়াল এসে আমাদের বাড়ি থেকে মুরগি চুরি করেছিল। এখানে বসে বসে খেয়েছে। আমার বাবা রাগ করে কাল এই জঙ্গলে ঢুকে দুটো শেয়াল মেরেছে।

আমি বললুম, তোর বাবা এই জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে? ভয় পায় না?

শিবু বলল, আমাদের তো অনেকেই জঙ্গলে যায়। কাঠ কেটে আনে। ভূত ওদের সামনে আসে না। শুধু ছোটদেরই যাওয়া বারণ।

আমি বললুম, আমরা আর ছোট নেই। এগারো বছর বয়েস হয়ে গেলে আর কেউ ছোট থাকে না। তোর কত বয়েস রে, শিবু।

—আমার দশ।

—তা হলে তুই এখনও একটু ছোট আছিস। তুই ফিরে যা।

—বারে আমি যে তোমার সমান লম্বা। আমিও বড় হয়ে গেছি।

আমরা চুপি চুপি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলুম। কিন্তু খুব চুপি চুপি যাবার উপায় নেই, কারণ অনেক শুকনো পাতা ছড়ানো, তার উপর দিয়ে হাঁটতে গেলেই মচ্‌মচ শব্দ হয়।

জঙ্গলের ভেতরটা যেন অন্ধকার অন্ধকার। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়ে মাটিতে সাদা কালোর ছবি হয়ে গেছে অনেক রকম। একটা উনুন। সেখানে কিছুদিন আগে রান্না হয়েছে মনে হল। বনের মধ্যে পিকনিককে বলে বন-ভোজন। তা হলে এখানে কি ভূতেরা বন-ভোজন করেছে নাকি!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে, শিবু, ভূতেরা কি রান্না করে খায়? নাকি তারা কাঁচা খায় সব জিনিস?

শিবু আমার চেয়ে অনেক কিছুই বেশি জানে। সে বলল, ও নীলুদাদা, তুমি এটাও জানো না! ভূতেরা আগুন জ্বালাতে পারে না। তারা আগুন দেখলেই ভয় পায়।

—তা হলে এখানে কারা রান্না করেছে?

—শুনেছি তো চোর-ডাকাতরা নাকি মাঝে মাঝে এই জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। তারাই বোধ হয় রান্না করে খেয়েছে।

—এখন যদি ডাকাতেরা থাকে এই জঙ্গলে? যদি আমাদের ধরে?

—দিনের বেলা আবার ডাকাত থাকে নাকি। তুমি জানো না, দিনের বেলা ডাকাতরা সব এমনি মানুষের মতন হয়ে যায়। রাত্তিরবেলা তারা ডাকাত হয়।

—তুই এত সব জানলি কী করে রে শিবু?

—আমার মেজো কাকাই তো ডাকাত ছিল। তাকে দেখেছি তো।

—সেই মেজোকাকা এখন কোথায়?

—জেলখানায়।

—যাক, বাঁচা গেছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমরা এসে পড়লুম একটা ফাঁকা জায়গায়। এখানেই সেই মুসলমানদের কবরখানা। কবে যে এখানে কবর দেওয়া হত কেউ জানে না। এখন আর এখানে কেউ কবর দিতে আসে না। পুরোনো কবরগুলোর ওপরে বড় বড় ঘাস জন্মে গেছে। এই জায়গায় এসেই আমার একটু গা ছমছম করতে লাগল। যদিও সাদা কঙ্কাল-টঙ্কাল কিছু নেই। ডাকাত বা শেয়ালও আমাদের চোখে পড়েনি।

তবু মনে হচ্ছে যেন আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে, এবার ফিরে গেলেই হয়। কিন্তু আমি আগে ফিরে যাওয়ার কথা বললে শিবু যদি ভাবে আমি ভয় পেয়েছি, তাই আমি চুপ করে রইলুম।

শিবু বলল, ঠিক এই জায়গাতেই সেই অজগর সাপটাকে মেরেছিল।

আমি চমকে উঠে বললুম, অ্যাঁ? কোন্ অজগর সাপ?

—মস্ত বড় একটা অজগর সাপ। গাছের গুঁড়ির মতো মোটা। আমার সেই যে মেজোকাকা যে ডাকাত হয়ে গিয়েছিল, সে-ই মেরেছিল ঠিক এইখানটায়।

—তুই কী করে জানলি?

—আমি দেখেছিলুম তো।

—তুই দেখেছিলি? তুই এই জঙ্গলে আগে এসেছিলি?

—হ্যাঁ, এসেছিলুম।

—সে কথা আগে বলিসনি কেন? মিথ্যুক কোথা কার!

—আমি তো নিজে আসিনি। তখন আমি অনেক ছোট ছিলুম, আমার ঠাকুরদা

আমায় কাঁধে নিয়ে এসেছিল।

—সত্যি অজগর সাপ ছিল?

—হ্যাঁ? এই কবরখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই অ্যাত্ত বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ!

—তারপর?

—আমার বাবা-কাকারা ও ঠাকুরদা মিলে বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলল সাপটাকে। তারপরে শুকনো পাতা জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হল। জানো তো, সাপকে একদম পুড়িয়ে না ফেললে আবার বেঁচে ওঠে।

শিবু এই কথা বলতে বলতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই একগাদা শুকনো পাতা জড়ো হয়ে আছে। তার মধ্যে শর শর শব্দ উঠল। যেন সেই পাতার স্তূপ ভেদ করে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে।

আমি শিবুর দিকে তাকাতেই শিবু আমার হাত ধরে বলল, সরে এসো নীলুদা, সরে এসো।

তারপর বলল, বোধহয় আর একটা সাপ।

সাপের নাম শুনে আমার যত ভয় হয় শিবুর কিন্তু ততটা হয় না। এই বয়সেই ও দু' একটা সাপ মেরেছে।

একদৃষ্টে সেই পাতার স্তূপটার দিকে আমরা তাকিয়ে রইলুম। তবে শুধু শব্দই হতে লাগল, কিছু বেরিয়ে এলো না। শিবু ওর বল্লম দিয়ে পাতার মধ্যে খোঁচা মারল। তখন শোনা গেল দু'বার ফোঁস ফোঁস শব্দ।

শিবু তার বল্লম তুলে চেঁচিয়ে বলল, তুমিও মারো, নীলুদা খুব জোরে মারো। এবারে আমিও বল্লম দিয়ে খোঁচাতে লাগলুম সে পাতার মধ্যে। কিন্তু বল্লমে কিছু ঠেকল না, সাপও বেরিয়ে এলো না।

শিবু বলল, পালাবে কোথায়? মারবোই ব্যাটাকে।

বল্লমটা আছড়ে সে পাতার স্তূপটা ভেঙে দিতে লাগল। সব পাতা ছড়িয়ে গেল। কিন্তু সাপটাকে দেখা গেল না। শিবু বলল গেল কোথায়? এখানে তো কোনো গর্তও নেই!

আমি বললুম, ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনলুম যে।

শিবু বলল, নিশ্চয়ই সাপ আছে এখানে। আর কিসে ওই রকম শব্দ করবে?

সমস্ত পাতা সরিয়ে সরিয়ে দেখা হল। কিন্তু সাপের কোনো চিহ্ন নেই। কাছাকাছি কোনো গর্তও নেই যে পালিয়ে যাবে।

এবারে শিবুর মুখখানা কী রকম যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল, এই রে, সর্বনাশ!

—কী হল রে, শিবু?

—ব্যাপার বুঝলে না তো নীলুদা। সেই অজগর সাপটা ভূত হয়ে এখানে থেকে গেছে। তাই ওকে আমরা দেখতে পেলুম না।

—অ্যাঁ! কী বলছিস রে শিবু!

—আমি ঠিকই বলছি!

অমনি বনের সমস্ত শুকনো পাতায় শর শর শব্দ হতে লাগল। আর গাছগুলো থেকেও আওয়াজ বেরুল, তেমন ফোঁস ফোঁস।

দৌড় শুরু করে শিবু চেঁচিয়ে বলল, নীলুদা, পালাও।

তারপর আমিও ছুট লাগালুম প্রাণপণে। মনে হতে লাগল, ফোঁস ফোঁস শব্দটা তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।

একেবারে সেই বড় তেঁতুলগাছটা পার হয়ে আমি আর শিবু থামলুম।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবা, খুব জোর বেঁচে গেছি। আর কোনোদিন দুপুরে জঙ্গলে যাচ্ছি না!

আমি কোনো কথা বলতে পারলুম না। তখনও বুকের মধ্যে দমাস দমাস শব্দ হচ্ছে।

কিন্তু কারুকে যদি বলি, আমরা একটা অজগরসাপের ভূতের পাল্লায় পড়েছিলুম, কেউ কি বিশ্বাস করবে?

—